ক্রিসক্রস

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

কোনও এক চব্বিশে ডিসেম্বরের সকাল সাতটা থেকে বিকেল তিনটে অবধি এই কাহিনির সময়কাল। সমান্তরালভাবে অনেকগুলো গল্পধারা 'ক্রিস-ক্রস' উপন্যাসে প্রবাহিত। আছে ফোটোগ্রাফার আর্চি ও ইরার কথা, যাদের প্রেম এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে চায়। ওদিকে অফিসে আচমকা এক ক্রাইসিসের মুখোমুখি অহন ও উর্নি। ক্রাইসিস সামলাতে গিয়েই অহন ফিরে পায় আত্মবিশ্বাস, উর্নি আবার প্রবল উৎসাহে গুছিয়ে তুলতে চায় এলোমেলো জীবন। এই উপন্যাসে শিল্পী সাইমন রূপেন মণ্ডল ছবি এঁকে প্রতিপালন করে পঙ্গু বোনকে, লাং ক্যান্সারে আক্রান্ত মহেশ বুকে বয়ে নিয়ে বেড়ায় নিষিদ্ধ সম্পর্কের অপরাধবোধ। মডেলিং-এ নাম করতে চাওয়া মেহের, খলচরিত্র শতানিক বাসু, অটোচালক বোম— এই তিনটি চরিত্রও 'ক্রিস-ক্রস'-এ তাদের গল্প বলে। শতানিক মেহেরের ক্ষতি করার আগেই দুর্ঘটনায় পড়ে, মেহের পৌঁছে যায় অহনের কাছে, এদিকে বোম কাটিয়ে ওঠে তার হীনম্মন্যতা। আর আছে বিস্ময়কর চরিত্র নেড়ু পাগলা, সে যেমন পৃথিবীকে উচিত শিক্ষা দিতে চায়, তেমনই কামনা করে মানুষের দ্বারাই যেন মানুষের উপকার হয়।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর জন্ম ১৯ জুন ১৯৭৬, কলকাতায়। শৈশব কেটেছে বাটানগরে। বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা।
নঙ্গী হাই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভরতি। কিন্তু মাঝ পথেই পড়া ছেড়ে দেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজির স্নাতক।
কবিতা দিয়ে লেখালেখির শুরু। প্রথম ছোটগল্প বের হয় 'উনিশ কুড়ি' পত্রিকায় ২০০৩-এ। তারপর এই পত্রিকাতেই বেশ কিছু ছোটগল্প ছাপা হয়েছে। 'পাতাঝরার মরশুমে' প্রথম উপন্যাস।
ভালবাসা: বিদেশি ফিল্ম, বই আর ফুটবল।

.....

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

ক্রিস-ক্রস

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

শুরুর আগে

"সব শালাকে মেরে দেব, পুঁতে ফেলব। সব শালার পেছনে দিয়ে দেব। আমায় রং দেখাচ্ছ? শুধু ভাষণ, শুধু বাতেলা, না? খালি ঢপবাজি? রাস্তায় মানুষ মরে পড়ে আছে, হুঁশ নেই? শালা, কুকুরেরা বাচ্চা মুখে তুলে পালাচ্ছে, হুঁশ নেই? শুধু সলমন খান আর বিপাশা বাসুর জামা-কাপড় দেখলে চলবে? সব শালাকে মেরে দেব। সব শালার গায়ে মুতে দেব। চোখে আঙুল ঢুকিয়ে বের করে আনব গুলি। আঁটো প্যান্টুল পরা মেয়েছেলে দেখলেই তাদের পেছনে চোখ সেঁটে যায়, না? ভাল কিছু করতে পারিস না? অন্ধকে রাস্তা পার করাতে পারিস না? ভিখিরিদের দিতে পারিস না দু'-চার টাকা? শুধু রোল চিবোবে, মাগি নিয়ে ফুর্তি করবে, হাফ-ন্যাংটো মেয়েছেলে দেখলেই ফোনে ফোটো তুলবে? সব শালাকে দেখে নেব। মেরে তক্তা বানিয়ে ছাড়ব। কোনও দিকে হুঁশ নেই? ফারদার যদি এসব খুপচামো করবি তো মাটিতে পুঁতে পিচ করে দেব। বুঝলি?"

বড় ছাতিম গাছটার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, লাল গেস্ট হাউসটার পাশের ছোট্ট সিঁড়িটায় গিয়ে বসল নেড়ু পাগলা। শীতের সকাল সবে আড়মোড়া ভাঙছে কলকাতায়। পাতলা কুয়াশার ওড়না কোনও এক অদৃশ্য হাতের টানে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে চারিপাশ থেকে। তাও সূর্যের যেন তেমন তেজ নেই। যেন তেমন আগ্রহ নেই রোদ পাঠাবার। বরং শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে একটা। নেড়ু পাগলার গায়ের চাদর ভেদ করে একদম হাড় অবধি গিয়ে কড়া নাড়ছে ঠান্ডা। অবশ্য চাদরেরই বা দোষ কী? ফুটো হতে হতে ওটার অবস্থা প্রায় মশারির মতো। তাও, যত দূর সম্ভব সেটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে শরীরের সঙ্গে পেঁচিয়ে বসল নেড়ু পাগলা। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। তৃপ্তির। যাক, ও পেরেছে। আজ সকালের কোটা কমপ্লিট। দিয়েছে ছাতিম গাছের মা-মাসি উদ্ধার করে। ওর সঙ্গে ইয়ারকি? পোষা পিঁপড়ে দিয়ে ওকে কামড়

BanglaBook.org

খাওয়ানো! ওরা তো চেনে না কে ও! ও হল... ও হল...! কে ও? কী নাম ওর? রোজ ওর চিন্তাটা এখানে এসেই পথ হারিয়ে ফেলে। পেটের ভেতরে তোলপাড় করে ডুবুরিরা। বুকের ভেতর কে যেন চাপ দিতে থাকে। মনে পড়ি পড়ি করেও ঠিক মনে পড়ে না ওর। কিছুতেই নিজের নামটা মনে পড়ে না ওর। ও খুব চেষ্টা করে। চোখ বন্ধ করে, ঠোঁট কামড়ে, পাজামা খামচে ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে ও। কিন্তু কিছুতেই পথটা খুঁজে পায় না। শুধু, একটা মাঠ দেখতে পায় এক ঝলক, অনেক পায়রায় ভরা একটা ছাদ দেখতে পায় এক ঝলক, সোনার মোটা মোটা বালা-পরা হাত দেখতে পায়, দেখতে পায় বড় ঝিল, অনেক বই সাজানো ঘরের মধ্যে বসে থাকা একজন মানুষ আর লাল ওয়াটার বটল হাতে দৌড়ে আসা একটা ছোট্ট মেয়েকে। মাথার ভেতরে যন্ত্রণা হয় নেড়ু পাগলার। মনে হয় কে যেন বসে একটা একটা করে শিরা ছিঁড়ছে ওর। ও চোখ খোলে। এরা সব কারা? কাদের দেখে ও? স্পষ্ট করে কিচ্ছু মনে পড়ে না ওর। শুধু কষ্ট হয় একটা। গলায় আটকে থাকা কান্না-না-বেরোনোর মতো কষ্ট।

আজও নিজের নাম মনে করতে সেরকম কষ্ট হল নেড়ু পাগলার। মনে হল একটা রবারের বল যেন আটকে আছে গলার কাছে। তাই ও আর চিন্তা করল না এসব নিয়ে। ও জানে, লাভ নেই। বরং ছাতিম গাছটাকে আজকেও কড়কে দিয়েছে চিন্তা করে ওর ভাল লাগল। রোজ সকালে উঠে এই ভাল লাগাটুকু ও নিজেকে দেয়। দিনের শুরুতে রোজ ছাতিম গাছটাকে বেশ খানিকটা বকাবকি করে ও। ওর সমস্ত খারাপ লাগাগুলোকে উজাড় করে গালাগালি করে, বলে, "নাও, পোষা পিঁপড়ের কামড় খাওয়াও আরও"!

তবে বকাবকির ব্যাপারটা সবটাই খুব ফিসফিস করে হয়। নেড়ু পাগলার চিৎকার চেঁচামেচি ভাল লাগে না বিশেষ। ও সকালে উঠে প্রথম গেস্ট হাউসের পাশের ময়লা ফেলার জায়গায় গিয়ে পেচ্ছাপ করে, তারপর গিয়ে দাঁড়ায় ছাতিম গাছের তলায়। পিঁপড়ের কামড়ের বদলা হিসেবে ও দু'কথা শুনিয়ে দেয় গাছটাকে, তারপর আবার এসে বসে ওর জায়গায়।

পেটের ভেতরে একটা অদ্ভুত মোচড় লাগল নেড়ু পাগলার। খিদে পেয়েছে। এই বকাবকির পরেই খুব খিদে পায় ওর। মনে হয় কে যেন পেটের ভেতরে ঢুকে মাটি কাটছে। আজও তাই মনে হল। সকালের এই সময়টায় খিদে পেলে কোথায় যেতে হয় ও জানে। এই রাস্তা আর বড়

BanglaBook.org

রাস্তার সংযোগস্থলে একটা দোকান আছে। ফোন, জেরক্স আরও নানা জিনিসের। সেটা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি খুলে যায়। এই সময় ওই দোকানে গেলে ও চা আর পাউরুটি পায়। নুরচাচা দেয়।

নুরচাচার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নেড়ু পাগলা জিজ্ঞেস করল, "চাচা, আজ কত তারিখ বলো তো?"

"চব্বিশ তারিখ। চব্বিশে ডিসেম্বর। কেন রে?"

নেড়ু মাথা চুলকোল। কেন চব্বিশে ডিসেম্বর তা ও জানবে কী করে? ও বলল, "সে আমি কী জানি কেন চব্বিশে ডিসেম্বর? খবরওলাদের জিজ্ঞেস করো।"

নুরচাচা মাথার সাদা উলের টুপিটা টেনে কানের ওপর এনে বললেন, "খবরওলাদের জিজ্ঞেস করব কেন?"

নেড়ু বিরক্ত মুখে বলল, "তুমি জিজ্ঞেস করবে কেন তার আমি কী জানি? আমার টানটু গরম করছ কেন? তবে খবরওলারাই তো সব তারিখ-টারিখ ছাপায়। যত্ত সব ফালতু লোক।"

নুরচাচা হাসলেন; "তোর দেখছি খবরওলাদের ওপর বেজায় রাগ!"

"হবে না?" নেড়ু চোয়াল শক্ত করল, "কী সব ছাপায় বলো তো? মানুষ মরে পড়ে আছে কলকাতার রাস্তায়, কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। কুকুর, বাচ্চা মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ কিছু বলছে না। জামাকাপড় খুলে মেয়েছেলে নাচছে আর তাই দেখে আধবুড়ো দামড়াগুলো ফোন দিয়ে ছবি তুলছে। হুঁঃ, আর ছাপাবার জিনিস পায় না? শহরে কি ভাল কিছু হচ্ছে না? মানুষ কি মানুষকে সাহায্য করছে না? ছেলেমেয়েরা কি প্রেমে পড়ছে না? সে সব ছবি ছাপায় না কেন?"

নুরচাচা দোকানের ভেতরে বসা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "নে রে হুলো, এটাকে পাউরুটি-চা দে। না হলে বকে আমার মাথার পোকা বের করে দেবে।"

হুলো পাশের বড় ফ্লাস্কের থেকে একটা প্লাস্টিকের কাপে চা ঢেলে আর একটা বড় পাউরুটির টুকরো নিয়ে এসে নেড়ুর হাতে দিল।

নেড়ু চায়ের কাপের মাথাটা সাবধানে ধরে চুমুক দিল একটা। তারপর এক কামড় পাউরুটি খেল।

BanglaBook.org

হুলো জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁগো নেড়ুদা, তুমি কী বললে? প্রেম? তুমি ওসব বোঝো?"

নেড়ু পাউরুটি চিবোতে চিবোতে থেমে গেল। হঠাৎ ওর সামনে ভেসে উঠল সোনার মোটা মোটা বালা-পরা একজোড়া হাত। অনেক বই সাজানো ঘরের মধ্যে বসে থাকা একজন মানুষ।

হুলো আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হল গো? বলো না। তুমি আবার প্রেম-ট্রেম বোঝো নাকি?"

নেড়ু উত্তর না দিয়ে হাতের অর্ধেক খাওয়া পাউরুটিটা ফেলে দিল। তারপর নুরচাচার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আসি গো। রুটিটায় কেমন মেয়েছেলের বুকের গন্ধ। ভাল লাগছে না।"

নুরচাচা একটু অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "কী যা তা বলছিস।"

নেড়ু হাসল, বলল, "সত্যিই বলছি। তুমি খেয়ে দেখো। কচি বুকের গন্ধ।"

"আঃ। যা এখন তুই।" নুরচাচা এবার বিরক্ত হলেন। নেড়ু মাথা চুলকে হাসল একটু। তারপর হাঁটা দিল।

নুরচাচা পেছন থেকে ডাকলেন। বললেন, "অ্যাই, আজ আবার বেশি এদিক ওদিক যাস না। বিকেলের দিকে মিছিল বেরোবে। এতাল-বেতাল ঘুরলে বিপদে পড়বি কিন্তু।"

নেড়ু একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে হাসল। তারপর হাঁটতে লাগল।

সূর্যও আড়মোড়া ভাঙছে ক্রমশ। পাতিলেবু রঙের রোদ চুঁইয়ে নামছে কলকাতার আকাশ থেকে। নেড়ু আকাশের দিকে নাক তুলে একটু শুঁকল। বেশ পাতিলেবুর গন্ধ পাচ্ছে। মাঝে মাঝে এরকম একটু আধটু গন্ধ পায় নেড়ু। এই যেমন পাউরুটিতে একটু আগে কচি মেয়েদের বুকের গন্ধ পেয়েছিল ও। নুরচাচা মানল না বটে, কিন্তু ও পেয়েছিল।

হাঁটতে হাঁটতে আবার মাথা চুলকোল নেড়ু। ওর মাথাটা মসৃণ গুলির মতো। একটা চুলও নেই। ফলে চুলকোতে গেলে আঙুল পিছলে যায়। তবে শীতের জন্য মাথার থেকে খড়ি উঠছে এখন। চুলকাবার সময় নখের তলায় মরা চামড়া ঢুকে যাচ্ছে।

নেড়ুর এখন পাতালরেল স্টেশনে ঢোকার সিঁড়ির পাশে বসার কথা। এখানটায় রোদ এসে পড়ে এ-সময়। তা ছাড়া স্টেশনে ঢোকার সময় লোকজন একটা-দুটো টাকা ছুড়েও দিয়ে যায় ওকে। যদিও, যা টাকাপয়সা পায় তা

BanglaBook.org

বেশির ভাগ দিনই হারিয়ে ফেলে ও। তবু যখন কেউ দেয়, তখন ভাল লাগে ওর। গোল গোল চ্যাপটা চ্যাপটা সব কয়েন। হাতের মুঠোয় ঠান্ডা ধাতু ধরতে খুব ভাল লাগে।

রোদে বসার আগে, একবার দূরে দাঁড়ানো গাড়িটাকে দেখে নিল নেড়ু। চাকা লাগানো, মাথায় ছাউনি দেওয়া একটা ঠেলা গাড়ি। পটেলের ঠেলা। পটেল ধোসা বিক্রি করে। সকাল থেকে রাত, ওর ঠেলা ঘিরে ভিড় হয় খুব। পটেল খুব মন দিয়ে লোককে খাওয়ায়। শুধু লোকজনই নয়, পটেল নেড়ুকেও খাওয়ায়। দুপুরবেলার খাবারটা নেড়ু পটেলের কাছেই পায়।

নেড়ু দেখল পটেল তাওয়া পরিষ্কার করছে মন দিয়ে। ও আশ্বস্ত হল। যাক আজ পটেল এসেছে। আসলে একটা ভয় কাজ করে নেড়ুর। দু'-একবার এমন হয়েছে যে, পটেল দোকান লাগায়নি। সেদিন দুপুরগুলোয় খুব অসুবিধে হয়েছে নেড়ুর। চেয়েচিন্তে খেতে গিয়ে খুব বেগ পেয়েছে ও। তাই প্রতিদিন সকালে এই জায়গায় বসার আগে ও পটেলকে দেখে নেয় একবার। মনে মনে ভরসা পায়।

পাতাল রেলের দেওয়ালে হেলান দিয়ে ফুটপাথে গুটিসুটি হয়ে বসল নেড়ু। রোদের তাপ সামান্য বেড়েছে। মাথার ওপর হালকা গরম স্পর্শ পাচ্ছে। একটু আরাম পেল ও।

ফুটপাথে বসার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার চেহারাটা অন্য রকম হয়ে যায়। প্রথমেই নেড়ুর যেটা নজরে আসে, তা হল, পা। নানা রকমের, নানা ধরনের পা। প্যান্ট পরা, শাড়ি পরা, লুঙ্গি পরা, ধুতি পরা, হাফ প্যান্ট পরা— ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বাচ্চা সব পা। তার পরেই ওর নজরে আসে জুতো। কত ধরনের জুতো!

আজও প্রথমেই ওর পা আর জুতোই নজরে এল। এর মধ্যে একটা জুতো মনে মনে পছন্দও করে ফেলল ও। বেশ লাল আর কালো রঙের গাবদা একটা জুতো। নেড়ু দেখেই বুঝল যে, খুব নরম হবে জুতোটা। ও নিজের পায়ের দিকে তাকাল। ওর পায়েও জুতো আছে। তবে দু'রকমের। একবার ময়লার গাড়ির থেকে ও তুলে নিয়েছিল দুটোকে। এক পাটি রবারের আর অন্য পাটি চামড়ার।

আজ নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল ওর। ইস, ওর যদি এমন একটা গাবদা জুতো থাকত! গাবদা আর নরম! নরম জুতো?

BanglaBook.org

আচমকা স্থির হয়ে গেল নেভু। হঠাৎ মনে হল ওরও তো নরম জুতো ছিল। আকাশি নীল রঙের খুব নরম এক জোড়া জুতো। কিন্তু কবে ছিল? কোথায় ছিল? ওর ছিল? কে ও?

খুব অসহায়ের মতো এদিক ওদিক তাকাল নেভু। কিচ্ছু মনে পড়ে না কেন ওর? মনে পড়ি পড়ি করেও কিচ্ছু মনে পড়ে না কেন? শুধু মাঝে মাঝে একঝলক একটা মাঠ দেখতে পায়, অনেক পায়রায়-ভরা একটা ছাদ দেখতে পায়, সোনার মোটা বালা-পরা হাত দেখতে পায় ও। দেখতে পায় বড় ঝিল, অনেক বই সাজানো ঘরের মধ্যে বসে থাকা একজন মানুষ আর লাল ওয়াটার বটল হাতে দৌড়ে আসা একটা ছোট্ট মেয়ে।

এসব কোন জন্মের স্মৃতি? এইসব মানুষজন কারা? এই কলকাতা শহরে কোত্থেকে এসে পড়ল নেভু? নেভু— কে ওর এই নামটা দিল? অসহায়ের মতো এদিক ওদিক তাকাল নেভু। অনেক গাড়ি, অনেক মানুষ, অনেক অনেক কোলাহল। কেউ চেনা নয়। কিচ্ছু চেনা নয়। বিরাট মেলার মাঝে ও যেন হারিয়ে যাওয়া এক মানুষ। নেভু দেখল দিন গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ।

স্থির হয়ে এই চলন্ত ভিড় দেখতে দেখতে একসময় চোখ বুজে এল নেভুর। দেওয়ালের কোনায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ও। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখল বিশাল বড় একটা দরজা। তার সামনে দিয়ে লাল রাস্তা চলে গেছে। দূরে সাদা টেবিল পাতা রয়েছে ঘাসের ওপর। তার চারিধারে চেয়ার। কারা যেন বসে রয়েছে ওখানে। স্পষ্ট দেখা না গেলেও ওর মধ্যে যে একজন মহিলা রয়েছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। এই বসে থাকা মানুষগুলোর থেকে আবছা কথা শোনা যাচ্ছে, হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ও এগোতে লাগল লাল ওই পথ ধরে। শব্দগুলো বাড়তে লাগল ক্রমশ, হাসিও তীব্র হতে লাগল। আর মহিলাটি? তাকেও তো চেনা মনে হচ্ছে। মহিলাটির পাশ ফেরানো মুখটা দেখল ও। ঘাড়ের ওপর নুয়ে আসা খোপা, গালের পাশে ঝুলে থাকা চুলের কুচি। মহিলাটি চায়ের কাপের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে নাড়ছে। রিনরিন শব্দ হচ্ছে একটা। ও দেখল হাতের সোনার বালাজোড়া শব্দ করছে। ও কাছে এগিয়ে গেল আরও। আর ওর পায়ের শব্দে মহিলাটি মুখ ফিরিয়ে তাকাল এবার। আরে, এ তো...

"এই যে, এই নিন।" আচমকা চোখ মেলে তাকাল নেভু। আর সঙ্গে সঙ্গে কট করে উঠল ঘোর-লাগা চোখটা। সূর্য এসে ধাক্কা মারছে চোখে। চোখ

BanglaBook.org

কুঁচকে নেড়ু ওপর দিকে তাকাল। একটা ছেলে। আলো পেছন দিকে থাকায় নেড়ু মুখটা দেখতে পাচ্ছে না স্পষ্ট। তবু বুঝল, ছেলেটা ঝুঁকে পড়ে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে একটা কয়েন। বলছে, "এই যে, এই নিন।"

নেড়ু কয়েনটা নিল। তারপর শুনল, ছেলেটার পেছনে দাঁড়ানো সুন্দরমতো মেয়েটা বলছে, "ডোন্ট ইগনোর মি লাইক দ্যাট। আমি কী জিজ্ঞেস করছি তোমায়? তুমি আমার কথার উত্তর না দিয়ে ওই বেগারটাতে কনসেনট্রেট করছ কেন? কান্ট ইউ টেক এনিথিং সিরিয়াসলি?"

নেড়ু দেখল ছেলেটা একটু পিছিয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে একটা ক্যামেরা বের করল ব্যাগ থেকে। তারপর সেটা চোখে লাগিয়ে তাগ করল ওর দিকে।

নেড়ুর অবাক লাগল। মেয়েটা ইংরেজি বলে যাচ্ছে সমানে। আর নেড়ু তো দিব্বি বুঝতে পারছে সব কথা! তার মানে ও কি ইংরেজি জানে? নেড়ু দেখল, ছেলেটা, মেয়েটার কথায় উত্তর না দিয়ে ক্যামেরাটার সামনের লম্বা চোঙটা ধরে ঘোরাচ্ছে। হঠাৎ নেড়ু বুঝতে পারল যে, ওর ছবি তোলা হচ্ছে। আর ছবি তোলা হলে কী করতে হয় সেটা নেড়ু জানে। তাই ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ও সোজা হয়ে বসল। তারপর হাসিহাসি মুখ করে বলল, "চিজ।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম সূত্র

অর্চিষ্মান ২৪ ডিসেম্বর, সকাল সোয়া সাতটা

শীতের সকালগুলোয় লেকের রাস্তা ধরে হাঁটতে বেশ লাগে আর্চির। কেমন একটা ঝাপসা দৃশ্যপট। গাছের মাথায় মাথায় ক্যান্ডিফ্লসের মতো কুয়াশা। নানা রঙের টুপি, গ্লাভস আর মাফলার জড়ানো মানুষজন। মর্নিং ওয়াকার। মনে হয় যেন ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে রঙিন কোনও ছবি দেখছে ও।

সকালে ওঠার অভ্যেস নেই আর্চির। অবশ্য অভ্যেস নেই বলাটা ঠিক নয়। কারণ আর্চি যে-কাজ করে তাতে দিনরাত, সকাল-বিকেলের পার্থক্য করলে হয় না। ক্যামেরা নিয়ে কখনও জঙ্গলে, কখনও পাহাড়ে আবার কখনও গঙ্গাসাগর বা কুম্ভমেলায় ঘুরে বেড়াতে হয় ওকে। সেখানে তো আর দিন বা রাতের পার্থক্য করলে হয় না। ছবি তুলতে গেলে সময়ের দিকে তাকালে চলে না।

একবার বর্ধমানের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে সারারাত অন্ধকারে জেগে বসে ছিল আর্চি। তন্ত্র সাধনার এমন কিছু ছবি সেদিন তোলার উদ্দেশ্য ছিল যা সাধারণ মানুষেরা কোনওদিন দেখেনি। আর একবার হিমালয়ের পাদদেশে একটা গ্রামে গিয়ে ভাম বেড়ালের মতো এক জন্তুর পেছনে সারাদিন ঘুরতে হয়েছিল ওকে। এরকম অনেক ঘটনার কথা মনে করতে পারে আর্চি। বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে যেরকম ছবির অ্যাসাইনমেন্ট পায়, সেরকম ছবি তোলার জন্য ওকে ঘুরে বেড়াতে হয় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। তখন বিশ্রাম, ঘুম বা খাওয়ার কথা ঠিক মাথায় থাকে না ওর।

তবে যখন কাজকর্ম থাকে না, তখন রাজ্যের আলসেমি এসে চেপে ধরে ওকে। সারাদিন নানা রকম বিদেশি থ্রিলারের স্তূপ নিয়ে নিজেকে পেরেক দিয়ে পুঁতে রাখে বিছানার সঙ্গে। গত কুড়ি তারিখ ও কলকাতায় ফিরেছে

BanglaBook.org

কাশ্মীর থেকে। চেন্নাইয়ের একটা ম্যাগাজিন ওকে স্নো ফল-এর ছবি তুলে দেবার জন্য ফরমায়েশ দিয়েছে। ফেব্রুয়ারির ভ্যালেন্টাইনস ডে-র জন্য ওদের ট্র্যাভেল অ্যান্ড রোম্যান্স ইস্যুতে ছাপাবে।

ছবিগুলো তুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে ওকে। দেড়-দু'ফুট বরফ ভেঙে কাশ্মীরি গ্রামের ভেতর গিয়ে ছবি তোলা যেমন কষ্টের তেমন আবার উগ্রপন্থার ভয়ও আছে। ও যে-হোটেলে ছিল সেখানকার রুম সার্ভিসের ছেলে জায়েদ ওকে বলেছিল যে, এইসব ক্যামেরা, স্ট্যান্ড, ব্যাগ, লেন্সের বাক্স নিয়ে বেশি ইনটিরিয়ারে না যাওয়াই ভাল। কারণ, 'টেররিস্ট লোগ পসন্দ নেহি করতে।'

কিন্তু সে সব শুনলে কি আর্চির কাজ হত? তাই ওকে ওর ছবি তোলার লটবহর নিয়েই যেতে হয়েছিল। হাড় ফুটো করে দেওয়া ঠান্ডায় সে এক নরক যন্ত্রণা। জায়েদ ওকে বলেছিল, "সাব, চানা চাবাতে রহিয়ে।"

"চানা? কিঁউ?" আশ্চর্য হয়েছিল আর্চি।

"নেহি তো জাবরা আটক জায়েগা।"

অ্যাঁ, ঠান্ডায় চোয়াল আটকে যাবে? তাই চানা চিবিয়ে চোয়াল সচল রাখতে হবে? বেশ অবাক হয়েছিল আর্চি। তবে কথাটা শুনেছিল ও। যে-ক'দিন ওখানে ছিল, বোধহয় দুটো ঘোড়ার খাবার একাই সাবাড় করে দিয়েছে ও।

এই চানার পরামর্শ মানলেও জায়েদের অন্য পরামর্শটা মানতে পারেনি আর্চি। জায়েদ ওকে জোব্বার তলায় কাঙ্গরি নিতে বলেছিল। কিন্তু ওসব নিয়ে কি আর ছবি তোলা যায়? তাই ওটা আর নেয়নি আর্চি। শুধু ছবি তোলবার আগে ঠান্ডায় হাত স্টেডি রাখতে ফ্লাস্কের থেকে গরম জল মেশানো ব্র্যান্ডি খেয়ে নিত একটু। তবে বিশেষ তারতম্য হত না। এটা অনেকটা বেলুন ফাটানোর গুলি দিয়ে বাঘ মারার চেষ্টার মতো হত। তবু যাই হোক, কষ্ট করে হলেও কাজটা শেষ করতে পেরেছে ও। তবে এখনও সেই সব গ্রামের দৃশ্য চিন্তা করলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আর্চির। মাইলের পর মাইল সাদা বরফ, ধূসর আকাশ আর কঙ্কালের মতো গাছে ঘেরা এক একটা গ্রাম। ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে ফোকাস ঠিক করার সময় মাঝে মাঝে বুক কাঁপত আর্চির। মনে হত দূরের ওইসব কঙ্কালসার গাছের জঙ্গল থেকে মুখ বাড়িয়ে কেউ কি দেখছে ওকে? কোনও বন্দুকের নল কি তাগ করে রয়েছে ওর বুকে? কোনও গুলি কি ছুটে আসবে মুহূর্তের মধ্যে? প্রতিদিন কাজ সেরে হোটেলে

BanglaBook.org

ফিরে আর্চি ভাবত, যাক আরেক দিন বেঁচে গেল ও।

গতকাল ছবিগুলোর প্রিন্ট নিয়ে বসেছিল ও। দেখে খুব একটা খুশি হতে পারেনি। ম্যাগাজিনটা ওকে বলেছিল যে, ছবির মুডটা যেন হলিডে আর রোম্যান্স হয়। কিন্তু ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে এই দুটো মুডের একটাকেও দেখতে পায়নি ও। ছবিগুলো খুব পেনসিভ হয়েছে। পেনসিভ আর ইরি। গা-ছমছমে একটা ভাব যেন ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত ছবি জুড়ে। বরফের সাদা রং যেন মৃত মানুষের মুখের মতো লাগছে। গাছগুলোর নগ্ন ডালপালা যেন ইংরেজি হরর ছবি থেকে নেওয়া। এই ছবি দেখে কেউ ওখানে হলিডে কাটাতে যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আর্চি আর কী করবে? যা উঠেছে তাই তো দিতে হবে ওকে। তারপর যদি ওরা রিজেক্ট করে তখন আরেক বার চেষ্টা করা যাবে।

ভারী ব্যাগটা এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিল ও। সামান্য রিনঠিন শব্দ হল ব্যাগের ভেতর। এতে ক্যামেরা রয়েছে। এত সকালে বাড়ি থেকে বেরোলেও ক্যামেরার ব্যাগটা নিতে ভোলেনি আর্চি। আসলে ও কখনওই এই একটা জিনিস নিতে ভোলে না। কখন কোথায় কী সাবজেক্ট পেয়ে যায় কে বলতে পারে?

ঘড়িটা একবার দেখল আর্চি। সাতটা কুড়ি বাজে। আরও মিনিট দশেক সময় রয়েছে ওর হাতে। রাওয়াত আঙ্কলের ওখানে সাড়ে সাতটা নাগাদ যেতে হবে। মেনকা সিনেমার পরেই রাওয়াত আঙ্কলের বিশাল বড় বাড়ি। রাওয়াত আঙ্কল আজ পেমেন্ট দেবেন। চার লাখ টাকা।

এইসব ঝুট-ঝামেলা একদম ভাল লাগে না আর্চির। আরে বাবা, এইসব পেমেন্ট-ফেমেন্ট আনা কি ওর কম্ম? কিন্তু বাবাকে বোঝাবে কে? তবে চেষ্টা করেছিল ও বোঝাতে, সফল হয়নি।

আর্চি ফ্রিলান্স ফোটোগ্রাফার হলেও ওদের বড় পারিবারিক ব্যাবসা আছে। একটা ট্রান্সপোর্ট-সহ সি এন্ড এফ এজেন্টের আর একটা হল অ্যাড এজেন্সির। বিদেশে মাল পাঠাবার এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এজেন্সির সঙ্গে অ্যাডভার্টাইজিং একটা অদ্ভুত কম্বিনেশন হলেও গত কুড়ি বছর ধরে বাবা খুব দক্ষতার সঙ্গে এই দুটো ভিন্ন নৌকায় পা দিয়ে দিব্যি চালাচ্ছে। এখন অবশ্য আর্চির দাদা অহনও ব্যাবসা দেখে। তবে অহন মূলত অ্যাডভার্টাইজিং নিয়েই আছে।

BanglaBook.org

রাওয়াত আঙ্কল বাবার পুরনো ক্লায়েন্ট। বিভিন্ন রকম খাদ্যশস্যের এক্সপোর্ট করেন বিদেশে। বিশেষ করে বাংলাদেশে। ওঁর এই এক্সপোর্টের ক্যারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট হল বাবার কোম্পানি।

আর্চি কোনও অ্যাসাইনমেন্ট সেরে বাড়িতে ফিরলেই বাবা রে রে করে লেগে পড়ে ওর পেছনে। কী? না অনেক ক্যামেরা নিয়ে খেলাধুলো হয়েছে, এবার ওসব যন্ত্রপাতি রেখে ব্যবসায় বোসো। বাবাকে আর্চি অনেক বুঝিয়েছে যে, আম গাছে আমড়া হয় না। কিন্তু বাবা উলটে রেগে গেছে। বলেছে, "কোনটা আম আর কোনটা আমড়া তা বোঝার বয়স তোমার হয়নি।" আর্চি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গেলেও সফল হয়নি। আসলে বাবার জীবনে একটাই যুক্তি, সেটা হল আর্চিকে ব্যবসায় বসতে হবে। তাই সুযোগ পেলেই বাবা ওকে দিয়ে ব্যবসার এটা-ওটা কাজ করিয়ে নেয়।

গতকাল রাতেই যেমন খাবার টেবিলে বলেছিল, "আর্চি, তুমি কাল সকালে মিস্টার রাওয়াতের বাড়ি গিয়ে পেমেন্ট নিয়ে আসবে।"

"আমি? কেন?" অবাক হয়েছিল আর্চি।

"কারণ আমি বলছি তাই। শোনো, ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় ওঁর বাড়ি চলে যাবে। উনি দিয়ে দেবেন।"

"সাড়ে সাতটার সময়?" সামান্য ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল আর্চির, "অত সকালে?"

"অত সকাল মানে? যখন ক্যামেরা নিয়ে ছাগল-গোরুর ছবি তোলার জন্য ভোরবেলা উঠে কুস্তি করো, তখন 'অত সকালে!' বলো? শোনো, মেনকা সিনেমার পাশের বড় পাঁচিল ঘেরা বাড়িটাই হল মিস্টার রাওয়াতের। দেখলেই বুঝতে পারবে। ওরকম বড় বাড়ি একটাই আছে ওখানে। ঠিক সাড়ে সাতটায় পৌঁছে যাবে। উনি চার লাখ টাকার চেক দেবেন। চেকটা নিয়ে বাড়িতে এসে ডিপোজিট বইয়ে লিখে জমা করে দেবে। হাইভ্যালু চেক, তাড়াতাড়ি ক্যাশ হয়ে যাবে। মনে থাকে যেন পরশু পঁচিশে ডিসেম্বর, ছুটির দিন, তার পরের দিন রোববার। কালকে ফার্স্ট আওয়ারে চেকটা জমা পড়া চাই।"

মেজাজ খারাপ করে কোনওমতে খেয়েদেয়ে উঠে পড়েছিল আর্চি। বাবা সবসময় ফালতু ঝামেলা বাধায়। আর রাওয়াত আঙ্কলই বা কী? ব্যাবসার টাকা অফিসে দে, না সাত সকালে বাড়িতে গিয়ে আনতে হবে। বিরক্তির

BanglaBook.org

একশেষ। ও ভাবল, কেউ কি রাওয়াত আঙ্কলের অফিস থেকে গিয়ে চেকটা আনতে পারত না?

আর্চির মাথা গরম হওয়ার আরেকটা কারণও ছিল। সকাল আটটায় যে ওর ইরার সঙ্গে দেখা করার কথা রাসবিহারী মোড়ে! এমনিতে গত কয়েক মাসের ঘটনায় ইরা টাইমবোম হয়ে আছে। তার মধ্যে যদি সকাল আটটায় দেখা না করে তা হলে বোমা ফাটতে সময় লাগবে না একটুও। এখন রাওয়াত আঙ্কল যদি চেক দিতে ঝোলায় তা হলে ঝঞ্ঝাটের আর বাকি থাকবে না।

ও তাই খাওয়ার পর অহনের ঘরে গিয়েছিল। ভেবেছিল দাদা যদি উদ্ধার করে ওকে।

অহন খাটে আধশোয়া হয়ে কোলের ওপর ল্যাপটপ রেখে কিছু একটা টাইপ করছিল। আর্চি গিয়ে দাঁড়াতেই অহন মুখ তুলে তাকিয়েছিল, "কী রে ভাই, কিছু বলবি?" অহনের বয়স বছর তিরিশেক হলেও ওর গলায় আওয়াজটা কিশোর বয়সেই আটকে আছে যেন। আর অহনের স্বভাবটাও নরমসরম। যেন ডমিনেটেড হওয়ার জন্যই ওর জন্ম। আর্চির মতে অহন খানিকটা ইনকনসিসটেন্টও। হঠাৎ হঠাৎ ওর মুড শিফ্‌ট হয়। যদিও অহন নিজে মানে না এটা।

আর্চি বলেছিল, "দাদা, মাইরি উদ্ধার কর আমায়। এসব রাওয়াত-টাওয়াতের পাল্লায় পড়লে সব গুবলেট হয়ে যাবে। ইরা এবার সত্যিই ঘাড় ধাক্কা দেবে আমায়।"

অহন সামান্য হেসে বলেছিল, "কেন, ইরার আবার কী হল?"

"আরে কাল সকাল আটটায় রাসবিহারী মোড়ে দেখা করতে বলেছে, ভীষণ আর্জেন্ট নাকি। ঠিক সময়ে পৌঁছোতে না পারলে ব্যাপক খচে যাবে। দাদা, তুই গিয়ে পেমেন্টটা নিয়ে আয় না।"

অহন হেসে বলেছিল, "দেখ, বাবা ও-সময় বাড়িতেই থাকে। আমি যেতেই পারি, কিন্তু তার পরের ঝঞ্ঝাটটা কে সামলাবে? আর দু'-পাঁচ মিনিট দেরি হলে ইরাকে ম্যানেজ করতে পারবি না?"

আর্চি বলেছিল, "ইরা ব্যাপক রেগে আছে, অন্য সময় হলে ম্যানেজ হত, কিন্তু এখন হবে না। রাওয়াত আঙ্কল যদি লেট করিয়ে দেয় তা হলেই গন্ডগোল হবে। প্লিজ, কিছু একটা কর।"

অহন ধীর গলায় বলেছিল, "একটা কাজ কর, তুই চেকটা নিয়ে রাসবিহারী

BanglaBook.org

মোড়ে চলে যাস। আমি অফিস যাওয়ার পথে তোর সঙ্গে ওখানে মিট করে চেকটা নিয়ে নেব। জমাটা করিয়ে দেব আমি, কেমন?"

কী আর করবে? অগত্যা রাজি হয়েছিল আর্চি।

বুক পকেটের ফোনটা টুং টুং শব্দ করে বেজে উঠল। মেসেজ এসেছে। আর্চি ফোনটা বের করে মেসেজটা পড়ল— DONT FRGT, RBMORE, 8 SHARP। ইরা পাঠিয়েছে। রিমাইন্ডার। নাঃ, আজকের অ্যাপোটা মিস করা যাবে না। প্রায় মাসখানেক দেখা নেই ইরার সঙ্গে। সেই কাশ্মীর যাওয়ার আগে দেখা হয়েছিল একবার। তাও মিনিট পনেরোর জন্য। গোটা সময়টাতেই খুব রাগারাগি করেছিল ইরা। আর্চিকে একটা কথাও বলতে দেয়নি। অবশ্য রাগারাগি করার কারণ ছিল যথেষ্ট।

কুড়ি তারিখ ফিরে বেশ কয়েক বার ইরার মোবাইলে ফোন করেছিল ও। কিন্তু প্রতি বারই ইরা কেটে দিয়েছে কল। তারপর হঠাৎ গতকাল বিকেলে ফোন করেছিল ইরা। খুব সংক্ষেপে, আজ সকাল আটটায় দেখা করার কথা বলে ফোনটা কেটে দিয়েছিল ও। আর্চি জিজ্ঞেস করার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি কেন এই জরুরি তলব। তবে তলব যখন, তখন তামিল করতেই হবে।

আর্চি পকেটে ফোনটা ঢুকিয়ে আবার হাঁটা দিল। ওই মেনকা সিনেমার পাশের বড় বাড়ির পাঁচিলটা দেখা যাচ্ছে।

আর্চি বিরাট লোহার গেটটার সামনে গিয়ে দেখল দু'জন দারোয়ান দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। আর্চিকে দেখেই দু'জনে গম্ভীর হয়ে নিজেদের কড়া ও কর্তব্যনিষ্ঠ প্রমাণ করতে ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে। আর্চি ওদের নিজের নাম আর কোথা থেকে আসছে বলল। দারোয়ানদের একজন গেটের ভেতরের ছোট্ট গুমটিতে ঢুকে ফোন করল বাড়ির ভেতর। কিছুক্ষণ কথা বলে আবার ফিরে এল গেটের কাছে। গম্ভীর গলায় বলল, "আপ অন্দর যাইয়ে সাব।"

আর্চি ধন্যবাদ দিয়ে এগোতে যাবে এমন সময় দ্বিতীয় দারোয়ান নিজের অন্তরাত্মার ডাকে কর্তব্যে নেমে পড়ল। সে বলল, "ঠহরিয়ে বাবু, ই ব্যাগ মে কা হ্যায়?"

আর্চি ক্যাজুয়ালি বলল, "বম্ব..."

"হাঁ? বাম্বওয়া?" দ্বিতীয় জনের সঙ্গে প্রথম জনও লাফিয়ে উঠল এবার।

BanglaBook.org

আর্চি হাত তুলে বলল, "নেহি হ্যায়। ক্যামেরা হ্যায়।"

দ্বিতীয় জন দারোয়ান তার ভীত মুখে রাগের ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বলল, "অ্যায়সা মশকরি না করো সাব।"

আর্চি আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরে হাঁটা দিল।

গেট দিয়ে ঢুকতেই ডান দিকে বিরাট বড় লন। আর সেই লন ঘিরে চারটে বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর চার জন মানুষ মাঙ্কি টুপি আর সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে, হাফ প্যান্ট পরে সেই গাড়িগুলো ধোয়ামোছা করছে। এর মধ্যে একটা গাড়ি দেখে আপনা আপনি থেমে গেল আর্চি। এ বাবা, এটা কার গাড়ি? এমন ক্যাটক্যাটে গোলাপি রঙের গাড়ি চড়ে কে? তার ওপর বনেটে একটা ছোট্ট হনুমানজির মূর্তি। সম্ভবত রুপোর। অদ্ভুত দেখতে লাগছে গাড়িটাকে। নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে দামি গাড়ি, কিন্তু এমন বিটকেল রং করিয়েছে কেন কে জানে? মানুষের যে কী খেয়াল!

লন থেকে একটু হেঁটে গেলেই মূল বাড়ির সিঁড়ি। বাড়িটা সাদা আর আকাশি নীল রং করা রাজপ্রাসাদ যেন। লনের থেকে থাক থাক শ্বেত পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে বাড়ির মধ্যে।

আর্চিকে কিন্তু বাড়ি অবধি যেতে হল না। ও দেখল রাওয়াত আঙ্কল কালো সুট পরে বেরিয়ে আসছেন বাড়ি থেকে। পেছনে দু'জন ভৃত্য ঢাউস দুটো সুটকেস বয়ে আনছে। রাওয়াত আঙ্কলকে যতবার দেখেছে আর্চি, ততবারই মনে হয়েছে এত সুন্দর দেখতে হতে পারে মানুষ! আজ কালো সুট পরা অবস্থাতেও সেই কথাটাই মনে হল ওর। কিন্তু এত লটবহর নিয়ে কোথায় চললেন মানুষটা? ওর চেকের কী হবে?

আর্চিকে দেখে সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়লেন রাওয়াত। তারপর ঘড়ির দিকে তাকালেন। ভুরু দুটো কুঁচকে রয়েছে সামান্য। আর্চি কিছু বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

রাওয়াত চোয়াল শক্ত করে বললেন, "ইউ আর টু মিনিটস্ লেট। আই ডোন্ট লাইক ইট।"

আর্চি ঘড়ি দেখল, সাতটা বত্রিশ।

রাওয়াত বললেন, "আমি তো ভাবলাম তুমি আসবে না। মিস্টার রয় ফোন করেছিলেন একটু আগে। জিজ্ঞেস করছিলেন, তুমি এসেছ কি না? আমি তো এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম!"

BanglaBook.org

"কলকাতার বাইরে?" আর্চি জিজ্ঞেস করল।

রাওয়াত বললেন, "হ্যাঁ, কলকাতার বাইরে। তবে এখন নয়। আমি সন্ধেবেলার ফ্লাইটে যাব। বাই দ্য ওয়ে ইউ আর হিয়ার ফর ইয়োর পেমেন্ট, রাইট?"

আর্চি হেসে মাথা নাড়ল।

রাওয়াত কোটের ভেতরের পকেট থেকে লম্বা মতো একটা ফোল্ডার বের করলেন, তারপর তার ভাঁজ থেকে বের করে আর্চির দিকে এগিয়ে দিলেন একটা চেক। আর্চি হাত বাড়িয়ে চেকটা নিল। রাওয়াত বললেন, "মানি রিসিপ্ট আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো, ও কে?"

আর্চি চেকটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে মাথা নাড়ল। রাওয়াত আর দাঁড়ালেন না, এগিয়ে গেলেন ওই গোলাপি গাড়িটার দিকে। ও, তা হলে রাওয়াত আঙ্কল নিজে এই গাড়িতে চড়েন!

আর্চি শুনল রাওয়াত আঙ্কল গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন, "কিষণ, ইয়ে দো সুটকেস এয়ারপোর্ট ভেজ দিয়ো, উহা সে সুরিন্দর লে জায়েগা আপনে সাথ। অর সুরিন্দর কো কহনা কি ম্যায় সামকি ফ্লাইট সে পহুচুঙ্গা।"

কিষণ মাথা নাড়ল।

আর্চি দেখল রাওয়াত আঙ্কল গোলাপি গাড়িতে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভুরু কুঁচকে কিষণকে জিজ্ঞেস করলেন, "কালকে তোমায় টাকা দিয়েছিলাম না গাড়িতে তেল ভরতে, সেটার হিসেব কী হল?"

কিষণ পকেট থেকে একটা সাদা কাগজ আর স্লিপ বের করে রাওয়াতের হাতে দিল। রাওয়াত স্লিপ দেখে টাকা মেলাতে লাগলেন। আর তারপরই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, "এক রুপিয়া কম কিউ হ্যায়? কাঁহা হ্যায় এক রুপিয়া?"

আচমকা চিৎকারে গেটের দিকে হাঁটতে থাকা আর্চি থমকে দাঁড়াল। ও শুনল রাওয়াত চিৎকার করছেন, "জানো না তুমি, পাই পয়সার হিসেব মিলিয়ে দিতে হয়? জানো না, এক একটা টাকার গুরুত্ব? কোথায় এক টাকা? এক টাকার হিসেব মিলছে না কেন? কেন মিলছে না, হারামখোর?"

আর্চি দেখল গাড়ি ধুতে থাকা মানুষগুলো থতমত খেয়ে এক টাকার জন্য চিৎকার করতে থাকা তাদের মালিককে দেখছে। রাওয়াত স্বর্গ-মর্ত-পাতাল

BanglaBook.org

তোলপাড় করা চিৎকার শুরু করেছেন। আর্চি ভাবল, এক টাকা বড় ভয়ংকর জিনিস। এরকম কোটি কোটি এক টাকা মিলেই না এত বড় পাঁচিল ঘেরা বাড়ি, এত সুন্দর লন, এরকম কিম্ভূত রঙের গাড়ি হয়েছে। সেই এক টাকার হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না?

রাওয়াতের চিৎকারে তটস্থ কিষণ পকেট থেকে এক টাকা বের করে রাওয়াতের হাতে দিল। আর্চি দেখল ফরসা রাওয়াত আঙ্কলের মুখটা ঠিক ওঁর গাড়ির মতো রঙের হয়ে গেছে। হাসি পেল আর্চির। এক টাকার জন্যও কেউ এমন চিৎকার করতে পারে ও জানল। ও জানল, এক টাকার জন্য মানুষকে 'হারামখোর' পর্যন্ত শুনতে হয়!

গেট দিয়ে বেরিয়ে আর্চি দেখল ঘড়ির বড় কাঁটা পৌনে আটটা পার করছে। এই রে, এখান থেকে রাসবিহারী মোড়ে হেঁটে যেতে প্রায় কুড়ি মিনিট লাগে। আজ যদি ইরাকে অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে তো হালত খারাপ করে ছাড়বে ওর। এমনিতেই ইরা খেপে আছে ওর ওপর। আর্চি জোরে পা চালাল।

"এক্সকিউজ মি, ক'টা বাজে?"

আর্চি তাকাল। একটা ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ছেলে। কাঁধে লম্বা মতো একটা ড্রইংহোল্ডার আর হাতে একটা বড় ক্লিপবোর্ড নিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে সময় জিজ্ঞেস করছে। ছেলেটা বেঁটে আর বেশ ফরসা। বিড়াল চোখ। এরকম চোখের লোক দেখলে অস্বস্তি লাগে আর্চির। কেন, তা ও জানে না, কিন্তু লাগে। আর্চি তাড়াতাড়ি সময় বলে হাঁটতে লাগল। আর্চি দেখল বিড়াল-মানুষটা ওর চেয়েও দ্রুত পায়ে চলে গেল সামনে দিয়ে।

লেকের এই রাস্তাটা ছায়া ছায়া হলেও, এস পি মুখার্জি রোডের দিকে সূর্য তার সমস্ত আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে। গত মাসখানেক কাশ্মীরে থাকার দরুন এখানে ওর তেমন ঠান্ডা লাগছে না। যদিও আজ হাওয়া দিচ্ছে, তবু এস পি মুখার্জি রোডে এসে বেশ গরম লাগল আর্চির। এখান থেকে রাসবিহারী মোড়টাও দেখা যাচ্ছে। ও ভাবল, যাক আর দেরি হবে না।

আবার মোবাইলটা বেজে উঠল পকেটে। ধ্যাত্তেরি! বিরক্ত লাগল আর্চির। এই মোবাইল জিনিসটা ওর মতে নেসেসারি ইভিল। মোটেই ভাল লাগে না ওর। কিন্তু কিছু করার নেই। এটা ছাড়া তো আর এখনকার দিনে চলার উপায় নেই।

BanglaBook.org

আর্চি ফোনটা ধরল, "হ্যালো?"

"কী রে মালটা? ফিরলি কবে?"

এই রে, নানু ফোন করেছে। ঠিক খবর পেয়ে গেছে যে, ও কলকাতায় ফিরে এসেছে। ঠোঁট কামড়াল আর্চি। স্ক্রিনে নম্বরটা না দেখে ফোন ধরাটা ঠিক হয়নি একদম। এবার নানুর হাজার রকম আবদার শুরু হবে। ছেলেটা ওকে কী ভাবে কে জানে? যখনই কিছু দরকার পড়ে নানু ফোন করে আর্চিকে। সে ওর মামাতো দাদার ছেলের স্কুলে ভরতির ফর্ম থেকে, ইডেনে টেস্টের টিকিট বা শেষ মুহূর্তে ট্রেনের রিজার্ভেশন, সব কিছুতেই নানু ফোন করে ওকে। এটা ঠিক যে, কাজের সূত্রে আর্চির যোগাযোগটা খুব ভাল, প্রচুর মানুষের সঙ্গে ওর জানাশোনা, তা হলেও, সব কি আর ও পারে? তবে হ্যাঁ, চেষ্টা করে ও। ইচ্ছে বা অনিচ্ছে নিয়েই চেষ্টা করে। তবে এখন, এই মুহূর্তে আর নানুর আবদার মেটাতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কী করবে, ব্যাটা তো ফোনের অন্য প্রান্তে বসে রয়েছে।

আর্চি বলল, "এই কয়েক দিন আগে ফিরলাম।"

"আমায় ফোন করিসনি কেন রে?"

আর্চি ভাবল, বলে যে, নানু কোন হরিদাস যে ওকে ফেরার খবর দিতে হবে? ও তবু নরমভাবে বলল, "করতাম আজকালের মধ্যে।"

নানু হাসল, "তা হালুয়া এনেছিস তো আমার জন্য?"

"হালুয়া? মানে?" অবাক হল আর্চি।

"তুই লাদাখ আর লে-তে গিয়েছিলি না? লে হালুয়া, শুনিসনি?" খিকখিক করে হাসল নানু।

"ব্যাড জোক। আর আমি কাশ্মীর গিয়েছিলাম, বুঝলি?"

"কাশ্মীর? আরিব্বাস, সেখান থেকে আপেল এনেছিস তো?"

"আপেল? কী আবোলতাবোল বকছিস?"

"আপেলও আনিসনি? অন্তত দু'-চারটে কাশ্মীরি মেয়ে এনেছিস নিশ্চয়ই? ওঃ, যা সব দারুণ জিনিসপত্তর আছে না ওখানে!"

আবার ধৈর্য হারাল আর্চি। বলল, "কী দরকার বল না, তখন থেকে ভাট বকছিস। এবার ফোন কেটে দেব কিন্তু।"

নানু একটু থমকাল, তারপর আবদারের গলায় বলল, "খুব দরকার তোর সঙ্গে, আজ বেলা দুটো নাগাদ আমাদের বাড়িতে আসতে পারবি?"

BanglaBook.org

"বেলা দুটো নাগাদ? কেন?"

"আরে আমার পিসি আর পিসতুতো বোন আসবে। পিসতুতো বোনটার কয়েকটা ছবি তুলে দিতে হবে। বিয়ের জন্য।"

"স্টুডিয়োয় যা। আমি কি এসব ছবি তুলি নাকি?" বিরক্ত লাগল আর্চির।

নানু নাছোড় গলায় বলল, 'প্লিজ ভাই, আমি বড় মুখ করে বলেছি পিসিকে। এভাবে ঝোলাস না, পুরো কেলো হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললি তো। তোর বড় মুখ চিরে কুমিরের মতো করে দিতে ইচ্ছে করছে আমার। শালা, তোর এটা মুখ না ঝামেলার বাক্স?"

নানু বলল, "দেখ, বেশিক্ষণ তো তোর লাগবে না। ঝটাঝট মেরে দিবি। দুটোয় আসবি সোয়া দুটোর মধ্যে কাম তামাম, ব্যস।"

আর্চি চিন্তা করল। ওকে কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য দু'-চার জায়গায় দেখা করতে হবে, তারপর যাবে জনিদার কাছে। এখন জনিদা যদি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয় তা হলেও সব মিটিয়ে দুটোর মধ্যে পারবে কি না কে জানে! ও বলল, "ওটা আড়াইটে কর।"

নানু উত্তর দিল, "হবে না রে। পিসিদের চারটে নাগাদ ট্রেন আছে হাওড়া থেকে। আজ আবার মহামিছিল বেরোবে তো তিনটে নাগাদ। পুরো কলকাতা দাঁড়িয়ে যাবে। আড়াইটের মধ্যে পিসিরা বেরিয়ে যাবে। তুই ভাই দুটোতেই কর। প্লিজ।"

আর্চি দেখল, এ ভবি ভোলার নয়। ও তাই রাজি হয়ে গেল নিরুপায় হয়ে, এতে অন্তত এখনকার মতো নানুর হাত থেকে রেহাই পাবে। ও রাজি হওয়ামাত্র, ছোট্ট করে ধন্যবাদ দিয়ে ফোনটা কেটে দিল নানু, ব্যাটা দরকারের এক সেকেন্ড বেশি কথা বলে না।

হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলছিল আর্চি। এবার ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে দেখল রাসবিহারী মোড় এসে গেছে প্রায়। দূরে সালোয়ার আর জ্যাকেট পরা ইরাকে দেখতে পেল ও। ইরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। এটা ইরা বরাবর করে। অপেক্ষা করার সময়, যে-দিক থেকে আর্চির আসার সম্ভাবনা থাকে তার বিপরীতে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে ও। এ ওর এক অদ্ভুত ছেলেমানুষি। ওর মতো করে বোঝাতে চাওয়া যে, আর্চিকে তেমন পাত্তা দেয় না ও।

আর্চির হাসি পেল। ও এগিয়ে গেল মোড়ের দিকে। রোদটা আস্তে আস্তে তার রোয়াব বাড়ালেও হাওয়া দিচ্ছে বেশ।

BanglaBook.org

ও ইরার কাছে গিয়ে বলল, "এই যে আমি এসেছি।"

ইরা ঘুরল, মুখে রাগ। গম্ভীর গলায় বলল, "আমায় উদ্ধার করেছ।"

আর্চি হাসল, বলল, "ক্ষণেক দাঁড়াও বন্দিনী, খিদে পেয়েছে। দুটো বিস্কিট খাই।"

ফুটপাথের একটা ট্যারা-ব্যাঁকা চায়ের দোকানে গিয়ে দু'টাকার দুটো কয়েন দিয়ে দুটো বিস্কিট নিল আর্চি। দোকানদার ওকে এক টাকা ফেরত দিল।

বিস্কিটে কামড় দিয়ে ও ইরার দিকে তাকাল, "বলো, কী বলবে।"

ইরা যেন এই ফুলটস বলটার জন্য দু'হাজার বছর ধরে মাটি কামড়ে পড়ে ছিল ক্রিজে। ও বলল, "তোমায় বলার মতো কী থাকতে পারে আমার? আর বললেও তুমি শুনবে? কী চাও তুমি? কী চাও?"

আর্চি প্রথম বিস্কিটটা শেষ করে, দ্বিতীয়টায় কামড় দিল। বিস্কিটটা বেশ ভাল।

ইরা বলল, "বাবা লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়েছে আমায়। বলেছে হি ইজ আপসেট উইথ ইউ। গত অক্টোবরে বাবা সময় দিল তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য, তুমি মিস করলে। গত নভেম্বরে কাশ্মীর যাওয়ার দিন সকালে বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে রইল, তুমি এলেই না। এর পরও ভাবো, বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে? মা প্রথম থেকেই তোমার বিপক্ষে, আর এখন বাবাও আমার প্রতি তোমার কমিটমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। তুমি বলো, আমি কী করব? কী করব আমি?"

আর্চি দ্বিতীয় বিস্কিটটাও শেষ করল। আঃ, দারুণ খেতে। খিদের জন্যই বোধহয় আরও বেশি ভাল লাগছে। আর্চি ভাবল আরও দুটো কেনে। ইরার কথার মধ্যেই ও পেছনে ফিরে দোকানটাতে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল, আর তখনই দৃশ্যটা চোখে পড়ল ওর।

একটা শতছিন্ন চাদর জড়িয়ে পাতালরেলের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ঘুমোচ্ছে, ন্যাড়া মাথার একটা ভিখিরি গোছের লোক। লোকটার চোখটা সামান্য খোলা, মুখটা হাঁ। ভীষণ অসহায় ভঙ্গি। আর্চি থেমে গেল। তারপর গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। লোকটাকে জাগানো প্রয়োজন। এর মুখটা খুব ইন্টারেস্টিং। যেন পৃথিবীর সমস্ত অসহায়তা, দুঃখ আর নিস্তব্ধতা এসে জড়ো হয়েছে এই মুখটায়। এর ছবি তুলতেই হবে। ও হাতে ধরা এক টাকার কয়েনটা ন্যাড়া লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে,

BanglaBook.org

এই নিন।" ঘুম ভেঙে লোকটা চোখ মেলল। চোখে রোদ লাগছে বলেই বোধহয় চোখ কোঁচকাল। আর্চি আবার বলল, "এই যে, এই নিন।" লোকটা এবার কয়েনটা নিল।

আর্চি পিছিয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল লোকটার সামনে তারপর ব্যাগের থেকে ক্যামেরা বের করে তাগ করল লোকটার দিকে। ও শুনতে পেল পেছন থেকে ইরা বলছে, "ডোন্ট ইগনোর মি লাইক দ্যাট। আমি কী জিজ্ঞেস করছি তোমায়? তুমি আমার কথার উত্তর না দিয়ে ওই বেগারটাতে কনসেনট্রেট করছ কেন? কান্ট ইউ টেক এনিথিং সিরিয়াসলি? ডু ইউ কেয়ার ফর মি অর নট?"

আর্চি লেন্স ঘুরিয়ে ফোকাস করে শাটার টিপতে যাবে এমন সময় ওকে অবাক করে ন্যাড়া মানুষটা বলে উঠল, "চিজ।" এ লোকটা কে? হাসার সময় চিজ বলতে হয় লোকটা জানল কী করে? অবাক আর্চি তিন-চারটে ছবি তুলে ফেলল। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে হেসে, গিয়ে দাঁড়াল ইরার সামনে। এতক্ষণ টানা কথা বলে যাওয়া ইরা যেন খানিকটা ক্লান্ত হয়েই চুপ করে গেছে।

আর্চি বলল, "বলো, আমি কী করব? কী করলে তোমার বাবা বিশ্বাস করবেন যে, আমি তোমার প্রতি সিরিয়াস?"

ইরা ছলছলে চোখে বলল, "মা তো এই এক মাসে পাত্র প্রায় পছন্দ করেই ফেলেছে। আমি যে কী করে ঠেকিয়ে রেখেছি, তা আমিই জানি। তুমি একটুও সিরিয়াস হবে না অর্চিম্মান?"

আর্চি বলল, "বলো, কী করব? আমার ভুল হয়েছিল, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে দু'বার মিস করেছি। কিন্তু আমার কাজই এরকম যে, হঠাৎ হঠাৎ এখান ওখান থেকে ডাক আসে। তুমি বলো না কী করতে হবে আমায়?"

ইরা এক মুহূর্ত থামল, তারপর বলল, "আজ বিকেল সোয়া তিনটের সময় বাবা দেখা করতে বলেছে, ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে, বাবার অফিসে। ঠিক সোয়া তিনটে। আমি তোমার জন্য ঠিক তিনটের সময় প্রিয়া সিনেমার সামনে ওয়েট করব। বাবা বলেছে এটাই তোমার লাস্ট চান্স। আর আমি তোমায় বলছি, যতই তোমায় আমি ভালবাসি না কেন, আজ ঠিক সময়ে না এলে আমিও তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না। ইটস ফাইনাল। সবসময় তুমি আমায় ইগনোর করবে তা হয় না। আজ তিনটের সময় প্রিয়ার সামনে এসো। দেখব

BanglaBook.org

তুমি আমার প্রতি কতটা কমিটেড। মানে আদৌ কমিটেড না জাস্ট টাইম পাস করছ আমাকে নিয়ে। তিনটের এক মিনিট পর হলে জেনো আওয়ার রিলেশনশিপ ইজ ওভার। আর এর মধ্যে কোনও ফোন করবে না আমায়। কোনও বাহানা দেবে না। আমি মোবাইল অফ করে রাখব। বুঝেছ?"

আর্চি বলল, "শোনো ইরা, প্লিজ রাগ কোরো না। শোনো..."

ইরা কঠিন গলায় বলল, "ঠিক তিনটে, প্রিয়ার সামনে।"

আর্চিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ইরা চলে গেল।

শিট্, নিজের মনেই বলল আর্চি। এইজন্য সকালবেলা ডেকে পাঠিয়েছিল ইরা? আর্চির মনটা খারাপ হয়ে গেল। ইরা ভীষণ একগুঁয়ে মেয়ে, যা ভাববে তাই করবে। এখন বিকেল অবধি টেনশন খাও বসে বসে। ওঃ, আজ সকাল থেকেই গন্ডগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। আর্চি ঘড়ি দেখল। সোয়া আটটা বাজে, মনটা তেতো হয়ে আছে। দাদা বলেছে আসবে। কখন আসবে? ন'টায় তো অফিসে যায় দাদা। তার আগে নিশ্চয়ই আসবে। আর্চি ফোনটা বের করল, তারপর অহনের নম্বরটা ডায়াল করে কানে লাগাল। ওই গান বাজছে— কলার টিউন।

কানে ফোনটা ধরে পাশে তাকাল আর্চি। ন্যাড়া লোকটা আর জায়গায় নেই। তবে দেওয়ালের নীচে একটা বড় পোস্টার চোখে পড়ল— 'বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে চব্বিশে ডিসেম্বর বেলা তিনটের মহামিছিলে সকলে যোগদান করুন। দক্ষিণে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে শুরু করে ময়দান অবধি আর উত্তরে মহম্মদ আলি পার্ক থেকে শুরু করে ময়দান অবধি। এই মিছিলে শহরের সকল মানুষকে যোগদানের আহ্বান করা হচ্ছে।'

আর্চি স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল পোস্টারটার দিকে। বিকেল তিনটের সময় দেশপ্রিয় পার্ক থেকে মিছিল! দেশপ্রিয় পার্কের পাশেই তো প্রিয়া সিনেমা। সেখানেই তো অপেক্ষা করবে ইরা। আর সময়টাও তিনটে। ওকে তখনই তো পৌঁছোতে হবে ওখানে। চিনচিনে একটা টেনশন শিরদাঁড়া বেয়ে উঠতে লাগল আর্চির। ফোন বেজেই চলেছে, উত্তর দিচ্ছে না দাদা... বিকেল তিনটে... ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারবে তো ও? কোনও গন্ডগোল হবে না তো?

BanglaBook.org

অহন ২৪ ডিসেম্বর, সকাল সোয়া আটটা

মুখ ধুতে ধুতে মোবাইলের রিং শুনতে পেল অহন। ওর ঘরের থেকে আওয়াজটা আসছে। কে ফোন করল এ-সময়? ও এক মুহূর্ত ভাবল ফোনটা গিয়ে ধরবে কি না, কিন্তু তারপরই ভাবল মুখটা তো এখনও সম্পূর্ণ ধোয়া হয়নি!

অহনের জীবনে অবসেশন বলতে হল দাঁত। ওর দাঁত যাতে পরিষ্কার থাকে সে ব্যাপারে ও সবসময় সচেতন। সেইজন্য ও কখনও সিগারেট ছোঁয়নি, পারতপক্ষে চকোলেট বা কোল্ড ড্রিঙ্কও খায় না, টক এড়িয়ে চলে। আর প্রতিবার খাওয়ার পরে খুব ভাল করে মুখ ধোয় ও। ছোটবেলায় কোথায় যেন পড়েছিল অহন যে, দাঁত মানুষের পার্সোনালিটিকে রিফ্লেক্ট করে। তাই তখন থেকেই দাঁতের প্রতি অহন ভীষণ যত্নবান। কিন্তু তাতেও কি ওর পার্সোনালিটি এল? আশেপাশের কেউই তো খুব একটা মানে না ওকে, সবাই তো তরতর করে ওর মাথায় উঠে যায়। অহন বুঝেছে যে, পার্সোনালিটি হল সেই জিনিস যা থাকলে অন্য লোকেদের মাথায় ওঠা যায়। আর এও বুঝেছে যে, দাঁতের সঙ্গে এর উর্ধ্বতন বা অধস্তন কোনও পুরুষেরই কোনও সম্পর্ক নেই।

কিন্তু অহন কী করবে? ছোটবেলা থেকেই ও নরমসরম। কিছুটা লাজুকও। নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলো ঠিকঠাক বলতে পারে না অন্যদের। সবাইকেই অতিরিক্ত সম্মান দিয়ে কথা বলে। ও বোঝে, এখনকার দিনে ভদ্রতাকে সবাই দুর্বলতা ভাবে। তবু নিজেকে বদলাতে পারে না কিছুতেই।

ফোনটা এখনও বেজে চলেছে। ফোন বাজলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটাকে ধরতে পারছে, ততক্ষণ অহনের মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি হয়। এই যেমন এখন হচ্ছে। মনে হচ্ছে, পাঁজরের নীচে চারটে চড়াই পাখি ছটফট করছে খুব। এদিকে মুখটা ধোয়াও একটু বাকি। কী করবে ও? অহনের অস্বস্তি হচ্ছে খুব। ঋ থাকলে বলত, "এই হচ্ছে ক্যালাস মানুষদের সমস্যা। বল খেলবে না ছাড়বে, ঠিক করতে করতেই উইকেট দিয়ে দেয় তারা। অহন, এত বড় হলে, তবু কনফিডেন্স, ডিসিশন এসব শব্দ তোমার ডিকশনারিতে তৈরি হল না, না? এত সংশয় কীসের তোমার? মন স্থির করে কাজ করতে পারো না? এত দ্রুত তোমার মন পালটায় কেন? সত্যি, কার পাল্লায় যে পড়েছি!"

BanglaBook.org

সকালবেলাতেই ঋ-এর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মনটা একটু তেবড়ে গেল অহনের। ঋ এখন যার পাল্লায় রয়েছে, তার ডিকশনারিতে ওইসব শব্দগুলো রয়েছে নিশ্চয়ই।

মোবাইলটা থেমে গেছে এখন। যে ফোন করছিল সে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে ফোন রেখে দিয়েছে। তবে মনে মনে একটু স্বস্তি পেল অহন। যাক মুখটা অন্তত ভাল করে ধোয়া যাবে। অহন আবার মুখ ধোয়ায় মন দিল।

"কী রে, এবার তো মুখের ছাল-বাকলা উঠে যাবে। এই শীতকালে জল ঘাঁটতে ঠান্ডা লাগে না তোর?"

অহন মুখ ঘুরিয়ে দেখল মা। ও বলল, "এই তো হয়ে গেছে।"

মা বলল, "এরকম বাতিকগ্রস্ত ছেলে আমি জন্মে দেখিনি বাবা।"

অহন মুখ ধোয়া শেষ করে কলটা বন্ধ করল। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মা বলল, "মুখ ধোয়ার সময় কোনও কিছুই কি খেয়াল থাকে না? তোর মোবাইলটা যে অনেকক্ষণ ধরে বাজল, শুনিসনি?"

অহন আয়নায় ই করে দাঁতগুলো দেখল। নাঃ, ব্রেকফাস্টের কোনও টুকরো লেগে নেই দাঁতে। সব ক'টা দাঁত নতুন পোর্সেলিনের মতো চকচক করছে। ও বলল, "হ্যাঁ শুনেছি তো, কিন্তু মুখ ধুচ্ছিলাম বলে..."

মা ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, "যাক গে, শোন একটু পরেই তো অফিসে বেরিয়ে যাবি তার আগে তোর বাবার সঙ্গে দেখা করে যাস। তোকে ডাকছে।"

মনে মনে ঢোঁক গিলল অহন। বাবার ঘরে যাওয়া মানেই আত্মোপলব্ধি হওয়া। অহন যে আস্ত এক গবেট, ভিতু এবং ডিসিশন নিতে পারে না সেগুলো মাঝে মাঝে বাবা নিজের ঘরে ডেকে ওকে মনে করিয়ে দেয়। হয়তো এখনও সেরকম কিছুর জন্যই বাবা ডেকেছে। অবশ্য বাবা শুধু শুধু এগুলো বলে না, এর পেছনে প্রতুলকাকার কিছু অবদান থাকে।

প্রতুলকাকা আগে বাবার ট্রান্সপোর্ট আর সি এন্ড এফ এজেন্সিতে ছিলেন, কিন্তু বছর চারেক হল, মানে যবে থেকে অহন জয়েন করেছে, অ্যাডভার্টাইজিংয়ে আনা হয়েছে ওঁকে। মূলত, টাকা পয়সার দিকটাই দেখার কথা ওঁর। কিন্তু আসলে সব ব্যাপারেই উনি খবরদারি করেন। অহনকে ছোট থেকে উনি দেখেছেন বলেই বোধহয় অহনের ওপর খবরদারিটা বেশি করেন।

BanglaBook.org

অহনের রাগ হলেও বিশেষ কিছু ও বলতে পারে না। কারণ ওই, ওর ডিকশনারির দু'-তিনটে শব্দ মিসিং যে।

বাবা মাঝে মাঝে পার্ক স্ট্রিটে ওদের অ্যাডভার্টাইজিংয়ের অফিসে এসে একটু ঘুরে যায়। তা ছাড়া সবটা প্রায় অহনই দেখে। তার মধ্যে অবশ্য প্রতুলকাকার নাক গলানো এবং বাবার কাছে নালিশ করাটাও হয়।

অহন মায়ের কথা শুনে ঘরে গেল। নট করে রাখা টাইটা গলায় গলিয়ে নিয়ে টাইট করে নিল। ভাবল প্রতুলকাকা কি কিছু বলেছে বাবাকে? কারণ, তার একটা সম্ভাবনা আছে। একটা কাজ নিয়ে দু'দিন আগে একটু খটাখটি হয়েছে প্রতুলকাকার সঙ্গে।

অহন এবার একটা হাফ-হাতা সোয়েটার গলিয়ে মোবাইল ফোনটা তুলল। দেখা যাক কে ফোন করেছিল। আরে, আর্চি! স্ক্রিনে মিস কলে আর্চির মোবাইল নম্বরটা দেখল অহন। ও, মনে পড়ল অহনের, ওর তো রাওয়াতের চেকটা আর্চির থেকে নেওয়ার কথা। রাসবিহারী মোড়ে অপেক্ষা করছে ছেলেটা। অহন ভাবল ও তো একটু পরেই বেরোচ্ছে। এর জন্য ফোন করার দরকার ছিল না। আর্চিটা বড় অস্থির। ধৈর্য কম। কী করে যে ফোটোগ্রাফির কাজ করে! সবসময় যেন ছুটছে, যেন তাড়া করেছে কেউ ওকে। তার ওপর রেসপন্সিবিলিটির অভাব রয়েছে বেশ। কিন্তু বয়স তো কম হয়নি। অহনের চেয়ে মাত্র বছর দু'য়েকের ছোট। তবু কেমন ছটফটে একটা ভাব। যেন কিছুই কেয়ার করে না। ইরা বলে একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব আছে, কিন্তু সেখানেও বোধহয় কিছু গন্ডগোল করে রেখেছে। বাবার সঙ্গে যে ওর ঝামেলা লাগে, সেটা আশ্চর্যের নয়। হুঁ, এমন ছেলের পাশে, লোকে বলে ওর নাকি ঘনঘন মন পালটায়!

অহন আর্চির নম্বরে ডায়াল করল। রিং হতে না হতেই ফোনটা ধরল আর্চি। "হ্যালো দাদা, কী রে আমি ওয়েট করছি, আসবি কখন?"

অহন বলল, "আমি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরোচ্ছি। একটু ওয়েট কর।"

"তাড়াতাড়ি কর," অধৈর্য লাগল আর্চির গলা, "কী যে করিস না! আর কতক্ষণ ওয়েট করব? আমার হয়েছে ঝামেলা।"

অহন বলল, "মাথা গরম করিস না। আমি যাচ্ছি। তুই রাসবিহারী মোড়ের ডিং ডং রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়া।"

আর্চি বিরক্ত গলায় বলল, "আজকেই সব ভুলভাল কাজ এসে জুটেছে।"

BanglaBook.org

অহন কিছু বলার আগেই আর্চি কেটে দিল ফোনটা।

এই হল অহনের সমস্যা, সবাই ওকে দাবড়ায়। মাঝে মাঝে অহন ভাবে ঋ হয়তো ঠিকই বলত। ওর ডিকশনারি যে-লোকটা ছাপিয়েছে সে খুব ফাঁকিবাজের মতো কাজ করেছে।

ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে চুলটা একবার দেখে নিল অহন। তারপর অভ্যেস মতো দাঁতটাও দেখল। ঠিক আছে। টেবিলের ওপর রাখা ব্যাগটা নিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিল একবার। সামনে একটা কাজের দিন শুরু হতে যাচ্ছে, যেটা কিনা বাবার ঝাড় দিয়ে শুরু হবে। অহন বেরিয়ে বাবার ঘরে গেল এবার। এ-সময়টায় বাবা খবরকাগজ পড়ে। অফিসে বেরোতে বেরোতে বাবার এগারোটা বাজে। বাড়ির গাড়ি অহনকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে আসে। তারপর সময়মতো বাবাকে নিয়ে যায় অফিসে।

যা ভেবেছিল তাই, বাবা খাটের ওপর বসে কাগজ বিছিয়ে পড়ছে। প্রথম পাতাতেই বাসে চাপা পড়া শিশু মৃত্যুর খবর। এসব ভাল লাগে না অহনের। ও মুখ ঘুরিয়ে খাটের পাশে দাঁড়াল।

বাবা কাগজ থেকে মুখ না তুলে জিজ্ঞেস করল, "আঠাশ তারিখের প্রেজেন্টেশনের কাজ কতটা এগিয়েছে?"

অহন বলল, "আজ সুগত লে-আউট দেবে। কাল আর পরশু তো ছুটি, সোমবারে বোর্ড বানিয়ে ম্যাটার সাজিয়ে ফেলব। মঙ্গলবারের আগেই হয়ে যাবে।"

বাবা এবার মুখ ফেরাল, "অ্যানিমেশন সফ্‌টওয়্যারের জন্য কিন্তু ইতিমধ্যে পঁচিশ হাজার বেরিয়ে গেছে। অন্যান্য ব্যাপারেও প্রায় হাজার তিরিশেক গেছে। দেখো, যেন টাকাটা নষ্ট না হয়।"

অহন ইতস্তত করে বলল, "আমি চেষ্টা করব।"

"চেষ্টা? মানে?" বাবা ভুরু কুঁচকে তাকাল অহনের দিকে।

"মানে... ইয়ে..." অহন তোতলাচ্ছে।

"তোমায় কখনও পজিটিভ দেখি না কেন? সবসময় এমন মাদা মেরে থাকো কেন তুমি? কেন, বলতে পারো না যে, কাজটা আমরা পারবই? পারো না?"

অহন মনে মনে ওর ডিকশনারি লেখককে আবার গালি দিল। ব্যাটা সব পজিটিভ শব্দ কাঁচি করে দিয়েছে। এমন খচ্চর ডিকশনারি লেখক ও জন্মে দেখেনি। ও মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

BanglaBook.org

বাবা বলল, "প্রতুলের মতের এগেনস্টে গিয়ে আমি তোমায় এই কাজটা নিয়ে প্রসিড করতে দিয়েছি। আমার নাক কেটো না। কাজটা আমার চাই। অন্তত প্রেজেন্টেশন শুড বি গুড। না হলে পরের বার থেকে প্রতুল যা বলবে সেই মতো কাজ করতে হবে তোমায়। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?"

অহন খাক্‌রে গলা ক্লিয়ার করে মাথা নাড়ল। সোয়েটারের ভেতরে ঘাম হচ্ছে অল্প অল্প। তিরিশ বছর বয়সেও বাবার সামনে এলে ওর হাঁটু কাঁপে। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল অহন। বলল, আর কবে বড় হবে তুমি? গ্রো আপ।

বাবা আবার বলল, "সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও এখন। লটস অফ থিংস আর টু বি ডান। গো।"

বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়ল অহন। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর রাগও হল একটু। প্রতুলকাকা তো আচ্ছা ঝঞ্ঝাট শুরু করেছেন। ওঁর বক্তব্য ছিল যে, বড় সফট ড্রিঙ্কস্ কোম্পানির এই অ্যাডের কাজটাতে 'অ্যাডগ্ল্যাম' বলে কোম্পানির সঙ্গে যেন ওরা প্রতিযোগিতায় না নামে। কারণ, এক, অ্যাডগ্লাম ছোট কোম্পানি, ওরা লো কোট করে কাজটা নিয়ে নেবে। দুই, ক্যাম্পেনের তৈরির পেছনে অনেক টাকা গচ্চা যাবে। আর সেটা যদি ক্লায়েন্টের পছন্দ না হয় তা হলে গোটাটাই গিলতে হবে ওদের। যার অর্থ হেভি লস। আর তিন, ক্লায়েন্টের পেমেন্ট টার্মস ভাল নয়।

অহন বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে, এই সফট ড্রিঙ্কস্ কোম্পানিটা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। তাই এদের অ্যাড ক্যাম্পেন পাওয়া অত্যন্ত প্রেস্টিজিয়াস ব্যাপার। ক্রেডেনশিয়াল বিরাট। এই একটা কারণই কাজটা করার জন্য যথেষ্ট। আসলে সফট ড্রিঙ্কস্ কোম্পানিটা, অ্যাডগ্ল্যাম আর বিটা অ্যাড অর্থাৎ অহনদের কোম্পানিকে বলেছে যে, একটা অনবোর্ড অ্যাড ক্যাম্পেন তৈরি করতে। যারটা পছন্দ হবে তাকেই কাজটা দেওয়া হবে। অর্থাৎ ক্যাম্পেনের পেছনে টাকা খরচ করে তার রিকভারের রিস্ক আছে। ক্লায়েন্টের পছন্দ না হলে গোটা টাকাটাই জলে। এই শেষেরটাই ছিল প্রতুলকাকার মূল আরগুমেন্ট।

প্রতুলকাকার কথার ওপর অহন জোর দিয়ে কিছু বলতে পারছিল না এবং একসময়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় মেনেও নিয়েছিল ব্যাপারটা, কিন্তু তখনই এর মধ্যে ঝাঁপায় উর্নি।

BanglaBook.org

উর্নি বছরখানেক হল জয়েন করেছে অহনদের বিটা অ্যাডে। মেয়েটা অত্যন্ত কনফিডেন্ট, সপ্রতিভ এবং কাজের। অহনের অবাক লাগে এই ভেবে যে, একটা তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ে কীভাবে এরকম সাহস পায়! যে কোনও কাজ দাও, উর্নি ঝাঁপিয়ে পড়বে। কে জানে হয়তো অল্প বয়স বলেই ও এতটা প্যাশন নিয়ে কাজ করে। এই বছরখানেকের মধ্যেই অহন, উর্নির ওপর অনেকটা ডিপেন্ড করতে শুরু করেছে। এই সফট ড্রিঙ্কস্ কোম্পানির অ্যাড ক্যাম্পেনে প্রথম থেকেই উর্নির খুব উৎসাহ ছিল। ও বলত, "অহনদা আপনি ছাড়বেন না। আমরা যা করা দরকার, সব করব, এই প্রজেক্টটা আমাদের নিতেই হবে।"

তাই প্রতুলকাকা যখন প্রায় বানচাল করে দিচ্ছিল এই চেষ্টাটা, ঠিক তখনই উর্নি এসে বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, "স্যার, আপনাকে আমি বলছি, এই কাজটা আমরাই পাব।"

প্রতুলকাকা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলেন, "তুমি কী জানো এই কাজের ব্যাপারে? সব কিছু বুঝে গেছ, না? চুপ করে থাকো।"

উর্নি চুপ না করে পালটা বলেছিল, "স্যার, আমাদের ক্যাম্পেনটা দারুণ হবে। অহনদা একটা ভাল প্ল্যান করেছে।"

"প্ল্যান?" প্রতুলকাকা ভুরু তুলে তাকিয়েছিলেন অহনের দিকে।

অহন ঢোঁক গিলে নার্ভাস হাসি দিয়েছিল শুধু। কীসের প্ল্যান? উর্নি তো পুরো মিথ্যে বলছে প্রতুলকাকাকে চুপ করানোর জন্য।

প্রতুলকাকা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কীসের প্ল্যান অহন?"

অহনের হাত কাঁপছিল সামান্য। ও দেখছিল প্রতুলকাকার পেছনে দাঁড়িয়ে উর্নি অত্যন্ত কাতর চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে, যার অর্থ অহনও ওর কথার সমর্থনে কিছু একটা বলুক।

প্রতুলকাকার ভুরু সন্দেহের চাপে ক্রমশ বাঁক নিচ্ছিল। উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি আবার কী প্ল্যান ভাঁজলে?"

অহন ঠোঁট চেটে টেবিলের কাচের ওপর রাখা একটা ছোট্ট পেঙ্গুইন পেপারওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেছিল, "সে আছে একটা।"

"আছে একটা? মানে? আমায় বলতে চাও না?"

অহন বলেছিল, "না, মানে আরও দু'-একটা ব্যাপার একটু চেক করে নিই, তারপর ঠিক বলব।"

BanglaBook.org

প্রতুলকাকা সামান্য রাগের গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তা হলে এই কাজটার পেছনে তুমি টাকা ঢালবেই?"

অহন বলেছিল, "কাজটা কিন্তু আমরা পেতেও পারি।"

প্রতুলকাকা বলেছিলেন, "পাব আর পেতে পারির পার্থক্যটা বোঝো? পেলেও ওরকম পেমেন্ট টার্মস, কাজ করতে পারবে তো? যাক গে, তোমার বাবার টাকা তুমি ওড়াবে, তাতে আমার কী? যা পারো করো।"

এই কথাটাই সবচেয়ে বেশি মনে লাগে অহনের। মনে হয় কেউ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে ওকে। বাবার টাকা! আচ্ছা এই যে ছাব্বিশ বছর বয়স থেকে সব কিছু ভুলে এক ভাবে ও কাজ করে যাচ্ছে তার কি কোনও দাম নেই? সব কিছুই বাবার টাকায় হয়েছে? ওর কি কোনও কনট্রিবিউশন নেই? ঋ পর্যন্ত ওকে এই নিয়ে খোঁচা দিত। বলত, "বাবার টাকায় বেঁচে আছ, লজ্জা করে না?"

অহন দুর্বল গলায় প্রতিবাদ করত, "কিন্তু আমি তো কাজ করি। আমারও কনট্রিবিউশন আছে। শুধুই কি বাবার টাকা?"

"হ্যাঁ, তোমার বাবার টাকা। নিজের দম নেই কিছু করার? তুমি হচ্ছ সত্যিকারের চাঁদের টুকরো ছেলে। তোমার বাবা সূর্য আর তুমি সূর্যের আলোয় আলোকিত।"

অহনের স্যাটারডে রিভিউ ছিল ঋ। ও কতটা ভুল এবং অযোগ্য তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত মেয়েটা। তবে দিত, পাস্ট টেন্স, এখন আর দেয় না। আজ মেয়েটা নেই। বিয়ে করে চলে গেছে সিডনি।

নীচে গিয়ে গাড়িতে বসল অহন। জিজুদা ওদের ড্রাইভার, রেডি হয়েই ছিল। ও বসামাত্র ছেড়ে দিল গাড়ি। গাড়ি চলামাত্র একঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে ঢুকল জানলা দিয়ে। সামান্য কেঁপে উঠে দরজার মাঝামাঝি লাগানো সুইচ টিপে কাচটা তুলে দিল অহন। আজ সকাল থেকেই বেশ হাওয়া দিচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে জানলা খোলার সময়ই বুঝতে পেরেছে ও। এখন গাড়ির জানলা বন্ধ করে বেশ আরাম লাগল অহনের। ঠান্ডা ওর ভাল লাগে না।

অহন বলল, "জিজুদা রাসবিহারী মোড়ের কাছে ডিং ডং রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়িটা একটু দাঁড় করিয়ো তো।"

জিজুদা সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সে কী, সকালেই রেস্টুরেন্টের খাবার

BanglaBook.org

খাবে? খেয়ে বেরোতে পারো না বাড়ির থেকে? সেই ছোট থেকে দেখছি হাবিজাবি না খেলে তোমার চলে না।"

জিজুদার এই এক সমস্যা, বেশি কথা বলে। অহনের মেজাজটা ঠিক নেই এখন। বাবা সকালেই যা ছোট ডোজ দিয়েছে একটা! ওর ইচ্ছে হল কোনও কঠিন কথা বলে জিজুদাকে। কিন্তু ওই, ওর ডিকশনারি খুঁজেও তেমন কিছু পেল না। ও নরমভাবে বলল, "আর্চি থাকবে ওখানে। ওর থেকে একটা জিনিস নেব।"

ওদের বাড়ি থেকে রাসবিহারী মোড় খুব কাছে। ডিং ডং রেস্টুরেন্টের কাছে অহন দেখল, একটা ব্যাগ কাঁধে চোখমুখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর্চি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব বিরক্ত। জিজুদা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা আর্চির সামনে নিয়ে গিয়ে থামাল গাড়িটাকে।

আর্চি এগিয়ে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল গাড়ির সামনে। অহন কাচ নামিয়ে হাত বাড়াল, "দে, চেকটা।"

আর্চি পকেট থেকে চেকটা বের করে এগিয়ে দিল। বলল, "নে তোদের সম্পত্তি। সক্কালবেলা পেমেন্ট আনতে হবে। কেমন ব্যাবসা করিস তোরা? আর ক্লায়েন্টগুলোও জোগাড় করেছিস বটে।"

অহন হাসল। জিজ্ঞেস করল, "বাড়ি যাবি তো এখন?"

"না, কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে, কাজের ধান্দা আছে।"

"সে কী রে, খাবি কোথায়?"

আর্চি এবার হাসল, "দাদা, এসব পেটি জিনিস নিয়ে চিন্তা করিস কেন তুই? খাবার জায়গার অভাব? তুই তোর ঘানিতে ঢোক, আমি কাটি।"

জিজুদা আবার গাড়ি ছোটাল। ঠান্ডা হাওয়া আটকাতে কাচটা আবার তুলে সিটে একটু এলিয়ে বসল অহন। জিজুদা বলল, "কেমন দাদা তুমি? ভাইকে বকে বাড়ি পাঠাতে পারলে না? ওদিকে বউদি চিন্তা করবে। তোমরা দু'ভাই-ই ছিটিছাড়া।"

অহন বিরক্তিতে চোখটা বন্ধ করল। এ লোকটার নাকটা বড্ড লম্বা। ও বলল, "জিজুদা প্লিজ।"

জিজুদা বলল, "তা, যা পারো করো। আমি আর কী বলব?"

এটাই বোধহয় সবার পেটেন্ট ডায়ালগ— 'যা পারো করো'। কিন্তু করতে দেয় কই? সবাই নিজের নিজের মতামতটা ওর জীবনে ঢুকিয়ে দেয়।

অহন চেকটা বের করল। অফিসে গিয়েই ওটা জমা দিতে পাঠাতে হবে।

BanglaBook.org

এবার রাওয়াতের সইটা দেখল অহন। শুরুতেই একটা প্যাঁচানো ডানহাতি স্বস্তিকা। লোকটা ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাসী। গাড়ির ওরকম অদ্ভুত গোলাপি রং কারও কোনওদিন দেখেনি অহন। রংটা নাকি জ্যোতিষী করতে বলেছে। গাড়ির সামনে একটা হনুমানজির মূর্তি লাগানো। কী? না, পবনপুত্র হনুমান নাকি ওঁর গাইডিং ফোর্স। তবে কিছু টাকা করেছেন বটে লোকটা! সত্যি, এরকম কনফিডেন্ট লোক ও দেখেনি। সবাইকে দাবড়ে চলেন। ও যদি এরকম হতে পারত! ঋ বলত, "তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তুমি গুড ফর নাথিং।"

ঋ। অদ্ভুত সুন্দর দাঁতের একটা মেয়ে ছিল। এখন নেই। এম বি এ পড়ার সময় আলাপ হয়েছিল ওদের। পরে প্রেম। ঋ নিজেই প্রোপোজ করেছিল অহনকে। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল খুব। একটা ছোট্ট ছাউনির তলায় কোনওমতে পাঁচজনের সঙ্গে ওরা দু'জনও দাঁড়িয়েছিল। অঝোর বৃষ্টিতে অচেনা লোকজনের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াতে খুব অস্বস্তি লাগছিল অহনের। বিশেষ করে ঋ-এর জন্য। লোকগুলো বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছিল ঋ-এর দিকে। কিন্তু ঋ-এর হুঁশ ছিল না একদম। ও নিজের মনে বকবক করে যাচ্ছিল ক্রমাগত। কিন্তু অহন শুনছিল না বিশেষ। লোকগুলোর ড্যাবড্যাবে দৃষ্টির জন্য মনঃসংযোগ করতে পারছিল না। হঠাৎ ওর জামার হাতা ধরে জোরে টান দিয়েছিল ঋ, বলেছিল, "কী হল উত্তর দিচ্ছ না কেন?"

"কীসের উত্তর?" একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল অহন।

"আরে তুমি শোনোনি কী বললাম?"

"না, মানে, ইয়ে..."

ঋ বলেছিল, "আমি যদি তোমার গার্লফ্রেন্ড হই কেমন হবে?"

"গার্লফ্রেন্ড? সে তো তুমিই আছ।" অহনের ধাঁধা লেগেছিল সামান্য।

"ওঃ সেই গার্লফ্রেন্ড নয়, প্রেমিকা, প্রেমিকা। কেমন হবে?"

"অ্যাঁ?" একটু ঘাবড়ানোটা নিমেষে অনেকখানি হয়ে গিয়েছিল।

"হ্যাঁ। কেমন হবে? আমার তোমাকে ভাল লাগে।"

অহন প্রথমে থতমত খেলেও পরমুহূর্তেই ওর মনে হয়েছিল আরে আশেপাশের মানুষগুলোও তো দেখছে, শুনছে। ও চোখের কোণ দিয়ে দেখছিল যে, সত্যিই মানুষগুলো ওদের কথা এমনভাবে শুনছে, যেন টিভির দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে ওয়ান ডে-র শেষ ওভারের খেলা দেখছে। ও

BanglaBook.org

ইশারা করে ঋ-কে চুপ করতে বলছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ঋ মুদিখানার ফর্দর মতো করে অহনের দোষ আর গুণের লিস্ট তৈরি করছিল। পাশের লোকগুলো হাসছিল খুকখুক করে। ঋ তবু বলে যাচ্ছিল যে, অহন বেশ সুন্দর দেখতে, ওর মন নরম, বাবার পয়সা আছে, ওর দাঁতগুলো সুন্দর, ও সবসময় বাধ্য ছাত্রের মতো কথা শোনে, রাগ করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। লোকজনের খুকখুকে হাসি ক্রমশ তার ডেসিবল বাড়াচ্ছিল। অহন বলেছিল, "প্লিজ এখন নয়, পরে।"

"কেন? পরে কেন?" ঋ জানতে চেয়েছিল, "সবসময় পরে কেন? না এখনই বলো, তুমি রাজি?"

বাইরের বৃষ্টিটা তখনও বেশ ভালই পড়ছিল। তবু তার মধ্যে ছাউনির তলা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল অহন। ওর আর ভাল লাগছিল না। আর ওই ছাউনির তলা থেকে ঋ চিৎকার করছিল, "ইউ স্পাইনলেস ক্রিচার, ইউ চিকেন। বাট আই স্টিল লাভ ইউ। আই লাভ চিকেন।"

এভাবে যে প্রেমের শুরু হতে পারে, বিশ্বাস করতে আজও কষ্ট হয় অহনের। কিন্তু সত্যি সেই বৃষ্টির পরের থেকেই ওদের প্রেম শুরু হয়েছিল। এবং শুরু হয়েছিল ঋ-র মুরগি ভক্ষণ।

অহন মাঝে মাঝে ভাবে সত্যিই কি ও ঋ-এর প্রেমে পড়েছিল? অমন মেয়ের প্রেমে পড়া যায়? কিন্তু ঋ সবসময় ওর সঙ্গে সেঁটে থাকত আর গালাগালি করত। একদিন তো অহন বলেই ফেলেছিল, "আমি যখন এতই অযোগ্য, তখন কেন আমার সঙ্গে ঘোরো?"

ঋ হেসেছিল, "তোমায় চিকেন থেকে লায়ন বানাবার দায়িত্ব তো আমার। আচ্ছা, তুমি এতদিন ঘুরছ আমার সঙ্গে কিন্তু কোনওদিন চুমু খাওনি তো!"

অহন কিছু উত্তর দেবার আগেই ঋ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমু খেয়েছিল ওর ঠোঁটে। ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে নিজের জিভটা ঠেলে ঢোকাবার চেষ্টাও করেছিল। ভেজা ঠোঁট, জিভ, অদ্ভুত সুন্দর স্ট্রবেরির গন্ধ পাচ্ছিল অহন। কিছু সময়ের জন্য অবশ হয়ে গিয়েছিল ওর শরীর। কিন্তু তারপরই সংবিৎ ফিরেছিল ওর। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে এসব কী করছে ওরা? ও প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল ঋ-কে।

ভবানীপুরের কাছে ঋ'দের মাসির বাড়ির সেই ছাদটার আশেপাশে ঘেঁষে পুরনো কিছু বাড়িঘরের ভিড়। আর সেখানেই একটা বাড়ির পরের ছাদ থেকে

BanglaBook.org

একজন তাকিয়েছিল ওদের দিকে। সেই ছেলেটার চেহারা এখনও মনে আছে অহনের। বেঁটে ফরসা চেহারার একটা ছেলে। দূর থেকেও ছেলেটার বিড়াল-চোখটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল অহন। একরাশ কৌতূহল নিয়ে ছেলেটা তাকিয়েছিল ওদের দিকে। এরকম দৃশ্য হয়তো দেখেনি কোনওদিন।

কেন যে ওদের প্রেম হয়েছিল, আর কেনই বা তা ভেঙে গেল সেটা আজও ঠিক বুঝতে পারে না অহন। তবে শেষের ছ'মাস ঋ খুব চাপাচাপি করেছিল ওকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু অহন কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিল না। বাড়িতে কী বলবে ও? আর বাবার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বিয়ের কথা? পাগল না পোয়েট? ও এড়িয়ে যাচ্ছিল তাই।

ছ'মাস ধরে ক্রমাগত বলতে বলতে একসময় শেষের দিনটা এল। মানে তাকে আনল ঋ নিজেই। ভিক্টোরিয়ার সামনে সেদিন দুপুরবেলা ঋ বলেছিল, "আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক এখানেই শেষ করছি। আর নয়। নিজের বাড়িতে তুমি আমায় নিয়ে গেলে না, বিয়ের কথাও বললে না। এভাবে আর সম্ভব নয়। ইউ আর নট কমিটেড। হেন্স উই শুড পার্ট আওয়ার ওয়েজ।"

"কিন্তু, আমায় আর একটু সময় দেবে না?" অহন কাতর গলায় বলেছিল।

"না। আই এনজয়েড ইয়োর কম্পানি। কিন্তু আর নয়। আই ক্যান্ট স্টে উইথ আ লুজার।"

"কিন্তু ঋ, প্লিজ শোনো..." অহন শেষ চেষ্টা করেছিল।

ঋ শোনেনি। চলে যাওয়ার আগে বলেছিল, "আমার ভালবাসা তুমি বুঝলে না। আমি যা বলেছি তা সবসময় বাধ্য কুকুরের মতো শুনেছ। কেন? ভয় পাও আমায়? রেস্টুরেন্টে গেলে সবসময় আমি যা চেয়েছি তাই খেয়েছ। চা ভাল না বাসলেও আমার জন্য কফি ছেড়ে চা খেয়েছ। কেন? এত ভয়? আমাকে ভয়, তোমার বাবাকে ভয়, এক্সকে ভয়, ওয়াইকে ভয়, পৃথিবী সুদ্ধু সবাইকে ভয়। আমার হুকুম মানতে পারো, কিন্তু আমাকে তোমার জীবনে আনার জন্য বাবার মুখোমুখি হতে পারো না। শেম অন ইউ। ইউ লিভ ইয়োর রেচেড লাইফ। আই অ্যাম আউট অব ইট।"

এর মাস কয়েক পরে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ঋ'র। এখনও তারিখটা মনে আছে অহনের, থার্ড ফেব্রুয়ারি। আর ফিফথ ফেব্রুয়ারি রাতে হঠাৎ একটা মেসেজ এসেছিল অহনের মোবাইলে। যান্ত্রিক শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওর। অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে রাখা টেবিল থেকে আলো

BanglaBook.org

জ্বলা মোবাইলটা তুলে দেখেছিল মেসেজটা। ঋ পাঠিয়েছে। বেশ চমকে গিয়েছিল ও। হিসেবমতো সেদিন ঋ-এর ফুলশয্যা ছিল। মেসেজটা খুলে অহন দেখেছিল ঋ লিখেছে— 2 NITE I LST MY VRGNTY U CHICKN।

"কী গো নামবে না গাড়ি থেকে?" জিজুদার কথায় বর্তমানে ফিরে এল অহন। পার্ক স্ট্রিটে ওর অফিসের সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও হাসল, তারপর গাড়ির দরজা খুলে নামল। প্রায় ন'টা বাজে। উর্নি এসেছে কি?

জিজুদা বলল, "বিকেলে গাড়ি আনতে দেরি হতে পারে কিন্তু।"

"দেরি? কেন?"

"আঃ, এটাও জানো না?" জিজুদা বিরক্ত হল, "আজ মহামিছিল আছে তো। পুরো কলকাতার প্যারালিসিস হয়ে যাবে।"

অহন বলল, "ঠিক আছে, তুমি এখন এসো।"

অফিসে ঢুকেই অহন দেখল নিজের ঘরে প্রতুলকাকা বসে রয়েছেন। কাচের মধ্যে দিয়ে ওঁর অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। অহনকে দেখে প্রতুলকাকা হাত তুললেন। ওকে দাঁড় করিয়ে উঠে এলেন চেয়ার থেকে। একটু অবাক লাগল অহনের। কী ব্যাপার? প্রতুলকাকা দাঁড়াতে বলছেন কেন?

প্রতুলকাকা দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে বললেন, "অ্যাডগ্ল্যাম থেকে ফোন করেছিল।"

"অ্যাডগ্ল্যাম থেকে? কে? শতানিক?" ভুরু কুঁচকে গেল অহনের।

"হ্যাঁ। তোমায় খুঁজছিল।"

"আমায়? কেন?"

"কী সব অফার আছে নাকি ওর। তোমার সঙ্গে সেই নিয়ে কথা বলতে চায়।"

"আমার সঙ্গে? অফার আছে? কীসের অফার?"

"সে আমায় বলেনি। তুমি কথা বলো।"

প্রতুলকাকার মুখ দেখে অহনের মনে হল, লোকটা জানে কী অফার, কিন্তু বলছে না। একটু অস্বস্তি হল ওর। শতানিকের সঙ্গে কথা বলাটা ওর খুব একটা মনের মতো কাজ নয়। লোকটা সবসময় ঘাড়ে চড়ে কথা বলে। ও বুঝতে পারল প্রতুলকাকা ইচ্ছে করে ওকে এর মধ্যে ঠেলছেন। যেহেতু অহন

BanglaBook.org

কাউকে মুখের ওপর না করতে পারে না তাই ওকে বিপদে ফেলা। অহনের মনে হল, এটা নিশ্চয়ই ওই সফট্ ড্রিঙ্কস্ অ্যাডের সংক্রান্ত কোনও বিষয় হবে। শতানিক লোকটা খুব ধড়িবাজ। নিশ্চয়ই কিছু কলকবজা নাড়বে।

অহন বলল, "ঠিক আছে, আমি ফোন করব না। লেট হিম রিং মি।"

প্রতুলকাকা একটু অসন্তুষ্ট হলেন, "তুমি করবে না কেন?"

অহন হেসে বলল, "দরকারটা তো ওর, তাই মানে..."

"যা পারো করো। আমি আর কী বলব? তোমরা সব বড় হয়ে গেছ।" প্রতুলকাকা আবার নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

অহন এবার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। চেকটা ডিপোজিট স্লিপে লিখে ফেলতে হবে। কিন্তু দু'পাও এগোতে পারল না ও। দেখল করিডোরের অন্য প্রান্ত থেকে প্রায় দৌড়ে ওর দিকে আসছে উর্নি। চোখেমুখে টেনশন। মাথায় ছোট করে কাটা চুলগুলো এলোমেলো। ডান হাতে মুঠো করে ধরা চশমা। টেনশন হলেই চশমা খুলে ফেলে উর্নি।

কী হয়েছে ওর? এমন করে দৌড়ে আসছে কেন? কোনও গন্ডগোল হল কি? টেনশনে হাত ঘামতে শুরু করল অহনের। মনে হল সকালটাই বলে দিচ্ছে সামনে একটা খারাপ দিন অপেক্ষা করছে ওর।

উর্নি ২৪ ডিসেম্বর, সকাল ন'টা পাঁচ

বাঁ দিকে বেঁকে করিডোরে পা দিয়েই অহনকে দেখতে পেল উর্নি। দৌড়ে অহনের দিকে যেতে যেতে ও বুঝতে পারল ওকে দৌড়োতে দেখে অহন একটু ঘাবড়ে গেছে। সুন্দর দেখতে মানুষটাকে একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে যেন। উর্নি জানে অহন একটু নার্ভাস প্রকৃতির, লাজুক ধরনের। এমন মানুষকে দিয়ে ব্যাবসা হওয়া মুশকিল।

কিন্তু ব্যাপারটা এমন যে, তাতে না দৌড়ে ও পারেনি। ও ওর সিট থেকে রাস্তায় অহনের গাড়িটাকে আসতে দেখেছিল। তাই দৌড়ে খবরটা দিতে এসেছে। কারণ ও জানে খবরটা এমন যে, এর জন্য যা যা করার এক্ষুনি না করতে পারলে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে।

অহনের থতমত মুখের সামনে গিয়ে উর্নি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর চুলের

BanglaBook.org

ভেতর অভ্যেস মতো হাত চালাল একবার। অহন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? এভাবে দৌড়োচ্ছ কেন? এনি প্রবলেম?"

"অহনদা, সুগত।"

"সুগত? মানে? কী হয়েছে সুগতর?"

"ও আজ আসবে না। সাত দিনের জন্য ডুয়ার্স চলে যাচ্ছে।"

"কী? আসবে না? ডুয়ার্স? কী বলছ তুমি? এর মানে কী?"

"মানে সুগত নিউ ইয়ারের আগে আসবে না।"

"অ্যাঁ? কী হবে?" উর্নি দেখল অহনের মুখের শেষ দু'-চার ফোঁটা রক্তও নিমেষে উধাও হয়ে গেল। এলোমেলো হয়ে গেল চোখের দৃষ্টিটাও।

উর্নি জানে অবস্থাটা সত্যিই জটিল। ওদের এই ফার্মে তিন জন গ্রাফিক্স আর্টিস্ট আছে। এর মধ্যে মজিদ, জুনিয়র। সুগত আর টিনাই মূলত কাজ সামলায়। টিনা এখন লিভ নিয়ে গোয়ায় গিয়ে বসে রয়েছে। আর সামনের মঙ্গলবারের প্রেজেন্টেশনটা সুগতর তৈরি করার কথা। স্টোরি বোর্ডটা রাফলি হলেও, ছবিগুলো আঁকা হয়নি বিশেষ। এরপর কম্পিউটারে ফেলে সেগুলোকে ফাইনাল চেহারা দিতে হবে। অহন, সুগতর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছিল যে, শনিবার মানে পঁচিশে ডিসেম্বর আর রবিবারও কাজ করবে ওরা। চেপে করলে মঙ্গলবারের মধ্যে ঠিক নেমে যাবে কাজটা। সুগত তখন খুব মাথা নাড়ছিল। উর্নি নিজেও তো ছিল সেখানে। ওরা পাখি পড়ানোর মতো করে সুগতকে বুঝিয়েছিল যে, কোনও মতেই যেন কামাই না করে এই ক'দিন। কারণ দুমদাম কামাই করা ওর বরাবরের অভ্যেস।

অত করে বোঝানোর পর উর্নি ভেবেছিল যে, সুগত বোধহয় ঠিক কাজটা উদ্ধার করে দেবে। এমনকী গতকাল সন্ধেবেলাও তো ও বুঝতে পারেনি কিছু। অফিস থেকে যাবার সময় পর্যন্ত সুগত বলেছিল, "অহনদা, কাল ক্রিসমাস ইভ। খাওয়াতে হবে কিন্তু।" আর আজ সকালের মধ্যে সব পালটে গেল।

উর্নি পৌনে ন'টার মধ্যে অফিসে চলে আসে। সারাদিনের কাজটা গুছিয়ে নেবার জন্যই একটু তাড়াতাড়ি আসে ও। আজও যখন কাগজপত্তর খুলে বসেছে ঠিক তখনই ওর মোবাইলটা বেজে উঠেছিল। উর্নি ফোনটা খুলে দেখেছিল, সুগতর বাড়ির নম্বর থেকে ফোন এসেছে। উর্নি বলেছিল, "হ্যাঁ সুগত, বল।"

BanglaBook.org

সুগত খুব ক্যাজুয়ালি বলেছিল, "কয়েক দিন আসতে পারব না, বুঝলি। একটু ডুয়ার্স যাচ্ছি ঘুরতে।"

"কী বলছিস? ফালতু ইয়ারকি মারিস না।" সামান্য হেসে উত্তর দিয়েছিল ও।

"ইয়ারকি মারছি না। শোন, এক তারিখ ফিরব অ্যান্ড উইল জয়েন দ্য অফিস ফ্রম সেকেন্ড। ঠিক আছে?"

"ফালতু কথা বলিস না, সামনে মঙ্গলবার প্রেজেন্টেশন, জানিস না?"

"ডেট এক্সটেন্ড করে নে। এসে ঘ্যামাঞ্চকার কাজ নামাব। সব অ্যাডের বাপ হবে সেটা।"

"কী যা তা বলছিস! অহনদা বিপদে পড়বে।"

"দূর, বছরের শেষ, সাত দিন ছুটি নেব না? তোকে না হয় তোর বয়ফ্রেন্ড ঠুকে ছেড়ে পালিয়েছে বলে তুই লাট খেয়ে কাজ করিস। সবাই তাই করবে নাকি? অহনদাকে বলে দিস। বাই।"

বয়ফ্রেন্ডের কথাটা অবশ করে দিয়েছিল উর্নিকে। সেই সুযোগে ফোনটা কেটে দিয়েছিল সুগত। ভীষণ রাগ হচ্ছিল উর্নির, কান্নাও পাচ্ছিল। তুই জানিস টিনা নেই। এই ক্যাম্পেনটা করছিস তুই, আর সেখানেই কাজ ছেড়ে ঘুরতে গেলি? তার ওপর বয়ফ্রেন্ডের কথাটা বলতে পারলি ওভাবে? তোকে বিশ্বাস করার এই ফল? চুলের ভেতর হাত ডুবিয়ে বসেছিল উর্নি। কী করবে কিচ্ছু বুঝতে পারছিল না। উর্নি জানে ওদের অ্যাডের কনসেপ্টটা দারুণ হয়েছে। গোটাটাই অ্যানিমেশন নির্ভর হবে। কিন্তু অ্যানিমেশনগুলো এখন করবে কে? মজিদকে গাইড করলেও ও কাজটা করতে পারবে না। যে-পারবে সে তো ডুয়ার্সে চলে যাচ্ছে। এইসব সাত-পাঁচ চিন্তা করতে করতেই অহনের গাড়িটাকে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখেছিল উর্নি। আর তাই ও ছুটে এসেছে খবর দিতে।

উর্নি বলল, "অহনদা, আপনি আপনার ঘরে চলুন, সেখানে কথা বলব।"

"ঘরে?" এলোমেলো চোখে তাকিয়ে ঘর শব্দটার মানে বোঝার চেষ্টা করল অহন। তারপর বলল, "চলো।"

অহন ঘরে ঢুকেই চেয়ারে ছেড়ে দিল শরীরটাকে। চেয়ারটা তার যথাসাধ্য আপত্তি জানাল। উর্নি এই অফিসে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, অহন সহজেই ঘাবড়ে যায়। ও সামনের চেয়ারে বসতে বসতে শুনল অহন

BanglaBook.org

বলছে, "এবার কী হবে? বাবা কী বলবে? এই যে মডেলদের দিয়ে ফোটো শুট করালাম, তার বড় বড় প্রিন্ট বের করালাম। সেগুলো থেকে কার্টুন আঁকিয়ে থ্রি-ডি অ্যানিমেশন করাব, এই যে যজ্ঞিবাড়ির কাজ, এসব কে করবে? উর্নি, সুগত এমন করল কেন বলো তো?"

উর্নি বলল, "অহনদা, আপনি ঘাবড়াবেন না, আমি ভাবছি এখনই একবার সুগতর বাড়িতে যাব। দেখি যদি ওকে কনভিনস্ করা যায়। যাব অহনদা?"

অহন গলার টাইটাকে আলগা করে টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলল, বলল, "ভাবতে পারছ, কী সর্বনাশটা হল? গতকাল পর্যন্ত ও এমন করল যেন সব ঠিক আছে। আর হঠাৎ আজ কী হল ওর?"

উর্নি আবার জিজ্ঞেস করল, "আমি যাব অহনদা? ওর বাড়ি হিন্দুস্তান পার্কে। আমি চিনি।"

"যাবে?" অহন মুখ তুলল, "ঠিক আছে যাও। আর যদি দেখো ওকে ফেরাতে পারলে না, তা হলে মুকুলদার কাছে চলে যাবে। রাসবিহারী মোড়ে বাড়ি। উনি ফ্রিলান্সার তো, ওঁকে ধরে নিয়ে আসবে। যেভাবেই হোক ক্যাম্পেনটা শেষ করতেই হবে।"

"মুকুলদাও না এলে?" জিজ্ঞেস করল উর্নি।

"তা হলে রূপাদির কাছে যাবে চেতলায়। সেখানেও না হলে ভবানীপুরের কাছে রাজ গুহর ওখানে যাবে। মানে, যেভাবেই হোক একজন প্রফেশনাল আর্টিস্ট চাই আমার।"

অহনের ডেসপারেশনটা উর্নি বুঝল। আর সেটাই স্বাভাবিক। অহনের বাবা, মানে বড় সাহেব, নাকি এ কাজটায় একদম আগ্রহী নয়। খানিকটা স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই অহন জেদ করেছে কাজটা নিয়ে। বা বলা যায় উর্নিই অহনকে সাহস জুগিয়েছে। আর কে জানে ভেতরে ভেতরে অহনও হয়তো এই কাজটা দিয়েই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চায়।

উর্নি জিজ্ঞেস করল, "রূপাদি আর রাজ গুহর ঠিকানাটা কোথায় পাব? মুকুলদারটা আমি জানি।"

অহন এবার গলার থেকে টাইটা খুলে টেবিলে জড়ো করে রেখে বলল, "প্রতুলকাকাকে বলো, উনি দিয়ে দেবেন।"

"স্যারকে বলব?" উর্নির মুখটা তেতো হয়ে গেল। এ-লোকটাকে একদম ভাল লাগে না উর্নির। পুরনো বাংলা সিনেমার ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করা

BanglaBook.org

বিকাশ রায়ের মতো লাগে। সব কাজে বাগড়া দেবে লোকটা। এটা হবে না, ওটা ঠিক নয়, এটা করে লাভ নেই— এ ছাড়া কোনও কথা নেই লোকটার মুখে। এত নেগেটিভ মাইন্ডেড কেন কে জানে! শরীরে ইলেকট্রনের মাত্রা বোধহয় বেশি। এই ক্যাম্পেনটাতে তো প্রথম থেকেই বাগড়া দিচ্ছে লোকটা। কোথায় উৎসাহ দেবে, না, লেঙ্গি মারছে। উর্নির তো মনে হয়, এই যে বড় সাহেব এ-কাজটায় আগ্রহী নয়, এতেও ওই বুড়ো ইলেকট্রনটার আঙুল আছে। এখন এই যন্তরটার কাছে যেতে হবে ঠিকানা চাইতে।

অহন উর্নির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ বলবে। ওঁর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ো তুমি। দেখো কপালে কী আছে!"

উর্নি উঠে দাঁড়াল, বলল, "অহনদা, আপনি চিন্তা করবেন না। সব ম্যানেজ হয়ে যাবে, দেখবেন। কেউ না কেউ থাকবেই।"

অহন বলল, "গাড়িটা ছেড়ে দিয়েই বিপদে পড়লাম, না হলে তোমায় দিতাম।"

উর্নি মাথা নাড়ল, "কোনও প্রবলেম নেই, ট্যাক্সি, অটো, মেট্রো সব আছে। ও ঠিক পৌঁছে যাব।"

ওর বলার ধরন দেখে অহন হাসল। বলল, "রাস্তায় বেরোবার আগে মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিয়ো, পাগলির মতো দেখাচ্ছে।"

দেওয়ালের আয়নায় নিজেকে দেখল উর্নি। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। সত্যিই পাগলির মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু রৌনক কী বলত এরকম চুল দেখে? রৌনক বলত, "ইউ লুক ড্যাম সেক্সি ইন দিস হেয়ার। আই হ্যাভ আ হার্ড অন হোয়েন ইউ লুক লাইক দিস।" রৌনক এখন কোথায় কে জানে। অবশ্য জানবেই বা কেমন করে, ফ্রি স্পিরিটদের খোঁজ রাখা কি সাধারণ মানুষদের কাজ?

অহনের চেম্বারের বাইরে বেরিয়ে, নিজের টেবিলে গিয়ে ব্যাগটা খুলল উর্নি। ছোট্ট চিরুনি বের করে ঠিক করে নিল চুলটা। ওর চুল এমনিতেই ছেলেদের মতো করে ছাঁটা। আঁচড়াতে অসুবিধে হয় না। চিরুনিটা ব্যাগে ভরে, ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে নিল উর্নি। এবার ও রেডি। সামনে বিস্তর কাজ পড়ে আছে। প্রথমে সুগত, না হলে মুকুলদা, তারপর রূপাদি, রাজ গুহ আরও না জানি কোথায় কোথায় যেতে হবে। ও যাবে। যেখান থেকে পারে কাজের লোক ধরে আনতেই হবে। ওর খুব দুর্দিনে অহন ওকে চাকরি দিয়েছিল

BanglaBook.org

এখানে। নির্ভেজাল, শান্ত মানুষটাকে সত্যিই ওর নিজের দাদার মতো লাগে। এ-লোকটার জন্য কিছু করতে পারলে ভাল লাগে উর্নির। উর্নি প্রতুলস্যারের ঘরের দিকে এগোল।

প্রতুলস্যার একটা ফাইল খুলে তার মধ্যে রাখা বিল দেখে পাশের খাতায় কী সব হিসেব করছিলেন। উর্নিকে ঘরে ঢোকার অনুমতি দিয়েও ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন না। একমনে হিসেব করতে লাগলেন। উর্নি দু'বার "স্যার, স্যার" বললেও উনি পাত্তা দিচ্ছেন না। উর্নির মনে হল পাশে রাখা জলের গ্লাসটা উপুড় করে দেয় লোকটার মাথায়। আচ্ছা খচ্চর লোক তো!

উর্নি আরও মিনিট দু'য়েক দাঁড়িয়ে উপায় না দেখে একটু জোরের সঙ্গেই "স্যার" বলে ডাকল।

প্রতুলস্যার মুখ তুললেন, "চেঁচাচ্ছ কেন? আমি কালা?"

উর্নি মনে মনে বলল, তোর সাতগুষ্টি কালা। মুখে বলল, "স্যার, আমায় আর্জেন্টলি বেরোতে হবে। দুটো ঠিকানা চাই। অহনদা বললেন আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিতে।"

প্রতুলস্যার ফাইলের মধ্যে একটা পেন গুঁজে সেটাকে বন্ধ করলেন, তারপর সটান উর্নির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী, সুগত ডুবিয়েছে তো? জানতাম। আরে এ-কাজটা হবে না, ফালতু চেষ্টা করছ। অহনটাও যেমন হয়েছে! অবশ্য তুমি তো বললে ও নাকি কী সব প্ল্যান-ট্যান করেছে। ভাল, ভাল। সে তার বাপের পয়সার শ্রাদ্ধ করলে আমার কী বলার আছে।"

উর্নি কথা ঘোরাতে বলল, "স্যার, যদি রূপা বাগচি আর রাজ গুহর অ্যাড্রেসটা একটু দেন।"

"রূপা আর রাজ!" প্রতুলস্যার তাঁর পোড়া ভুট্টাদানার মতো দাঁত দেখিয়ে হাসলেন, "ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ জয়? অহনটা খেপে গেছে একদম। তা ঠিকানা নিয়ে কী করবে? ফোন করে কথা বলো। ফালতু ট্র্যাভেলিং এক্সপেন্স বাড়িয়ে লাভ আছে?" উর্নির মাথা গরম হয়ে গেল। শালা বুড়ো, নিজে যে যখন-তখন গাড়ি দাবড়ে বেরোস, তখন? সেটা মুফতে হয়? ও বলল, "স্যার, সামনাসামনি কথা বলার ইমপ্যাক্টটাই আলাদা। প্লিজ যদি ঠিকানাগুলো দেন।"

প্রতুলস্যার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ড্রয়ার টেনে একটা মোটা ডাইরি বের করলেন। তারপর তার থেকে দুটো ঠিকানা খুঁজে একটা সাদা কাগজে লিখে বাড়িয়ে

BanglaBook.org

দিলেন উর্নির দিকে। বললেন, "এই নাও তোমার ভাড়াটে সৈন্যদের অফিসের ঠিকানা। দেখো তারা যদি তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করতে রাজি হয়!"

উর্নি হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক'ইউ স্যার।" মনে মনে বলল, ষাঁড়।

প্রতুলস্যার আবার ফাইলটা খুলে ভেতরে গুঁজে রাখা পেনটা বের করলেন। তারপর ফাইলের ওপর ঝুঁকে বললেন, "বাইরে গিয়ে আমার ঘরে এক কাপ কফি পাঠিয়ে দিতে বলো তো।"

উর্নি ভাবল বলে, শুধু কফি কেন? তাতে একটু তুঁতে গুলে দিলে টেস্টটা বাড়ত না? মুখে বলল "দিচ্ছি স্যার।"

করিডোরে বেরিয়ে উর্নি দেখল, গোরা বসে রয়েছে একটু দূরে। খুব মন দিয়ে একটা ইংরেজি বইয়ের ছবি দেখছে ও। বইটা দেখেই ও চিনতে পারল। একটা বিদেশি জার্নাল। উর্নি জানে ওতে বেশ কিছু ন্যুড ছবি রয়েছে। বিভিন্ন ভঙ্গিতে মেয়েরা জামাকাপড় ছাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। উর্নি দেখল গোরা বইটাকে এমন করে দেখছে যেন কালকেই ওর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা রয়েছে আর এখান থেকেই প্রশ্ন দেওয়া হবে।

গোরার বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ, অনেকটাই বড় উর্নির চেয়ে। অফিসে, অহন বাদে সবাই ওকে গোরা বলেই ডাকে। উর্নিও তাই বলে। ও বোঝে না কেন অহন 'গোরাদা' বলে। মাঝে মাঝে উর্নি ভাবে অহন যেন দরকারের চেয়েও বেশি ভদ্র।

উর্নি বলল, "গোরা, স্যারের ঘরে এক কাপ কফি দিয়ো।"

অনেক কষ্টে নিজেকে বইটা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে মুখ তুলল গোরা, জিজ্ঞেস করল, "কফি? এখন দিতে হবে?"

উর্নি দেখল গোরার মুখে বেজায় বিরক্তি। যেন কফি নয়, গন্ধমাদন থেকে সঞ্জীবনী খুঁজে আনতে বলা হয়েছে। এটাই পছন্দ হয় না উর্নির। লোকটা খুব কুঁড়ে। কোনও কাজ করতে বললেই বাহানা দেয়। এই যে প্রতুলস্যারের কফি নিয়ে টালবাহানা করছে, সেটা কিন্তু প্রতুলস্যারের সামনে গেলেই উবে যাবে। তখন সারা পৃথিবীর তেল ঢালবে প্রতুলস্যারের মাথায়। সেইজন্যই তো এখনও টিকে আছে এখানে। চামচাগিরি করে চাকরিটা টিকিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে উর্নি ভাবে ওর হাতে ক্ষমতা থাকলে এটাকেও ঘাড় ধাক্কা দিত। অহন আর ও জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করে বলেই এখনও ফার্মটা টিকে আছে।

BanglaBook.org

উর্নি সামান্য কড়া গলায় বলল, "হ্যাঁ, এক্ষুনি দেবে। হাতের ওই বইটা রাখো। আর অহনদাকেও এক কাপ দেবে।"

"অহনদাকেও?" গোরার মুখে এখনও অনিচ্ছে।

"আপত্তি আছে?" এবার ভুরু কুঁচকে আরও কড়াভাবে জিজ্ঞেস করল উর্নি।

"না না, এই দিচ্ছি।" গোরা বইটাকে রেখে চলে গেল ওদের কফির জায়গায়। উর্নি বুঝল, শেষ কথাটা বলার সময় একটু বেশি হার্শ হয়ে গিয়েছিল। আসলে সকালেই সুগত এমন ফোনটা করল যে টেনশনে ওর মেজাজটাও খারাপ হয়ে আছে।

আর দেরি করল না উর্নি। ও বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

পার্ক স্ট্রিটের এই ফুটপাথটায় রোদ পড়ে না বিশেষ। সবসময় কেমন স্যাঁতস্যাঁতে, মনমরা ভাব। শীতকালের এই সকালটায় ফুটপাথটাকে কেমন ভেজা মনে হল উর্নির। মনে হল কে যেন জল ঢেলে দিয়ে গেছে। সকাল থেকেই আজ হাওয়া দিচ্ছে একটা। বেশ ঠান্ডা একটা হাওয়া। উর্নির শরীরটা শিরশির করে উঠল, তবে কতটা ঠান্ডায় আর কতটা টেনশনে ঠিক বুঝতে পারল না। একবার আকাশের দিকে তাকাল ও। যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে ধূসর একটা জ্যামিতিক আকার দেখল উর্নি। কলকাতার মাথায় এই ধূসর রংটাই ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে উর্নি। ওর খারাপ লাগত রংটা। কেননা মনমরা, দূষিত এক রং। তবে মাঝখানের দুটো বছর এই রংটাই খুব ভাল লাগতে শুরু করেছিল ওর। কারণ রৌনক। রৌনকের ঘরের রং, ওর জামাকাপড়ের রং সবটাই ওই আকাশের মতো ছিল। তখন রৌনকের সব কিছুই ভাল লাগত উর্নির। সেই দুটো বছর ওর পছন্দ অপছন্দগুলো সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার সব থিতিয়ে গেছে। সব কিছু আগের মতো হয়ে গেছে। কারণ রৌনক আর নেই ওর জীবনে। কিন্তু উর্নি মাঝে মাঝে ভাবে, সত্যিই কি সব কিছু আগের মতো হয়েছে?

মনমরা ফুটপাথ, ধূসর আকাশ আর সকাল ন'টা কুড়ির পার্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটতে লাগল উর্নি। একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। সামনে জরুরি কাজ রয়েছে।

ফ্লুরিসের সামনে দিয়ে রাস্তা পার করে অন্য দিকে গেল উর্নি। একটু দূরে, কোয়ালিটির সামনে একটা খালি ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে। ওটা ধরতে হবে। তবে মনে হল, আরেকজন ভদ্রলোক ওটা ধরবে বলে এগোচ্ছেন। উর্নি বুঝল, আর

BanglaBook.org

সময় নেই। আশেপাশে আর একটাও ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে না। এটা ধরতেই হবে। ও দৌড়োল। আশেপাশের দু'-এক জন একটু অবাক হয়ে তাকালেও ও পাত্তা দিল না। ওই ভদ্রলোককে অতিক্রম করে ট্যাক্সিওলাকে কোনও কিছু জিজ্ঞেস না করেই প্রায় ঝাঁপ মেরে ও ঢুকে গেল পেছনের দরজা দিয়ে। তারপর অবাক হয়ে দেখল সেই ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল ফুটপাথ ধরে। ইস্, পুরো সিন। বোকার মতো দৌড়োল।

ও নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বসে দেখল ট্যাক্সিওলা জুলজুল করে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। উর্নি একটু অপ্রস্তুত মুখে জিজ্ঞেস করল, "গড়িয়াহাট জায়েগা?"

ট্যাক্সিওলাটা বলল, "বসেই যখন পড়েছেন, তখন না গিয়ে উপায় আছে? আর দেখুন, হিন্দিতে বলবেন না। আমায় দেখতে বিহারিদের মতো হলেও আমি বিহারি নই। বুঝলেন? সব উলটোপালটা লোক এসে কলকাতার ট্যাক্সি লাইনটার পোঁ... ইয়ে সব্বোনাশ করেছে। আমার তো মনে হয়..."

উর্নি বলল, "প্লিজ, গড়িয়াহাট চলুন।"

ড্রাইভারটি হতাশ হল। মুখ ফিরিয়ে মিটারের সুইচ টিপল। তারপর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল, "চলুন, আমার কী? সকালেই যা আজ একটু ব্যাবসা-পত্তর হবে। দুপুর হলেই তো সব মিছিল করবে। শালা বিশ্বশান্তি! একদম বো... মানে জঘন্য ব্যাপার। তোর ঘরে শান্তি আছে যে বিশ্বে আসবে? যত সব গা... ইসের মতো কারবার।"

উর্নি চশমাটা খুলে চোখের কোণ দুটো টিপল। ভুল করে রেডিয়ো স্টেশনে ঢুকে পড়েছে মনে হল। নাঃ, এ লোকটার কথায় কান দেবে না। ও সিটে হেলান দিয়ে বসল। আজ কলকাতায় ছুটির মুড যেন। চারিদিকে আধ-সেঁকা পাউরুটির মতো ভিড়, ঢিলেঢালা গাড়ি, বাইক। পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের দোকানপাট তো দারুণ ভাবে সেজেছে। স্যান্টা দাদুর আসার সময় হয়ে এল। উর্নির মা ক্রিশ্চান ছিল। এই দিনগুলোয় মা ওদের বাড়িটাকে সুন্দর ভাবে সাজাত। রিবন, বেলুন, ক্রিসমাস ট্রি, ছোট ঘণ্টা, স্টার, অ্যাঞ্জেল, লাল মোজা আরও কত কী। এখন মা নেই। ওদের বাড়িটা কঙ্কালের মতো পড়ে থাকে। শুধু ক্রিসমাস ইভের রাতে, উর্নি কাচের মধ্যে রাখা একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখে যিশুর পায়ের তলায়। বলে, "আমার

BanglaBook.org

মাকে তুমি দেখো।" ক্রিসমাস ওর কাছে খুব একটা আনন্দের সময় নয়। বছর দশেক আগে ক্রিসমাসের দিনই ওর মা মারা যায়। সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না টাঙিয়ে ঝুলে পড়েছিল মা। তার বছর খানেক আগে থেকে ডিপ্রেশনে ভুগছিল মানুষটা। আর নিজের জন্মদিনে যিশু টেনে নিয়েছিল ওর মাকে। এই দিনটা এলেই ওর কান্না পেত খুব। কিন্তু চোখ দিয়ে জল বেরোত না। শুকনো কুয়োর মধ্যে বালতি পড়ে গেলে যেমন আওয়াজ হয়, তেমন আওয়াজ হত বুকের ভেতরে। শুধু একবার ক্রিসমাসেই কেঁদেছিল ও। রৌনকের ঘরে, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে খুব কেঁদেছিল ও।

গড়িয়াহাটে এসে ড্রাইভারটি বলল, "এসে গেছি, এবার কোথায় নামবেন?"

উর্নির সংবিৎ ফিরল। পৌনে দশটা বাজে। সুগত তো বলেছিল দশটা নাগাদ বেরিয়ে যাবে। সুগতটা এরকমই। উঠল বাই তো কটক যাই। নেহাত ছেলেটা অসাধারণ কাজ করে, তাই ওর এসব খ্যাপামো সহ্য করেও ওকে রাখা হয়েছে। কিন্তু এবার যা করল, তা ক্ষমার অযোগ্য। উর্নি জানে, অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী হয়তো অহনের আসা উচিত ছিল। কিন্তু উর্নি নিজেই এসেছে। অহনকে যেরকম টেনসড দেখেছে তাতে ওর আসার প্রশ্নই ছিল না।

"কী হল? কোথায় নামবেন?" ড্রাইভারের গলায় অধৈর্য। উর্নি বলল, "আরেকটু এগিয়ে, ওই ভেতর দিয়ে গিয়ে হিন্দুস্তান পার্কে।"

"হিন্দুস্তান পার্ক? সেটা গড়িয়াহাট হল?"

"আরে একই তো।" উর্নি বোঝাবার চেষ্টা করল।

"একই?" স্টার্ট বন্ধ করে ড্রাইভারটি ঘুরে বসল, "গড়িয়াহাট আর হিন্দুস্তান পার্ক এক? রসগোল্লা আর সন্দেশ এক? হাঁস আর হাসপাতাল এক? জল আর জলযোগ এক?"

"আশ্চর্য!" চিৎকার করল উর্নি, "বলছি চলুন। কাছেই। খুব দরকার। তখন থেকে হাবিজাবি বকছেন। চলুন।"

ধমক খেয়ে ড্রাইভারটি থমকে গেল। তারপর বলল, "বকছেন কেন? যাব তো। শুধু দুটো জায়গা যে এক নয় সেটাই বোঝাচ্ছিলাম।"

উর্নি কড়া চোখে তাকাল, "চলুন বলছি, আর একটা কথা নয়।"

দশটা বাজতে পাঁচে সুগতর বাড়ির কলিংবেলটায় চাপ দিল উর্নি। বুকটা

BanglaBook.org

টিপটিপ করছে। ও কি পারবে সুগতর যাওয়া ক্যানসেল করতে?

সুগত এখানে ওর দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে থাকে। ওর দিদিই দরজা খুলে দিল। ওকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "আরে উর্নি? তুমিও ওদের সঙ্গে যাচ্ছ নাকি?"

উর্নি উত্তর না দিয়ে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ও?"

দিদি ওপরের দিকে আঙুল তুলে বলল, "ঘুলঘুলিতে।"

এই বাড়ির মেজানাইন ফ্লোরে থাকে সুগত। এটাকে ও বলে ঘুলঘুলি। উর্নি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। এ-ঘরটাকে ঘুলঘুলি বললেও ঘরটা খুব একটা ছোট নয়। তবে সিলিংটা একটু নিচু।

উর্নি দেখল একটা হ্যাভারস্যাক পেট মোটা কচ্ছপের মতো উলটে পড়ে আছে খাটে আর সুগত ছোট টুলে বসে মোজা পরছে। ওকে দেখে সুগত বলল, "কী রে এসে পড়েছিস? ওই টেবিলটায় আমার রেজিগনেশন লেটার আছে, নিয়ে যাস।"

"কী বলছিস? আমাদের এভাবে ডুবিয়ে তুই ঘুরতে যাচ্ছিস?"

"দেখ, তোকে বলেছিলাম ফিরে এসে কাজটা করে দেব। কিন্তু পাশাপাশি এটাও লিখে রেখেছি। নাউ ইটস্ ইয়োর চয়েস।"

"এমন করিস না সুগত। অহনদা ভীষণ বিপদে পড়বে।" কাতর গলায় বলল উর্নি।

সুগত এবার পায়ে স্নিকার গলিয়ে ফিতে বাঁধতে লাগল।

উর্নি আবার বলল, "প্লিজ এমন করিস না। এসব বাদ দে। মঙ্গলবার অবধি পার করে তারপর যেখানে খুশি বেড়াতে যা।"

সুগত জুতো বেঁধে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা কাঁধে নিল। তারপর বলল, "শোন, আজকাল সফট্ ড্রিঙ্কস নিয়ে কেমন বাওয়াল চলছে দেখেছিস না? তা ছাড়া এসব খেলে মানুষ মোটাও হয় খুব। ওসব বাদ দে। ওসবের অ্যাড করতে হবে না।"

"তোর কী হল, কালকে অবধি তো সব ঠিক ছিল?"

"আমরা আর্টিস্টরা এরকমই। বললাম তো রেজিগনেশন লেটার টেবিলে আছে। গাড়ি করে বন্ধুদের সঙ্গে এতটা পথ যাওয়া, তার ওপর আবার শীতে জঙ্গল, বুঝতে পারছিস? শালা চাকরির মুখে লাথি।"

উর্নিকে কিছু বলতে না দিয়ে নীচে নেমে গেল সুগত। উর্নিও নামল পেছন

BanglaBook.org

পেছন। সুগত ওর দিদিকে বলল, "আসি রে, নিউ ইয়ারে ফিরব।"

দিদি বলল, "সাবধানে যাস।"

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সুগত। উর্নিও বেরোল। শেষ বারের মতো চেষ্টা করল, "প্লিজ সুগত। কাম টু ইয়োর সেন্সেস।"

সামনে দাঁড়ানো একটা বড় এস ইউ ভি'র দরজা খুলে উঠে পড়ল সুগত। উর্নি দেখল ভেতরে আরও তিন জন রয়েছে। সুগত বলল, "তুইও চল না। ঝম্প হবে। আবার মাল খেলে 'রৌনক রৌনক' বলে বাওয়াল করবি।"

উর্নি এবার মেজাজ হারাল, আচমকা বলল, "ফাক ইউ।"

সুগত হাসল, বলল, "আই উড লাভ টু, কিন্তু সময় নেই রে।"

উর্নির মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। এস ইউ ভি বেরিয়ে গেল ওর নাকের ডগা দিয়ে।

দশটা দশ। ঘড়ি দেখল উর্নি। আর সময় নষ্ট করবে না। এবার মুকুলদাকে ধরতে হবে। সাধারণত এ-সময় রাসবিহারী মোড়ের ওঁর স্টুডিয়োতেই থাকেন উনি। অবশ্য ওটা বাড়ি কাম স্টুডিয়ো। ওখানেই ধরতে হবে ওঁকে। মুকুলদা বেরিয়ে গেলে মুশকিল।

উর্নি এদিক ওদিক তাকাল। কোনও ট্যাক্সি নেই। আর অপেক্ষাও করা যাবে না। ও প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে গেল বড় রাস্তায়। ওই তো অটো আসছে একটা। এটাতেই যেতে হবে। আর সময় নষ্ট করলে হবে না। উর্নি হাত তুলল। খ্যাচ করে ওর সামনে এসে থামল অটোটা। পেছনে দু'জন বসে রয়েছে। ও পেছনেই উঠে বসল, বলল, "রাসবিহারী মোড় যাব।" অটো চলতে শুরু করল।

ঠান্ডা হাওয়া এসে মুখে লাগছে উর্নির। সামান্য শীত শীত করছে ওর। প্রতি বছর এ-দিনটায় ওর মন খারাপ থাকে। পঁচিশে ডিসেম্বর ওর মায়ের মৃত্যুদিন, এই চিন্তাটা ওকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে। কিন্তু আজ ওর মনের বোধহয় খারাপ হওয়ার মতো সময়ও নেই। হঠাৎ ওর মনে পড়ল ফেরার পথে কেক নিয়ে যেতে হবে আজ বাড়িতে। বাবা ফ্রুট কেক ভালবাসে।

রাসবিহারী মোড়ে অটোটা থামামাত্র উর্নির মোবাইল বেজে উঠল। ও অটো থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ফোনটা ধরল। অহন। উর্নি দ্রুত বলল, "অহনদা, সরি, সুগত শুনল না। আমি এবার মুকুলদার কাছে যাচ্ছি।"

"শুনল না?" অহনের গলায় হতাশা টের পেল উর্নি।

BanglaBook.org

"চিন্তা করবেন না অহনদা, আমি দেখছি কী করা যায়।" বলে উর্নি ব্যাগ থেকে দশ টাকার নোট বের করে অটোওলাকে দিয়ে মোড়ের দিকে হাঁটতে লাগল।

অহন বলল, "দেখো চেষ্টা করে। আর কী বলব? ইউ ক্যারি অন।"

উর্নি বলল, "অহনদা, ডোন্ট ওরি। একটা পথ বেরোবেই।"

ফোন কাটার আগে অহনের দীর্ঘশ্বাসটা স্পষ্ট শুনল উর্নি।

"দিদি, চেঞ্জটা।"

"অ্যাঁ?" পেছনে ফিরল উর্নি। দেখল অটোওলাটা পয়সা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উর্নি বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "মানে? কীসের পয়সা?"

লোকটা ইতস্তত করে ছ'টাকা ফেরত দিল উর্নির হাতে, বলল, "দশ টাকার নোট দিয়েছিলেন, ভাড়া তো চার টাকা।"

উর্নি টাকাটা নিল। লোকটা সৎ। অবশ্য ভুলটা ওরই। এতটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কথা বলতে বলতে যে, খেয়াল ছিল না। উর্নি হাসল, বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

অটোওলাটা মাথা নেড়ে চলে গেল। কেন জানে না, কিন্তু উর্নির মনে হল, সকাল থেকে এই প্রথম ভাল কিছু ঘটল। তবে কি ভাল ঘটনার শুরু হল? মুকুলদার কি তা হলে রাজি হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে? উর্নি দেখল অটোওলাটা অটো ঘুরিয়ে স্ট্যান্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বোম ২৪ ডিসেম্বর, সকাল দশটা কুড়ি

স্ট্যান্ডে সব অটোর পেছনে নিজের গাড়িটা রাখল বোম। তারপর বুকপকেটে হাত দিয়ে দেখল মোবাইলটা রয়েছে কি না। নাঃ আছে। এই হয়েছে এক সমস্যা। সবসময় দেখতে হয় ফোনটা পকেটে রয়েছে কি না! কেন যে রুচি এটা ওর পকেটে গুঁজে দিয়েছে! ও কি ঘুড়ি যে, লাটাইয়ের মতো করে ধরে রাখতে হবে ওকে? তবে রুচিকে কে বলবে এই কথা? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে? বোম নিজে তো বটেই, ওর বাবা-মা-ও ভয় পায় রুচিকে। সেই বিয়ের প্রথম দিন থেকেই রুচি ওদের বাড়িকে দাবড়ে চলেছে। ওদের বাড়ির পাশে থাকা নকুলজ্যাঠা তো বিয়ের এক সপ্তাহের মাথায় বলেছিল,

BanglaBook.org

"বোম, এ কাকে বিয়ে করে এনেছিস? চম্বলের মেয়ে নাকি? দস্যুদের রিলেটিভ?"

পাশেই বাঁধানো একটা গুলমোহর গাছ। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দুই পাশে আশ্চর্যজনক ভাবে এখনও কিছু গাছ রয়ে গেছে। এই গুলমোহরটাও সেই গাছেদের গোত্রেরই। বোম ওই বাঁধানো গাছের গোড়ায় বসল। একটা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে সকাল থেকে। ঠান্ডা একদম ভাল লাগে না বোমের। এই সময়টায় কেমন আলস্য লাগে ওর। কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করে না। শুকনো হাওয়ার টানে পা ফেটে যায়, গায়ের চামড়া শুকিয়ে খড়ি ওঠে। সারাদিন একটা অস্বস্তি, একটা খারাপ লাগা ঘিরে থাকে ওকে। অবশ্য বোমের তো অনেক কিছুই খারাপ লাগে, তা বলে কি সেগুলো হচ্ছে না পৃথিবীতে?

পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বের করে তার থেকে একটা লবঙ্গ মুখে দিল বোম। লবঙ্গের গন্ধ ভাল লাগে বোমের। ও চোখ বন্ধ করল। ক'টা বাজল? সাড়ে দশটা কি? সাড়ে এগারোটা নাগাদ একবার বাড়িতে যেতে হবে ওকে। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পকেটের মোবাইলটা টুং টাং শব্দে বেজে উঠল এবার। আপনা থেকেই মুখটা বেঁকে গেল বোমের। আবার ফোন! ও ফোনটা বের করে কানে ধরল, "হ্যাঁ, বলছি।"

ওপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রুচির গলা, "কোথায় তুমি? মনে আছে তো সাড়ে এগারোটার সময় সোনাইকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?"

বোম লম্বা শ্বাস নিল একটা, "হ্যাঁ, মনে আছে।"

"সকাল থেকে ক'টা ট্রিপ হল?"

প্রশ্নটায় একটু দমে গেল বোম। অবশ্য রুচি প্রশ্নটা করতেই পারে। অটোটা তো ওর টাকাতেই কেনা।

প্রথম প্রথম অন্য লোকের অটো, কমিশন বেসিসে চালাত বোম। কিন্তু তারপর রুচি ওকে অটো কিনে দেয়। এবং প্রতি দিনই মাঝেমধ্যে ফোন করে খবর নেয় কেমন রোজগার হচ্ছে। অবশ্য শুধু অটোই নয়, মোবাইলটাও রুচির কিনে দেওয়া। তা দিতেই পারে রুচি। এখন ওর অনেক টাকা।

বোম বলল, "এই চারটে ট্রিপ হয়েছে।"

"চারটে? এর মধ্যে তো ছ'টা হওয়ার কথা। কী করে গাড়ি চালাও? ওটা

BanglaBook.org

অটো না গোরুর গাড়ি? বিছানাতেও যেমন, রাস্তাতেও তেমন। তুমি ক্যালানে, ক্যালানেই রয়ে গেলে। যাক, ঠিক সময়ে চলে এসো।"

ফোনটা বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল বোম। ক্যালানে! হয়তো রুচি ঠিকই বলছে। রাস্তাতেও ক্যালানে, বিছানাতেও ক্যালানে। সেইজন্যই তো রুচি কালুর সঙ্গে শুতে চেয়েছিল। এক রাতে নিঃশেষ হওয়া বোমকে বুকের ওপর থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে রুচি বলেছিল, "এরই মধ্যে বেরিয়ে গেল? আমার তো গরমই হয়নি এখনও। তুমি পুরুষ মানুষ? না চেহারা, না কিছু। আমার সারাজীবন কাটবে কীভাবে বলো তো? এর চেয়ে কালুর সঙ্গে শুলে বোধহয় আরাম পেতাম।" এর কী অর্থ ও জানে। কারণ তত দিনে কালু ওকে বলে দিয়েছিল ঘটনাটা।

"কী বোমদা, এখানে বসে কী করছ? অটো এগোবে না?"

বোম মুখ তুলে দেখল বিড়ি মুখে নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জাসু। জাসুস। মনে মনে বলল বোম। এই ব্যাটা রুচির হয়ে এখানে গোয়েন্দাগিরি করে ওর ওপর। বোম বলল, "নাঃ, আজ আর এ-বেলা চালাব না। তুই একটা ট্রিপ মেরে আয় না।"

জাসুর ভুরু কুঁচকে গেল, "কেন? তোমার কী হয়েছে?"

বোম শব্দ করে নাক টানল, তারপর কৃত্রিমভাবে কাশল একটু, বলল, "শরীরটা ভাল নেই রে। মাথা ধরে রয়েছে। এমন ঠান্ডা হাওয়া মেরেছে না! আর একটু পরেই তো বাড়ি যাব।"

"কেন? বাড়ি যাবে কেন?"

"সোনাইটাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে রে।"

"ডাক্তারের কাছে?" ভুরু কুঁচকে গেল জাসুর, "কেন কী হয়েছে?"

ভাল করে ওর মুখটা দেখল বোম তারপর বলল, "বাদ দে।"

"না, তুমি বলো না, আমি সঙ্গে যাব?" জাসু হাতের শেষ হওয়া বিড়িটাকে মাটিতে ছুড়ে দিল। চোখেমুখে সত্যিকারের উদ্‌বেগ।

এই রে, প্রমাদ গুনল বোম। ও জানে সোনাইয়ের ওপর জাসুর দুর্বলতা আছে। অবশ্য যারা যারা সোনাইকে দেখে তারাই ওর ওপর দুর্বল হয়ে পড়ে। ছোটবেলায়, ওরা যখন খুব গরিব ছিল, সবাই ওর বাবাকে বলত, "আপনার মেয়েকে নিয়ে চিন্তা নেই, যা দেখতে, রাজপুত্র এসে নিয়ে যাবে ওকে।"

না, রাজপুত্র আসেনি সোনাইয়ের জীবনে। এসেছে কালু। এই রুটেই অটো

BanglaBook.org

চালায়। আজ সোনাইকে নিয়ে বোম যাবে রবীন্দ্রসদনের কাছে এক্সাইড মোড়ে। না, কোনও ডাক্তারটাক্তার নেই সেখানে। সেখানে বারোটা নাগাদ অপেক্ষা করবে কালু। আজ সোনাই আর কালু বিয়ে করবে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। বাড়ির সবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বোম এই ব্যাপারে সাহায্য করবে বোনকে। অবশ্য গোপনে। আর এখন যদি এই জাসু সঙ্গে যেতে চায় তো বিপদ হবে।

বোম বলল, "তুই গিয়ে কী করবি? তার চেয়ে আমার অটো নিয়ে চক্কর মেরে দে না। রুচিও খুশি হবে।"

জাসু ঠোঁট ওলটাল, হতাশ গলায় বলল, "যখন তুমি বলছ তখন ঠিক আছে।"

বোম ওকে উৎসাহ দেবার জন্য বলল, "আর সারাজীবন কি অটোর লাইন ম্যানেজ করবি নাকি? এই যে তোকে আমি আমার অটো চালাতে দিচ্ছি, অন্য কেউ দেবে? আমি তো চাই তুই অটো চালা। নিজের পায়ে দাঁড়া। এক দিন না এক দিন তো সংসারপাতি করতে হবে, নাকি?"

"সংসারপাতি?" জাসুর মুখটা নরম হয়ে এল। বোম বুঝল ও নিশ্চয়ই মনে মনে সোনাইকেই দেখছে। বোম তো জানে, জাসু যখন ওদের বাড়ি যায় তখন শুকনো বালি যেভাবে জলের দিকে তাকায়, জাসুও তেমন ভাবে সোনাইকে দেখে। কিন্তু জাসুকে একদম সোনাইয়ের দিকে ঘেঁষতে দেয় না রুচি। কারণ রুচি নিজের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে রেখেছে সোনাইয়ের। কথা আছে সামনের মাঘেই বিয়ে হবে ওদের। তাই আর রিস্ক নিতে চায় না কালু, এই পৌষ মাসেই রেজিস্ট্রিটা সেরে ফেলতে চায়।

গত সপ্তাহে রাতের খাবারের পর যখন সোনাই চুপিচুপি বোমকে বলেছিল, "দাদা, সামনের চব্বিশে ডিসেম্বর আমরা রেজিস্ট্রি করব ঠিক করেছি।" তখন খুব অবাক হয়েছিল বোম। ও জানত গোপনে দু'জনের ভাব রয়েছে। তা বলে বিয়ে? ও বলেছিল, "বিয়ে? মাথা খারাপ তোর? কী রোজগার করে কালু? ভাড়ার অটো চালায়, বস্তিতে থাকে, বিয়ে বললেই বিয়ে হয় নাকি? তা ছাড়া এটা পৌষ মাস না?"

সোনাই নিচু কিন্তু দৃঢ় গলায় বলেছিল, "ওসব পৌষ মাস মানি না আমরা। আর বস্তি? মনে নেই আগে কোথায় থাকতাম আমরা? দাদা, আমি চাই আমাদের রেজিস্ট্রির দিন তুই অন্তত থাকিস। বাবা মা বা বউদি তো মানবে না। তুই থাকলে আমার ভাল লাগবে।"

BanglaBook.org

সেই রাতে কিছু না বললেও বোম মেনে নিয়েছিল বোনের কথা। প্রেম কী, বোম জানে। প্রেম হারানো কী, তাও জানে। দু'দিন পরে ও সোনাইকে বলেছিল, "ঠিক আছে, তুই চিন্তা করিস না। আমি তোকে নিয়ে যাব।"

সোনাই বিহ্বল হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর ওর হাত ধরে বলেছিল, "খুব ভাল হয় তা হলে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় আর কৈফিয়ত দিতে হবে না আমায়। সত্যিই যাবি তো?"

যাবে বোম, আজ বোনটাকে নিয়ে যাবে ও। গোরাচাঁদ বলে যে-ছেলেটার সঙ্গে সোনাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে সম্পর্কে ওর শালা হলেও, তাকে একদম সহ্য করতে পারে না বোম। খুব ভড়ংবাজ, কুঁড়ে আর চালিয়াত ধরনের ছেলে। পার্ক স্ট্রিটে একটা বিজ্ঞাপন অফিসে পিয়োনের কাজ করে। কিন্তু দেখা হলেই এমন ভাব করে যেন কোম্পানিটা ওর বাবার। বলে, "বোমদা, ওসব অটো চালানোর মতো ছোটলোকি কাজকারবার ছেড়ে চলো দু'জনে ব্যবসায় নামি। দিদির থেকে টাকা নিয়ে একটা বাংলা মালের দোকান দিই। টাকার বৃষ্টি হবে। বিড়ির পোঁদ টেনে শালা গালে গর্ত হয়ে গেল, ব্যাবসা জমলে, ফরসা মেয়েছেলের আঙুলের মতো সিগারেট খাব।"

ওর কথায় কোনও উত্তর দেয় না বোম। শুধু মনে মনে বলে, আমার গাড়িই ভাল।

"ভগবান, তুমি মানুষকে বাঁচাও। সারা পৃথিবীতে প্রচুর মানুষ মরে যাচ্ছে, তুমি তাদের বাঁচাও। ভগবান, মানুষের ভাল করো তুমি।"

বোম দেখল পাশের ছোট মন্দিরের সামনে হাত জোড় করে বসে নিজের মনে কথা বলে চলেছে নেড়ু পাগলা। ময়লা পাজামা আর শতছিন্ন চাদর গায়ে দেওয়া লোকটাকে দেখে কষ্ট হল বোমের। কী মানুষের কী অবস্থা!

জাসু বলল, "দেখো বোমদা, পাগলাটা শালা আজও মন্দিরের সামনে বসেছে। দেখো, এই সব ভড়ংবাজির পরে ওই বারকোশে রাখা বাতাসা নিয়ে পালাবে মালটা। বহুত হারামি পাগল, হেভি সেয়ানা।"

বোম বলল, "ধুত, অমন বলিস না। লোকটা পাগল হতে পারে, কিন্তু অনেক বড় ঘরের মানুষ।"

"মানে?" অবাক হল জাসু।

বোম বলল, "তুই তো এই ঠেকে বছর তিনেক হল এসেছিস, কিন্তু ও এই অঞ্চলে প্রায় ছ'বছর হল আছে। কেউ মেরে অজ্ঞান করে ওকে লেকে ফেলে

BanglaBook.org

দিয়েছিল। হয়তো মারতেই চেয়েছিল, অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখে হয়তো ভেবেছিল মরে গেছে। পিঠে আর পেটে ছুরির ক্ষতও ছিল। মাথার ওপরটাও থেঁতলে গিয়েছিল। সে সময় ওর পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি আর জিনসের প্যান্ট ছিল। আমার এখনও মনে আছে, তখনও বিয়ে হয়নি আমার। সকালে লেকের মাঠে ফুটবল খেলতে যেতাম আমরা। কখনও সখনও লাশ পাওয়া গেছে শোনা যেত। সে-দিনও লাশের খবর পেয়ে আমরা খেলা থামিয়ে ছুটেছিলাম। এই নেড়ুর শরীরটা উপুড় হয়ে পড়ে ছিল জলের ধারে। আমরা যাওয়ার পরে পুলিশ আসে। তখনই বোঝা যায়, এটা লাশ নয়। মানুষটা বেঁচে রয়েছে। পুলিশ গাড়িতে করে নিয়ে চলে যায় ওকে। দেখে মনে হয়েছিল, বিশাল বড় বাড়ির ছেলে এই নেড়ু পাগলা। কে জানে, সত্যিই তাই কি না! তবে পুলিশ ওকে নিয়ে যাওয়ার দু'মাস পরে ও ফিরে আসে এই অঞ্চলে। মাথা সম্পূর্ণ খারাপ, পুরনো কথা কিছু মনে নেই। পুলিশের হাসপাতাল থেকে ওকে ছেড়ে দিয়েছিল না ও পালিয়ে এসেছিল, কিচ্ছু জানি না আমরা। কিন্তু তারপর থেকেই ও এখানে।"

জাসু মন্দিরের সামনে বসা নেড়ুর দিকে তাকিয়ে বলল "এ শালার পেটে পেটে এত? ছুরি খাওয়া মাল? শালা চোস্ত জিনিস তো!"

বোম বলল, "দেখ ওভাবে বলিস না। শত হলেও মানুষ তো।"

জাসু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পারল না। অটোর লাইন থেকে কানাই চিৎকার করল, "ও বোমদা, তুমি মাইরি যাবে? না হলে আমি প্যাসেঞ্জার তুলি?"

বোম উত্তর দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত থমকাল, দেখল লাইনের শেষে গাড়ি লাগাচ্ছে কালু। কালুর সঙ্গে একটু দরকারি কথা সেরে নিতে হবে ওকে। তার আগে এই জাসুকে কাটাতে হবে এখন।

বোম অটোর চাবিটা জাসুর দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, "না রে কানাই, জাসু ট্রিপ দেবে। তুই ভাই পরের বার প্যাসেঞ্জার তুলিস।"

কানাই হাত দিয়ে একটা অসভ্য ইঙ্গিত করে বলল, "ওর হাতে গাড়ি দিচ্ছ তো, পুরো ইয়ে করে দেবে গাড়ির।"

জাসু রেগে গিয়ে বলল, "তোর মাকে দেব রে বাঞ্চোৎ। আমায় গাড়ি চালানো শেখাচ্ছিস?" তারপর এগিয়ে গেল বোমের অটোর দিকে।

মনে মনে নিশ্চিন্ত হল বোম। যাক গে আপদটা গেছে। পকেট থেকে

BanglaBook.org

মোবাইলটা বের করে দেখল পৌনে এগারোটা বাজে। এখনও হাতে একটু সময় আছে। ও আবার ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

ওদের এই স্ট্যান্ডে একমাত্র ওরই মোবাইল ফোন রয়েছে। এটার জন্য মনে মনে একটু সংকুচিত হয়ে থাকে বোম। কারণ ও জানে ওর যা ইনকাম তাতে মোবাইল ফোন রাখার সামর্থ ওর নেই। এর চেয়েও যেটা ওর গায়ে লাগে, সেটা হল এই অটো স্ট্যান্ডের সবাই এই ফোনটা নিয়ে ওকে খোঁচা দেয়। কারণ সবাই জেনে গেছে ফোনটা ওর বউয়ের, রুচি কিনে দিয়েছে ওকে।

রুচির সঙ্গে বিয়ের আগে বোমের অন্য একজনের সঙ্গে ভাব ছিল। মেয়েটার নাম ছিল রেণু। বোম ভাবত ও যেমন পাগলের মতো ভালবাসে রেণুকে, রেণুও বোধহয় তেমনই ভালবাসে ওকে। নিজের রোজগার থেকে সাধ্যমতো উপহার প্রায়ই রেণুকে কিনে দিত বোম, আর বলত, রেণুকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না ও। রেণু সব উপহারগুলো হাত পেতে নিত আর বিয়ের কথা শুনে হাসত। বোম ভাবত এটা সম্মতির হাসি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ও খবর পেল যে, কোনও এক ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে রেণুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সেদিন পাগলের মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল বোমের। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ও রেণুদের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল। রেণুকে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, "আমায় ভালবাসো না তুমি?"

রেণু আশ্চর্য মুখ করে বলেছিল, "না তো।"

"তা হলে আমার দেওয়া জিনিস নিতে কেন?"

"বা রে তুমি দিতে কেন? আর তার পরিবর্তে তোমাকে আমার বুক ধরতে দিইনি?"

"মানে? তুমি... তুমি..." কথা হারিয়ে ফেলছিল বোম।

রেণু তারপর এককথায় সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে বলেছিল, "শোনো, ট্রাকের সঙ্গে অটো কোনওদিন পারে? আর তোমার দেওয়া জিনিসের দাম যদি এখনও না ওঠে তবে আরও একবার এই দুটো ধরে নাও।" রেণু ওড়নাটা সরিয়ে এগিয়ে দিয়েছিল ওর বুক।

তারপর থেকে সারাদিন মনমরা হয়ে থাকত বোম। অর্ধেক দিন কাজে বেরোত না। খাটের এক কোনায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকত। বিশেষ খেত না, কথাও বলত না কারও সঙ্গে। মা জিজ্ঞেস করত, কী হয়েছে? ও বলত না। সোনাই জিজ্ঞেস করত, ও বলত না।

BanglaBook.org

এইসব বেশ কিছু দিন চলার পর বাবা দুম করে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল বোমের। ওকে না জিজ্ঞেস করেই। বোমের কোনও কথা না শুনে প্রায় ঘাড় ধরে ওকে দিয়ে বিয়েটা করানো হয়েছিল। শুভদৃষ্টির সময় রুচির দিকে ভালভাবে তাকায়ওনি ও। ইচ্ছেই করছিল না ওর।

রুচিকে ও প্রথম ভাল করে দেখে ফুলশয্যায়। দু'-চারটে টুকটাক কথার পর, রুচি হঠাৎ এগিয়ে এসে গলা জড়িয়ে ধরেছিল ওর। বলেছিল, "অ্যাই, তুমি ক্যাপ কিনে রেখেছ তো?"

বুঝতে পারেনি বোম, "ক্যাপ? মানে?"

"নিরোধ রে বাবা নিরোধ। আজ করবে না?"

বোমের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ও দেখেছিল শাড়ির আঁচল গায়ের থেকে নামিয়ে ব্লাউজ খুলছে রুচি। বলছে, "প্রথম দিন তো, রক্ত বেরুবে, একটা গামছা রেখেছ তো? আস্তে কোরো কিন্তু।"

ব্লাউজটা খুলে শুধু ব্রা পরে ওর দিকে এগিয়ে এসেছিল রুচি। তারপর ওর পাজামার দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, "আমারটা ধরবে না?"

বোম কথা বলতে পারছিল না। ও দেখছিল এ যেন রুচি নয় রেণু। ওর দিকে যেন কেউ বাড়িয়ে দিয়েছে দুটো উত্তপ্ত লোহার গোলক।

"এ মা কই গো?" রুচির আচমকা কথায় সংবিৎ ফিরেছিল বোমের।

ও দেখেছিল, রুচির হাতটা ওর পাজামার ওপর হাতড়াচ্ছে আর রুচি বলছে, "কই গো? তোমারটা কই? এ মা এ যে বিড়ির সাইজ হয়ে আছে।"

সেই রাতের পর থেকে রুচির সঙ্গে শুতেই ভয় লাগত বোমের। প্রতিটা রাত বোম কত অপদার্থ তা হাতে-মুখে পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দিত রুচি।

বিয়ের সময় বোম ভাড়ার অটো চালাত, আর ওর বাবার একটা ছোট ধোপার দোকান ছিল। আশেপাশের মধ্যবিত্ত পাড়ার থেকে ওর মা আর সোনাই জামাকাপড় নিয়ে এসে কেচে, ইস্তিরি করে আবার বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে আসত।

বিয়ের পর, সংসারের আয় বাড়াতে রুচি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করল। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হচ্ছিল না। টাকার অভাবে ভাল স্টক আনতে পারত না ও। তাও নিজের কথার জোরে টুকটাক বিক্রিবাটা করত রুচি। কিন্তু তারপরই বছর দু'য়েক আগে হঠাৎ কপাল খুলে যায় ওর।

একজন লটারির টিকিট বিক্রিওলা পাঁচ টাকা দিয়ে একটা পনেরো লাখ

BanglaBook.org

টাকার লটারির টিকিট গছিয়ে দিয়েছিল বোমকে। বোম কিনতে চায়নি। কিন্তু নাছোড়বান্দা সেই টিকিট বিক্রিওলা শেষ পর্যন্ত বোমকে বধ করে।

সে রাতে লটারির টিকিট দেখে ভীষণ রেগে গিয়েছিল রুচি। যা নয় তাই বলে চিৎকার করেছিল ও। বিয়ের পর থেকেই রুচির রূপ দেখে বোমের বাবা-মা একটু সমঝে চলত রুচিকে। তাই বোমের ওপর যখন রুচি চিৎকার করত, বাবা-মা তখন কান বন্ধ করে থাকত। সে-রাতেও বাবা-মা কান বন্ধ করেই ছিল। রুচির অকথ্য চিৎকারের বিরুদ্ধে বোম দু'-একবার দুর্বল প্রতিরোধ করেছিল, কিন্তু রুচিকে চুপ করাতে পারেনি। বরং পরিবর্তে ও নিজেই চুপ করে গিয়েছিল।

কিন্তু বোম অবাক হয়ে দেখেছিল যে, ওদের পাশের দোকান থেকে দু'দিন পর খবরকাগজ আনিয়ে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে টিকিটের নম্বর মেলাতে বসেছিল রুচি। লটারির পনেরো লাখ, অবিশ্বাস্য হলেও, জুটে গিয়েছিল ওদের। বোমের এখনও মনে আছে বাড়ির সবার সামনে রুচি উত্তেজনায় দৌড়ে এসে চুমু খেয়েছিল ওকে।

এর পর যা হবার তাই হয়েছে। রুচি সমস্ত টাকাটা নিজের নামে করে নিয়েছিল। আর সেই টাকায় ও বাড়িয়ে নিয়েছে নিজের ব্যাবসাটাকে। তবে বোমকেও অটো কিনে দিয়েছে, মোবাইল কিনে দিয়েছে আর বস্তি ছেড়ে একটা মোটামুটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে উঠে এসেছে। বোমের বাবা-মাও বুঝেছে পাল্লা কোন দিকে ঝুঁকেছে, ওরাও তাই রুচির দলে এখন। বোম জানে রুচিই সব। শুধু রুচির একটাই আক্ষেপ বাচ্চা হল না ওদের। রুচি তাই যৌনতা করতে গেলেই গালাগালি করে বোমকে। বলে, "কালুর সঙ্গে শুয়ে আরাম আর বাচ্চা, দুটোই নেব আমি।"

কালু ওদের বাড়িতে প্রায়ই আসে। বোমের বাবা-মা ভাবত যে কালু বোমের চেয়ে ছোট হলেও বন্ধু তো, তাই গল্প করতে আসে ওদের বাড়িতে। কিন্তু রুচি ঠিক গন্ধ পেত। ও বলত, "ছেলেটা ভাল, তাগড়া, কিন্তু মনে হয় সোনাইয়ের দিকে ওর নজর রয়েছে।"

বোম মনে মনে বলত, বোধহয় নয়, রয়েছে। কারণ বোম দু'জনকে ঠোঁটে ঠোঁট লাগানো অবস্থায় দেখে ফেলেছিল একদিন। কিন্তু সেটা ও রুচিকে জানায়নি। ও জানত রুচি এটা শুনলেই চূড়ান্ত অশান্তি করবে। কারণ, রুচি তখন নিজের মামাতো ভাই গোরাচাঁদের সঙ্গে সোনাইয়ের

BanglaBook.org

বিয়ের ছক করছে। অবশ্য শুধু এটাই নয় হয়তো আরও একটা কারণ রয়েছে।

সোনাইয়ের বিয়েটা ঠিকও হয়ে গিয়েছিল। রুচি তার প্রস্তুতিও শুরু করেছে। বাবা-মা-ও যোগ্য সঙ্গত করছে তার সঙ্গে। কারণ বাবার ধোপার ব্যাবসাটা এখনও থাকলেও তা থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মুশকিল। তাই বাবা জানে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে রুচিই ভরসা।

আজ সকালেও বাড়ি থেকে বেরোবার সময় রুচি তার শ্বশুর-শাশুড়িকে বিয়ের গয়না নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিল আর বোম অবাক হয়ে দেখেছিল যে, বাবা-মা-ও প্রায় ফুল-বেলপাতা হাতে নিয়ে ঠাকুরের নাম গান শোনার মতো করে রুচির কথা শুনছে। মনে মনে খুব হাসি পাচ্ছিল বোমের। ভাবছিল, নাও, যা খুশি চিন্তা করো, যেমন খুশি গয়নার ডিজাইন বানাও, সব আজ শেষ করে দেব। গোরাচাঁদকে চাঁদে পাঠাবার বন্দোবস্ত করব।

এই যে বোম রাজি হল সোনাইকে পালিয়ে বিয়ে করতে সাহায্য করায়, সেটা কি শুধু বোনের প্রতি ভালবাসার জন্য? না কি এর পেছনেও কারণ আছে? আচ্ছা, ও কি কোনওভাবে এর মধ্যে দিয়ে রুচিকে আঘাত করতে চায়? ও কি বোঝাতে চায় যে, রুচি যতই ভাবুক সব ওর কন্ট্রোলে, আসলে তা নয়? নিজের ভাইয়ের সঙ্গে সোনাইয়ের বিয়ে দেবার ছকটা ভেঙে দিয়ে রুচিকে জীবনে অন্তত একবার পালটা মার দিতে চেয়েই কি ও রাজি হয়েছে সোনাইয়ের প্রস্তাবে?

"এই দেখেছ এক টাকা? তোমার এমন আছে?" প্রশ্নটা শুনে থতমত মুখ করে তাকাল বোম। দেখল নেড়ু পাগলা ওর সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। গায়ে ময়লা একটা চাদর, তাও তাতে প্রচুর ফুটো। শরীরেও খুব ময়লা লোকটার। খারাপ লাগল বোমের। মানুষের পরিণতি যে কী, কে বলতে পারে! ও বলল, "তুমি চা খেয়েছ? খাবে?"

নেড়ু মাথা নাড়ল, "কলকাতায় সব যন্ত্র হয়ে গেছে, তাই চা খেতে এখন ভাল লাগছে না।"

বোম হাসল।

নেড়ু আবার বলল, "আমায় একটা লাল-কালো জুতো কিনে দেবে? নরম বিড়ালের মতো জুতো?"

বোম বলল, "দেব একদিন।"

BanglaBook.org

"একদিন নয়, গতকাল দিতে হবে, কেমন?"

বোম মাথা নাড়ল।

নেড়ু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আকাশে কী বড় গর্ত, না? যাই অনেক কাজ আছে। বাই বাই।"

নেড়ু যেতেই বোম দেখল কালু আসছে। ও জানে এতক্ষণ কালু ওর গাড়ির চাবি দিতে গিয়েছিল মালিকের বাড়ি। ভদ্রলোক কাছেই থাকেন। আজ আর কালু গাড়ি চালাবে না।

কালু আসার আগে বোম নিজেই এগিয়ে গেল ওর দিকে আর ঠিক তখনই পকেটের মোবাইলটা বেজে উঠল আবার। কে রে বাবা? পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখল, রুচি। না, ফোনটা আর ধরল না বোম, কেটে দিল। তারপর কালুকে বলল, "যা বাড়ি থেকে রেডি হয়ে আয়। আমরা ঠিক পৌঁছে যাব।"

কালু বলল, "ঠিক সময়ে আসবে তো?"

বোম হাসল, "বলছি তো পৌঁছে যাব, এখন যা। ঝুটমুট টেনশন নিস না।"

কালুও হাসল এবার। কৃতজ্ঞ ভাবে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে রইল বোমের দিকে তারপর হাঁটা দিল।

আবার বাজল ফোনটা। ওফ্। মাঝে মাঝে বোমের মনে হয় এটাকে ছুড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়। ও ফোনটা বের করে কানে লাগিয়ে বাড়ির দিকে যাবে বলে পেছনে ঘুরল আর সঙ্গে সঙ্গে ধড়াম করে ধাক্কা খেল। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বোম। ভাগ্যিস ফোনটা হাত থেকে পড়ে যায়নি। ও দেখল ভীষণ সুন্দর একটা মেয়ে ঝুঁকে পড়ে তার মোবাইলটা তুলছে মাটি থেকে। ইস, ফোনটা ধরার খেয়ালে একদম লক্ষ করেনি বোম, ধাক্কা মেরে দিয়েছে।

মেয়েটা মাটি থেকে মোবাইলটা তুলে নিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল বোমের দিকে, তারপর হিসহিসে গলায় বলল, "স্কাউন্ড্রেল, দেখতে পারো না?"

বোম থতমত খেয়ে বলল, "ভুল হয়ে গেছে।"

মেয়েটা হাতে ধরা মোবাইলটা দেখল একবার তারপর বলল, "ব্লাডি ইডিয়ট। জুতো দিয়ে পেটাতে হয় এইসব লোকগুলোকে।"

BanglaBook.org

তারপর খটখট করে কালীঘাট মেট্রোর সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

বোকার মতো তাকিয়ে রইল বোম। শুরুতেই বাধা পেল? কী জানি সব সুষ্ঠুভাবে হবে তো? বোম দেখল, মেট্রোর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার আগে সুন্দরী মেয়েটা আর একবার ওর দিকে তাকাল। চোখে এখনও আগুন জ্বলছে।

মেহের ২৪ ডিসেম্বর, সকাল এগারোটা দশ

মুখটা ঘুরিয়ে নিল মেহের। ননসেন্স। মোবাইল ফোন কানে লাগিয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরছে। যেন মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একা! আরে বাবা আশেপাশের লোকজন তো দেখবি! তা না, অন্ধের মতো কানে ফোন লাগিয়ে ঘুরছে! চেহারাটাও যেমন শ্যাবি, আচার-আচরণও তেমন। এসব লোকের হাতে মোবাইল ফোন কে দেয়? ঠিক যেন বাঁদরের হাতে বন্দুক।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হাতের মোবাইলটা দেখল মেহের। স্ক্রিনটা একদম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে আছে। কোনও ডিসপ্লে নেই। মোবাইলের মাথার অন-অফ সুইচটা কয়েক বার টিপল মেহের। নাঃ, এখনও কিছু হচ্ছে না। ওই উজবুকটা ধাক্কা মেরে মোবাইলটা ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। কী হল মোবাইলটার? মাসখানেক হল ক্যামেরা লাগানো এই মোবাইলটা কিনেছে ও। বহুদিন ধরে এর জন্য টাকা জমিয়েছে। খুব শখের জিনিস। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল ফোন নম্বর। এই মোবাইলটায় ওর সমস্ত দরকারি ফোন নম্বর সেভ করা রয়েছে। ফোনটা যদি বিগড়োয় তা হলে তো সব নম্বর লোপাট হয়ে যাবে।

মেহের দাঁতে দাঁত পিষল। মনে মনে রাস্তার ওই লোকটাকে গালাগালি দিল আবার। নেহাত ওর তাড়া আছে, না হলে আজ মোবাইলে কথা বলা জন্মের মতো ঘুচিয়ে দিত লোকটার।

মেহের মোবাইলটা জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে ঘড়ি দেখল একবার। এগারোটা চোদ্দোর মেট্রোটা পাবে কি? নানু তো বলেছে সাড়ে এগারোটা নাগাদ নন্দনের সামনে অপেক্ষা করবে। এই মেট্রোটা না পেলে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি টিকিট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল মেহের। যাঃ বাবা, এ কী রে! মেহের দেখল কাউন্টারগুলোর সামনে ইয়াব্বড় চারটে লাইন। মনে হচ্ছে, কলকাতার সমস্ত মানুষ বোধহয় এখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই লাইনে দাঁড়ালে তো এগারোটা চোদ্দো কী, তার পরের দুটো ট্রেনও মিস হয়ে যাবে ওর। নানুর সঙ্গে দেখাটাই হবে না। ঠোঁট কামড়াল মেহের। এখন কী করবে ও?

দীর্ঘ মালগাড়ির মতো লাইনটার দিকে আবার তাকাল মেহের। আজ এত ভিড় কেন মেট্রোয়? কাল অবশ্য পঁচিশে ডিসেম্বর। কলকাতার বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ এ-সময় কলকাতায় ঘুরতে আসে। আর মেট্রো রেল এখনও কলকাতার একটা দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু সেই দর্শনের ঠেলায় তো কাজের মানুষদের প্রাণ যায়।

মেহের দেখল লাইনের সামনের দিকে দাঁড়ানো একটা ছেলে বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছে। এটা অবশ্য মেহেরের কাছে নতুন কিছু নয়। ও জানে যে, ও সুন্দরী। ছোট থেকেই নানা মানুষের মুগ্ধ দৃষ্টি ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে। অবশ্য শুধু মুগ্ধ দৃষ্টি নয়, কেউ কেউ তো ওর সৌন্দর্য ধরে দেখার ব্যাপারেও উৎসাহ দেখিয়েছে। অবশ্য সমস্ত মেয়ের মতো এ ব্যাপারে আত্মরক্ষার কৌশলটা মেহেরেরও জানা আছে। জানতেই হয়েছে, কারণ ছোট থেকেই ছেলেদের ব্যাপারে ওর অভিজ্ঞতা খারাপ।

ওর যখন বছর বারো বয়স তখন ওরা চেতলার কাছে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকত। সুন্দর, ছিমছাম বাড়ি ছিল সেটা। কম্পাউন্ডের ভেতরে বেশ অনেকখানি জায়গা ছিল। সেখানে ওদের বাড়িওলার মেয়ে ইরাদির সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলত মেহের। ইরাদির বাবা সিমেন্টের চাতালে স্থায়ী ব্যাডমিন্টন কোর্ট কেটে দিয়েছিল ওদের জন্য। শীত-গ্রীষ্ম নিয়ে ওদের বাছবিচার ছিল না। সুযোগ পেলেই র‍্যাকেট আর শাটল কক্ নিয়ে নেমে পড়ত ওরা।

এভাবে ভালই চলছিল দিন, কিন্তু তারপরই মেহেরের জীবন টলে গেল একটু। ইরাদিদের বাড়িতে থাকতে এল ইরাদির জ্যাঠতুতো দাদা মোহন।

মোহনের দৃষ্টিটা প্রথম থেকেই অন্য রকম মনে হত মেহেরের। মনে হত সেই দৃষ্টি, মুগ্ধতা ছাড়াও আরও অন্য কিছু সংকেতও বহন করে আনছে। সে-সময় ওসব বেশ ভালই লাগত মেহেরের। স্কুলের বান্ধবীদের মাধ্যমে ততদিনে অনেক কিছুই জানা হয়ে গিয়েছিল ওর। পুরুষের দৃষ্টির বিভিন্ন রকম

BanglaBook.org

মানে তখন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছিল ওর সামনে। মোহনের মুগ্ধ দৃষ্টি নিজের কাছেই ওর গুরুত্ব বাড়াত।

মোহন তখন সদ্য ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কিন্তু মেহের দেখত প্রায়ই বিকেলের আগে বাড়িতে ফিরে আসত ছেলেটা। কী ক্লাস করে ও? স্যারদের কাছে টিউশন নেয় না? ভাবত মেহের। ও দেখত যে, ইরাদি আর ওর ব্যাডমিন্টন খেলার সময় একটু দূরে ছোট সিমেন্টের বাঁধানো জায়গায় বসে ওদের খেলা দেখছে মোহন। বা আরও স্পষ্ট করে বললে, ওকে দেখছে মোহন। ভাললাগায় শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত মেহেরের।

কিন্তু পৃথিবীর আদি নিয়ম অনুযায়ী দৃষ্টি একসময় দৃশ্য ছাড়াও আরও বেশি কিছু চায়। এক ছুটির দিনের দুপুরে ওই বড় বাড়ির পেছনের সরু গলিটায় মোহনের মুখোমুখি হয়েছিল মেহের। মোহন একটা লজেন্স বের করে এগিয়ে দিয়েছিল ওর দিকে। মেহের হাত বাড়িয়ে তা নিতে গেলে মোহন দেয়নি। বলেছিল, "হাঁ করো।" কিছু না বুঝে হাঁ করেছিল মেহের। মোহন হাত বাড়িয়ে লজেন্সটা ঠেকিয়েছিল মেহেরের ঠোঁটে, তারপর আলতো করে ওর আঙুল মেহেরের ঠোঁট থেকে মুখে বুলিয়েছিল খানিকক্ষণ।

শরীরে কী যে হচ্ছিল মেহেরের তা নিজেই ঠিক বুঝতে পারছিল না। সেই নিস্তব্ধ দুপুর, নির্জন গলি, ঠোঁটে ঘুরতে থাকা আঙুল, তলপেটে যেন একটা ছোট্ট মাছ ঢুকে গিয়েছিল ওর। ওর কান গরম হয়ে উঠেছিল, চোখের পাতা ভারী হয়ে নেমে আসছিল। অস্ফুটে ও বলেছিল, "এমন কোরো না মোহনদা।" মোহন আর কিছু করেনি। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে লজেন্সটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওর মুখে।

এই কথাটা কাউকে বলেনি মেহের। ও বুঝেছিল এটা এমন ব্যাপার যে, কাউকে কিছু বলা যাবে না। তবে ভেতরে ভেতরে অনেক কিছুই পালটে গিয়েছিল মেহেরের। ও বুঝেছিল একটা ছোট্ট লজেন্স খাওয়ানো জীবনের অজানা কিছু দরজা খুলে দিতে পারে।

এর পর থেকে প্রায়ই, নানান অছিলায়, মোহন ছুঁতে চাইত মেহেরকে। শাটল কক্ বোগেনভেলিয়ার ঝোপে আটকে গেলে মোহন নিজে না পেড়ে দিয়ে, কোমর ধরে তুলে ধরত ওকে। ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট নেওয়ার নাম করে চেপে ধরত ওর হাত। কথা বলার সময়, মশা তাড়াবার অছিলায় ছুঁয়ে দিত ওর থাই। আর প্রতিবার ছোট্ট একটা মাছ খলবল করত মেহেরের তলপেটে।

BanglaBook.org

এমন করতে করতেই একদিন সর্বনাশ ঘটল। সেদিন ইরাদির বাবা-মা কেউ বাড়িতে ছিল না। শীতের দুপুর বলে ইরাদিও ঘুমিয়ে পড়েছিল লেপের ওমে। নীচে, নিজের ঘরে বসে অঙ্ক করছিল মেহের। এমন সময় জানলার কাছে একটা গলা পেয়েছিল ও। গলাটা ওর চেনা। মেহের জানলার পরদা সরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কী মোহনদা, ডাকছ কেন?"

মোহন চাপা, সতর্ক গলায় বলেছিল, "ওপরে আয় তো একবার, ইরা ডাকছে।"

"ইরাদি? এখন? আমায় যে বলল দুপুরে ঘুমোবে!"

"ঘুমোয়নি। আয় তাড়াতাড়ি, তোকে ডাকছে।" মোহন সরে গিয়েছিল জানলার থেকে।

ঘরের বাইরে এসে মেহের দেখেছিল মোহন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে দেখেই বলেছিল, "চল তাড়াতাড়ি। ও তিনতলায় আছে।"

"তিনতলায়!" আশ্চর্য হয়েছিল মেহের। তিনতলায় তো মোহন থাকে। সেখানে ইরাদি কী করছে?

"হ্যাঁ, আমার ঘরে। চল।"

নিস্তব্ধ দোতলা পার করে তিনতলায় উঠে গিয়েছিল মেহের। ওর পেছনেই ছিল মোহন। ওই ঘরটায় বিশেষ যেত না মেহের। দরকার পড়ত না আর কী।

ঘরে ঢুকে একটু অবাকই হয়েছিল মেহের। ইরাদি কই? ঘরে তো কেউ নেই! শুধু টেবিলের ওপর স্তূপ করা কিছু বই আর খাটের পাশে হেলান দিয়ে রাখা একটা গিটার। মেহের জিজ্ঞেস করেছিল, "ইরাদি কই?"

মোহন কিছু না বলে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে।

"ইরাদি কই?" মেহের জিজ্ঞেস করেছিল আবার।

'তুমি' ডাকের সঙ্গে মোহন খুব আস্তে বলেছিল, "মেহের, আমি তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছি। আই লাভ ইউ। তোমায় না পেলে আমি বাঁচব না।"

মোহনের চোখের দৃষ্টি পাগলাটে হচ্ছিল ক্রমশ। ভয় পেয়ে মেহের বলেছিল, "কী বলছ মোহনদা?" মোহন আর কিছু না বলেই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কোমর আঁকড়ে ধরে নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরেছিল মেহেরের ঠোঁটে। কিছুক্ষণের জন্য সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল মেহেরের। ও বুঝতে পারছিল মোহন একটু আগে সিগারেট খেয়েছে। তামাকের তেতো গন্ধ শ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকছিল ওর। মোহন যেন ওর ঠোঁট দুটি ছিঁড়ে আনতে

BanglaBook.org

চাইছিল মুখের থেকে। নিজের জিভটা ঠেলে ঢোকাতে চাইল ওর মুখে।

হিন্দি ছবিতে চুম্বন দৃশ্য দেখে ক্লাসের বান্ধবীদের সঙ্গে আলোচনা করতে যে-মজাটা লাগত, বাস্তবে চুম্বনের সময় সেই মজাটা পাচ্ছিল না মেহের। বরং ভয় লাগছিল, গা ঘিনঘিন করছিল। ও বুঝতে পারছিল মোহন ওকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে বিছানার দিকে। নবলব্ধ জ্ঞান ভেতরে ভেতরে সাবধান করছিল মেহেরকে। ওকে বলছিল এখান থেকে যে-করেই হোক ওকে চলে যেতে হবে, না হলে সমূহ বিপদ। তাই শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলা মেরে ও সরিয়ে দিয়েছিল মোহনের শরীরটাকে। মোহন হাঁপাচ্ছিল তখন। পাগলাটে চোখের দৃষ্টি নিয়ে এক হাতে চেপে ধরেছিল মেহেরের হাত। তারপর নিজের পাজামার দড়ি একটানে খুলে বের করে এনেছিল নিজের উদ্ধত পৌরুষ। কাঁপা গলায় বলেছিল, "এটা একবার ধরো।" আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল মেহের। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য গিটারটা আনতে হাত বাড়িয়েছিল ও। কিন্তু হাতের ধাক্কায় বিকট শব্দ করে গিটারটা আছড়ে পড়েছিল মাটিতে। মোহন তখনও বলে চলেছিল, "একবার ধরো, ধরে দেখো, মেহের আমি পারছি না আর। তোমার ঠোঁট দুটো, থুতনিটা, তোমার ওই থাই... আমি... আমায়..."

আর অপেক্ষা করেনি মেহের। হাঁটু মুড়ে সটান গুঁতো দিয়েছিল মোহনের তলপেটে। মুখ দিয়ে একটা ভোঁতা শব্দ করে কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল মোহন। সেই সুযোগে দরজার দিকে দৌড়েছিল মেহের। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে গোড়ালির কাছে জড়ো হওয়া পাজামা নিয়ে ওর পেছনে তাড়া করেছিল মোহন। ভেজিয়ে রাখা দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই ধাক্কা খেয়েছিল মেহের। বিভ্রান্ত চোখে ও দেখেছিল ওর সামনে ইরাদি দাঁড়িয়ে। মেহের দেখেছিল ইরাদি বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে নগ্ন মোহনের দিকে।

নীচে নিয়ে গিয়ে ইরাদি কাঁদতে থাকা মেহেরকে অনেক করে বুঝিয়েছিল যে, ও যাতে এই নিয়ে কাউকে কিছু না বলে। ইরাদি বলেছিল মোহনের ব্যবস্থা ও করবে, কিন্তু এই বিচ্ছিরি ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলে মারাত্মক কেলেঙ্কারি হবে। ইরাদির বোঝানোয় মেহের আর কিছু বলেনি। যদিও ভয় হয়েছিল খুব, কষ্টও হয়েছিল, তবু অবস্থার গুরুত্ব বুঝে আর ইরাদির ওপর নির্ভর করে ও কাউকে কিচ্ছু বলেনি। তবে স্বস্তির ঘটনা এই যে, ও দেখেছিল এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই মোহন চলে গিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে। ইরাদি

BanglaBook.org

কী করেছিল, কী বলেছিল, সেসব কিচ্ছু জানতে চায়নি ও। শুধু মোহন চলে যাবার পর রাতগুলোয় ও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারত। তবে সেই ঘটনার পর থেকে মেহের বুঝেছিল যে, ছেলেদের আই লাভ ইউ-এর উৎস তাদের তলপেট।

সেই ঘটনার পর ওখানে আরও বছর দু'য়েক ছিল ওরা। চেতলার বাড়িটা ছেড়ে দেবার পর ইরাদিদের সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই ওদের। সেসব ঘটনার এখন প্রায় দশ বছর হয়ে গেছে। কে জানে ইরাদির বিয়ে হয়ে গেছে কি না!

মেহের দেখল ছেলেটা প্রায় কাউন্টারের কাছে চলে গেছে। আর মিনিট দু'য়েক আছে ট্রেনের। আর দেরি না করে ও কর্তব্য স্থির করে নিল মুহূর্তের মধ্যে। মেহের হাসি হাসি মুখে এগিয়ে গেল ছেলেটার দিকে। বলল, "আই অ্যাম ইন আ জ্যাম। ক্যান ইউ হেলপ মি আউট?" ছেলেটা থতমত খেয়ে গেল। এটা এক্সপেক্ট করেনি বোঝাই যাচ্ছে। ছেলেটা তুতলে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব-বলুন না।"

"একটা রবীন্দ্রসদনের টিকিট কেটে দেবেন? এই ট্রেনটা ধরা ভীষণ জরুরি।" ছেলেটা পেছনের দিকে তাকাল। লম্বা লাইনের থেকে অনেকেই ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। একজন তো বলল, "এ কী হচ্ছে? লাইনে দাঁড়ান।"

মেহের পাত্তা না দিয়ে ছেলেটাকে বলল, "প্লিজ, খুব হেলপ হয়।" ছেলেটা এবার কাউন্টারের সামনে চলে এসেছে। ছেলেটাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মেহের জোর করে চার টাকা গুঁজে দিল ছেলেটার হাতে। লাইনের থেকে হল্লা উঠল আবার। কিন্তু ছেলেটা সেসব শুনল না। ও টিকিটটা কেটে দিল মেহেরকে।

মেহের টিকিট নিয়ে গেটের দিকে দৌড়োতে দৌড়োতে শুনল পেছন থেকে আওয়াজ আসছে নানা রকম। মেহের জানে এটা যতটা না ওকে লক্ষ্য করে, তার চেয়ে বেশি ওই ছেলেটাকে লক্ষ্য করে। ওই যারা আওয়াজ তুলেছে, মেহের বুঝল, তাদের তলপেটের মনটা খুব খারাপ হয়েছে।

প্ল্যাটফর্মে পা দেওয়ামাত্র একরাশ হাওয়া উড়িয়ে ট্রেনটা ঢুকল। কালীঘাট স্টেশনে মেট্রোর সামনের দিকে উঠলে রবীন্দ্র সদনে নেমে নন্দনে যেতে

BanglaBook.org

সুবিধে হয়। ট্রেনে বেশ ভিড়। তাও কোনওমতে লেডিজ সিটের সামনে হাতল ধরে দাঁড়াল মেহের। দিনকে দিন মেট্রোয় ভিড় বাড়ছে। এবার ট্রেনে বগির সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাও, ভিড় হলেও, মেট্রো হল স্বর্গ। কলকাতায় স্বর্গ, মাটির তলায়।

নানুর সঙ্গে দেখা করে ওর এক্সাইড মোড়ের বড় রেস্টুরেন্টটায় যাওয়ার কথা। ওখানে অ্যাডগ্ল্যামের শতানিক বাসু আসবে। ওর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে মেহেরের। ওরা একটা সফট ড্রিঙ্কসের বিজ্ঞাপন করছে। শতানিক বলেছে, মেহেরকে ওর এই অ্যাসাইনমেন্টে মডেল হিসেবে প্রজেক্ট করার ইচ্ছে। যদিও বলিউডের একজন নামকরা অ্যাকট্রেস থাকবে, তবু শতানিক বলেছে যে, মেহেরকে এই অ্যাডটায় ও বিশেষভাবে প্রেজেন্ট করবে ভাবছে। অ্যাডের গোটা শুটিংটাই নাকি ক্যারাবিয়ান আইল্যান্ডসে হবে।

বাড়ির থেকে ওর মডেলিং বা অ্যাক্টিংয়ের ব্যাপারে বরাবর বাধা দেওয়া হয়েছে। ওর বাবার ইচ্ছে ছিল মেহের এম বি এ করে চাকরি করুক। মা-ও তাই চায়। কিন্তু মেহের মনে করে ওকে যেমন দেখতে বা ওর যা ফিগার, তাতে সামান্য চাকরি করার জন্য জন্মায়নি ও। কিন্তু এটা তো বাবা-মা বোঝে না। ওদের সেই টিপিক্যাল মধ্যবিত্তপনা। এটা ঠিক যে, এ-লাইনটা অনেকটা জুয়ার মতো। লাগলে ছক্কা না হলে অক্কা। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে মানুষের গোটা একজিসটেন্স তো তাই— আ বিগ গ্যাম্বেল।

তবে একটা ব্যাপার, গত সাত-আট মাস চেষ্টা করে এখনও কিন্তু কোনও ওপেনিং করতে পারেনি মেহের। তবে অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রচুর। কেউ আউট রাইট না বলে দিয়েছে। কেউ কাজ দেবে বলে ঘুরিয়েছে আবার কেউ আকার-ইঙ্গিতে শোওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে যেটা ঘটনা, সেটা হল, এখনও পর্যন্ত কিছুই হয়নি। বাবা মাঝে মাঝেই বলে যে, এবার যেন বাবার কথা শোনে মেহের। যেন প্রস্তুতি নিয়ে 'ক্যাট' বা 'ম্যাট' দেয়। বাবার মতে পড়াশুনো করে যা পাওয়া যায়, তা সারা জীবনের জন্য। এইসব অ্যাক্টিং মডেলিং হল ক্ষণস্থায়ী, হাউইয়ের মতো। কিন্তু মেহের ভাবে, হাউই হলেও, তা উজ্জ্বল। একটা মানুষের জীবনে উজ্জ্বল মুহূর্ত ক'টা থাকে? কীসের জন্য বাঁচে মানুষ? হাউই হলেও অন্ধকার আকাশে ও যে একবার উজ্জ্বলতা ছড়াতে পেরেছিল সেটাও তো কম অ্যাচিভমেন্ট নয়।

রবীন্দ্রসদনে পৌঁছে ঘড়ি দেখল মেহের। এগারোটা বাইশ। ও হাঁপ ছাড়ল,

BanglaBook.org

নাঃ, এবার আর চিন্তা নেই, ঠিক পৌঁছে যাবে। ওর মনে আছে, নানু বলেছিল যে ও সময়ের ব্যাপারে খুব পাকা। মেহের দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

নানুর সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে সপ্তাহ দু'য়েক হল। ও একজন প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, সেখানে নানুও এসেছিল। এই প্রযোজকটি একদম সাফ না বলে দিয়েছিল মেহেরকে। লোকটার রাফ ব্যবহারের ফলে মেহেরের মাথাটা বেশ গরম ছিল। ও যখন বেরোচ্ছিল অফিস থেকে তখন নানুই ওকে ডাকে। প্রথমে পাত্তা না দিলেও নানু বলে যে, ও নাকি মেহেরকে একটা সিরিয়ালে চান্স করিয়ে দিতে পারে, মানে মেহের যদি আগ্রহী হয় আর কী। মেহের আগ্রহী ছিল। ও ভেবেছিল যে, অন্তত একটা সূচনা তো হবে। ও নানুর ফোন নম্বর টুকে এনেছিল। নানু বলেছিল যোগাযোগ রাখতে।

তা যোগাযোগ রেখেওছে মেহের। যদিও ওর মন বলছিল যে, একটা উটকো লোকের ওপর এভাবে ভরসা করা ঠিক হচ্ছে না, তবু মেহের ভেবেছিল কিছু হলেও তো হতে পারে। তবে একটা ব্যাপার, মেহের একটা জিনিস মাথায় রেখেছিল, এই লোকটার সঙ্গে কোনও আইসোলেটেড জায়গায় ও দেখা করবে না। কারণ বদলোকের তো অভাব নেই। কিন্তু নানু যখন নন্দনে দেখা করতে বলেছিল, তখন হাঁফ ছেড়েছিল মেহের। নানু বলেছিল, "সাড়ে দশটা মানে কিন্তু সাড়ে দশটাই, আয়াম ভেরি পাঙ্কচুআল।"

ঠিক এগারোটা বত্রিশে নন্দনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেহের, দেখল একটা কালো গগলস চোখে অন্য দিকে তাকিয়ে জলের ধারে লাগানো রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নানু। ও আলতো করে ডাকল, "নানুবাবু, আমি এসেছি।"

"নানুবাবু?" মেহেরের ডাকে নানু ভুরু কুঁচকে তাকাল, "কল মি ওনলি নানু। নানুবাবু বললে নানুবাবুর বাজার মনে হয়।"

মেহের বলল, "ও কে। তা, এনি নিউজ?"

নানু শ্রাগ করল, "দেয়ার ইজ অলওয়েজ সাম নিউজ। বাট, আই থিঙ্ক ইট ইজ নট দ্যাট গুড।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেহের। এখানেও ভুল না! তা সেটা ফোনেও তো

BanglaBook.org

জানাতে পারত লোকটা। ফালতু এখানে এল! ও বলল, "আপনি ফোনেও তো বলতে পারতেন, আমি আসতাম না। শুধু শুধু..."

মেহেরকে শেষ করতে দিল না নানু। চোখের গগলস খুলে সোয়েটারের গলার কাছে গুঁজে বলল, "কীভাবে বলব? তখনও তো জানতাম কাজটা হচ্ছে। শেষ মুহূর্তে সব গুবলেট হয়ে গেল। পুরো প্রজেক্টটাই ডাম্পড হয়ে গেল। তবে এখনও চান্স আছে। মানে তুমি যদি চাও।"

'তুমি যদি চাও'— মানে? ভুরু কুঁচকে গেল মেহেরের। কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে লোকটা? ও সামান্য কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী বলতে চাইছেন আপনি?"

নানু হাসল, "তুমি মডেলিংয়ে ইনটারেস্টেড?"

এক মুহূর্ত সময় নিল না মেহের। ও বলল, "নিশ্চয়ই।"

নানু হাসল, "আমার বন্ধু ফ্যাশন ফোটোগ্রাফার। আমি বললেই তোমার হয়ে যাবে। হানড্রেড পারসেন্ট।"

মেহের বলল, "তা হলে?"

"কী তা হলে? হয়ে যাবে। ডোন্ট ওরি। জাস্ট কল মি অন থার্টিয়েথ। তিরিশে ডিসেম্বর তুমি আমায় ফোন কোরো, তোমায় আমি ঠিক একটা সুখবর দেব। পাক্কা।"

মেহের হাসল। লোকটাকে দেখে তো মনে হচ্ছে যে, সত্যি কথাই বলছে। দেখা যাক আদৌ কিছু করতে পারে কি না।

ও বলল, "ঠিক আছে তিরিশ তারিখ না হয় ফোন করব আবার।"

নানু এবার এগিয়ে এল কাছে। চুলের মধ্যে আঙুল চালাল একবার। তারপর বলল, "হ্যাভ ফেথ। আর্চি আমার দারুণ বন্ধু। আমি ওকে যা বলি ও তাই করে। আমি যদি জানতাম যে, তুমি মডেলিংয়েও ইন্টারেস্টেড তা হলে প্রথমেই তোমাকে বলতাম।"

মেহের ঘড়ি দেখল, বারোটা পঞ্চাশ। এখান থেকে এক্সাইড় মোড়ের ওই রেস্টুরেন্টে যেতে মিনিট পাঁচেক লাগবে ওর। অর্থাৎ আর সময় নেই। এখন যেতে হবে। ও বলল, "তা হলে তিরিশ তারিখ আপনাকে ফোন করছি। বাই দ্য ওয়ে আপনার ফোন নম্বরটা আর একবার দেবেন?"

"ফোন নম্বর? তোমার কাছে আছে তো, নেই?"

মেহের বলল, "আর বলবেন না, হারিয়ে ফেলেছি। মানে মোবাইলে সেভ

BanglaBook.org

করা ছিল। মোবাইলটা গন্ডগোল করছে, মানে বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। আবার পেতে পারি নম্বরটা?"

"অফকোর্স।" নানু পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে খসখস করে লিখে দিল নম্বরটা। তারপর বলল, "এই নাও। মনে থাকে যেন, তিরিশ তারিখ। কেমন? কনসিডার ইয়োর জব ডান।"

মেহের হাসল, বলল, "আজ আসি তা হলে?"

নানুর মুখটা একটু ম্রিয়মাণ দেখাল যেন। ও বলল, "চলে যাবে? যা ওয়েদার, একটু কফি খেলে হত না?"

"সাম আদার ডে, আজ যাই, অনেক কাজ আছে। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।" নানুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাঁটা দিল মেহের।

শীতের রোদ আজ বড় দুর্বল। তার ওপর হাওয়া দিচ্ছে। মেহের একবার আকাশের দিকে তাকাল। না, আকাশ দেখা যাচ্ছে না। ওর মাথার ওপর এখন ফ্লাইওভার। সারা কলকাতার শরীরে ক্রমশ ব্যান্ডেজের মতো জড়িয়ে যাচ্ছে ফ্লাইওভারগুলো। কে জানে এতে শহরের শুশ্রূষা হচ্ছে কি না। ঢাকছে কি না শহরের ক্ষতগুলো। মেহের জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটল একবার। ইস, চড়চড় করছে। টানছে খুব। মেহের ব্যাগের থেকে একটা ছোট্ট ক্রিমের টিউব বের করে ঠোঁটে ঘষে নিল। এটা ওকে সবসময় রাখতে হয় সঙ্গে। ওর ঠোঁট খুব টানে। ও আবার ফোনটা বের করল। আবার একবার ফোনের মাথার অন-অফ সুইচটা টিপল ও। নাঃ, সেই শূন্য স্ক্রিন। আবার সেই লোকটার প্রতি রাগটা ফিরে এল। অন্ধ সব। গোটা শহরটা অন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কারও দিকে তাকায় না, কেউ কারও কথা চিন্তা করে না। সবার মধ্যে বিছানায় উঠে মশারি গুঁজে ভাল থাকবার মতো মিডল ক্লাসনেস।

সামনের রাস্তা পার হওয়ার সিগনালটা বন্ধ। ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল মেহের। হাওয়ার বেগটা বাড়ল বোধহয় একটু। ঠান্ডা লাগছে ওর। জ্যাকেটের চেনটাকে আরও খানিকটা টেনে নিল। এখানের কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে হবে। মা তো আজ বেরোতেই না করেছিল ওকে। কিন্তু কী করবে? কাজ আছে যে। অবশ্য মা কেন ওকে বেরোতে বারণ করেছিল সেটা ও জানে। আজ কলকাতায় মহামিছিল আছে। বিকেল তিনটে না ক'টায় জানি। তার আগে তাই বাড়ি ঢুকতে হবে ওকে। কী বিরক্তি। তোরা সারাবছর ধরে এইসব মিটিং মিছিল কর। কাউকে কাজকম্ম করতে হবে না।

BanglaBook.org

সিগনালটা সবুজ হল এবার। যাক বাবা, সিগনালগুলো রং পালটাতে এত দেরি করে যে, আর পারা যায় না। রাস্তাটা পার হল মেহের। সামনেই বড় রেস্টুরেন্ট। এখানেই ওর সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল শতানিক বাসু। লোকটার সঙ্গে কথা বলে ভাল লেগেছে ওর। শতানিক বলেছে ও নতুন হলেও ওকে বলিউডের নামকরা নায়িকার সমান ইম্পর্টেন্স দেবে। সেটা যদি সত্যি হয় তা হলে তো দারুণ ব্যাপার হবে।

রেস্টুরেন্টের সামনে গিয়ে এক মুহূর্ত থমকাল মেহের। মনে মনে বলল, হে ভগবান এইবার একটু দেখো আমায়। কাজটা যেন হয়।

"এক্সকিউজ মি" গলাটা শুনে পাশে তাকাল মেহের। একটা ফরসা, বেঁটে ছেলে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে, পিঠে একটা গোল লম্বা কেস। ছেলেটার মুখচোখ লাল। কপালে সামান্য ঘাম। বিড়ালের মতো চোখ দুটো যেন হাঁপাচ্ছে। এ কে? অসুস্থ নাকি? সাহায্য চায়? আজকাল এই টাইপের ভদ্রবেশী ভিখিরি ভীষণ বেড়ে গেছে শহরটায়। সবাই সফিসটিকেটেড ওয়েতে ভিক্ষে চায়। মেহের এসব পছন্দ করে না একদম। তার ওপর একটা দরকারি কাজে যাচ্ছে ও। খুব বিরক্ত হল মেহের। কে জানে শতানিক বাসু কী ভেবে রেখেছে ওর জন্য? বাবার মুখের ওপর জবাব দেবার মতো কিছু করতেই হবে ওকে। এখন এসব ভিখিরি টাইপের লোকদের কথা শুনলে ওর হবে? মেহের হাত নাড়িয়ে বলল, "আগে যাও।" তারপর ওই দিকে আর না তাকিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে গেল রেস্টুরেন্টে।

সাইমন ২৪ ডিসেম্বর, সকাল এগারোটা আটান্ন

"আগে যাও"! মানে? মানে কী এর? আগে যেতে বলল কেন? ও কি ভিখিরি? না কি ট্র্যাফিক সিগনালের কাছে গাড়ির জানলায় ঝুঁকে-পড়া সেই মানুষ যে, মদ গেলার জন্য 'গাড়ি ভাড়া হারিয়ে গেছে' বলে মিথ্যে কথা বলে?

একটা অসহায় রাগ এসে ধাক্কা মারছে সাইমনের মাথায়। মাথা ভেঙে বেরোতে চাইছে রাগটা। ছড়িয়ে পড়তে চাইছে সমস্ত কলকাতায়। লন্ডভন্ড করে দিতে চাইছে গোটা শহরকে।

অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়। সাইমন জানে যে, রাগটা দিনে তিন-চার বার

BanglaBook.org

এসে ধাক্কা মারে ওর মাথায়। হয়তো মাথার ভেতর কোনও দরজা খুঁজতে চায়। কিন্তু কোনও কিছুই সে খুঁজে পায় না। আর না পেয়ে, হতোদ্যম হয়ে রাগটা একসময় নিজের গর্তের ভিতর ঢুকে পড়ে।

সাইমন কাচের দরজা ঠেলে রেস্টুরেন্টে ঢুকে যাওয়া মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুঝল যে, ওর রাগের দম ফুরিয়ে এসেছে। এবার তার গর্তে ফেরার পালা। তবু, মেয়েটা অমন করে বলল কেন ওকে? আচ্ছা, দিনকে দিন কি ওকে ভিখিরির মতো দেখতে হয়ে যাচ্ছে? আজকাল মাঝে মাঝে আয়নায় নিজেকে দেখে ও। ফরসা চেহারায় কেমন যে রংচটা ভাব, চোখের নীচে ছায়া, গালও ভেঙে যাচ্ছে। ওর পরনের সোয়েটারটার গলার কাছটা ছিঁড়ে গেছে একটু। কিন্তু আজ তো দাড়ি কামিয়েছিল ও। বোন বলে, "দাড়ি কামালে তোকে কী বড়লোক বড়লোক লাগে রে দাদা!" সাইমন বোঝে কথাটা হাস্যকর, কিন্তু কেন জানে না, ওটা শুনতে খুব ভাল লাগে ওর। বড়লোক! শব্দটার মধ্যেই কেমন একটা সুন্দর গন্ধ আছে যেন। বিছানার সঙ্গে মিশে থাকা ওর বোন যখন বড়লোক শব্দটা বলে, সাইমন দেখে ওই রুগ্ণ শরীরের ভেতরেও কোথায় যেন আলো জ্বলে ওঠে। বোন চায় সাইমন অনেক টাকা রোজগার করুক। অনেক বড় হোক জীবনে। সাইমন জানে ও-ই হল ওর বোনের জানলা। মাসে একবার করে বাড়ি যায় সাইমন। তখন বোনের সঙ্গে বসে অনেক কথা বলে ও। গোটা মাসটা তো বোন একরকম একাই থাকে। জেঠুদের বাড়ির সবচেয়ে ছোট, অপরিষ্কার আর ড্যাম্প-ধরা ঘরে শুয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে বোন। দুপুর আর রাতের অশ্রদ্ধার ভাত পায় একটু। বোন জানে দাদার বড়লোক হওয়া মানে ওরও হয়তো এই ছোট্ট মশারির মতো ঘর, এই নড়বড়ে চৌকির থেকে মুক্তি। সাইমন প্রতি মাসে গিয়ে ওর সাধ্যমতো টাকা দিয়ে আসে জেঠুকে। ও জানে এক মাস ফেল করলে ওরা বোনটাকে খেতে দেবে না। ওর তো আর বাবা-মা নেই যে, বোনটা সেখানে নিরাপদে থাকবে।

সাইমন মাঝে মাঝে ভাবে ওর কপালের কথা। আর্ট কলেজে থাকতে থাকতে ওর বাবা মারা গেল। মা তো সেই ছোট্ট থেকে নেই। না, মারা যায়নি মা। একজনের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি। মা নাকি ভীষণ সুন্দরী ছিল। সুন্দর গায়ের রং, সবুজ চোখের মণি। যে-লোক দেখত সেই সম্মোহনে পড়ে যেত। লোকে বলে সাইমন নাকি ওর মায়ের মতো দেখতে।

BanglaBook.org

'মা' প্রসঙ্গ এলেই 'নাকি' শব্দটা এসে যায় আপনা-আপনি। কারণ মায়ের মুখ স্পষ্ট মনে পড়ে না সাইমনের। বোন যখন চার মাসের তখন মা চলে গিয়েছিল। সাইমন তখন বছর তিনেকের। মায়ের কথা উঠলেই ওর চোখের সামনে আবছা মতো একটা মুখ ভেসে ওঠে। মনে হয় ঘষা কাচের উলটো পিঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনও মানুষ। কেমন আবছা, দূরবর্তী মুখটা স্পষ্ট দেখতে পায় না। তাই ও আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন। নিজের মুখের মধ্যে খুঁজতে থাকে মাকে। মা, যাকে কিনা ওর মতো দেখতে!

মায়ের কথা এভাবে মনে আসাতে ও নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জনাকীর্ণ ফুটপাথে। মায়ের একটা ছবিও নেই ওর কাছে। মা চলে যাওয়ার পর বাবা সব ছবি ছিঁড়ে ফেলেছিল। একটা ছবিও রাখেনি আর। জেঠিমা বোনের ওপর রাগ হলে চিৎকার করে বলে, "বেশ্যা মাগির মেয়ে। নিজে কার না কার সঙ্গে নেচে বেড়াচ্ছে, আর আমাদের ঘাড়ে মাজা-ভাঙা মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়েছে। এক পয়সার সুরাহা হয় না, উপরন্তু গুচ্ছের চাল ওড়াচ্ছে মাগি। শরীরের নীচের অংশটা ঠিক থাকলেও তো হত, খাটিয়ে খেতে পারতি। তোর মায়ের মতো দেখতেই হয়েছিস, কোমরটা অমন নাড়াতে শিখিসনি।"

মাঝে মাঝে বোনের মুখের দিকে তাকিয়েও মাকে খোঁজে সাইমন।

সাইমন বোঝে জেঠুদের ওই গুদাম ঘরে বোন কী কষ্ট করেই না থাকে। ইস, বোনটাকে যদি এই কলকাতায় নিয়ে আসা যেত! কিন্তু তাও তো সম্ভব নয়। ভবানীপুরের যে-চিলেকোঠায় ও থাকে, তা ওর জেঠুর বাড়ির গুদামের চেয়েও খারাপ। ঘরটার একটা নাম রেখেছে সাইমন। প্ল্যানেটোরিয়াম। চিলেকোঠার ছাদটা টালির। আর যার মধ্যে বেশ কয়েকটা ভাঙা। রাত্রে, খাটে শুয়ে ঘরের চালের দিকে তাকালে টালির ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায় স্পষ্ট। ধোঁয়ায় ঢাকা, অস্বচ্ছ কলকাতার আকাশ। ও দেখে আবছা কিছু তারা ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। যেন শ্মশান যাত্রার পথে ছড়িয়ে রাখা খই। সাইমন ভাবে কার মৃতদেহ গেছে ওই পথ দিয়ে? প্রতি রাত্রে কার মৃতদেহ যায়? ওর বাবার? না কি ওর নিজের? ও, সাইমন রুপেন মণ্ডল, কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। শিল্পী। শিল্পী না ভিখিরি?

মেয়েটা ওভাবে ওকে চলে যেতে বলল কেন? ও তো শুধু সময় জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল। অন্য কোনও উদ্দেশ্য তো ছিল না ওর! কলকাতা কি ক্রমশ নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে? সবার কি এমনই তাড়া যে, অন্যকে দেবার মতো

BanglaBook.org

দু'সেকেন্ড সময়ও তাদের নেই? গালে একবার হাত বোলাল সাইমন। মসৃণভাবে কামানো গাল, নতুন ব্লেডের ধার যেন এখনও বোঝা যাচ্ছে গালে। এ গাল কি বড়লোকের গাল? হাসি পেল ওর। বুঝতে পারল রাগ আর মাথায় ধাক্কাচ্ছে না। সে তার গর্তের দিকে হাঁটা দিয়েছে।

সাইমন এবার রেস্টুরেন্টের সামনে থেকে সরে এসে হাঁটতে লাগল। আজ সকাল থেকেই কনকনে হাওয়া দিচ্ছে একটা। সকালে যখন সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এ গিয়েছিল মিসেস দে-কে ছবি আঁকা শেখাতে, তখনই টের পেয়েছিল যে, পাগল হাওয়ার দিন আজ। লেকের থেকে ঠান্ডা জল-ভরা হাওয়া এসে ঝাপটা মারছিল খুব। একটা জিনিস লক্ষ করেছে সাইমন, প্রতি বছর ক্রিসমাসের দিন হঠাৎ বেশ ঠান্ডা পড়ে। ওদের গ্রামে কী অবস্থা কে জানে? বোনটা ঠান্ডায় কী করছে? বলেছিল একজোড়া গরম মোজা নিয়ে যেতে। এখনও নিয়ে যেতে পারল না। পারবে কী করে? এ মাসে এখনও তো টিউশনের টাকাই পায়নি ও। আজ একবার বলেছিল বটে মাইনেটা দিয়ে দিতে। বলেছিল, কাল ক্রিসমাস, কিছু কেনাকাটি আছে, টাকার দরকার। কিন্তু তবু দেয়নি। মিসেস দে বলেছিলেন, "না ভাই, মাস না শেষ হলে দেব কেমন করে?" তখন একবার রাগবাবাজি এসে মাথায় 'নক' করছিল। কিন্তু বেরোতে পারেনি। নিউ আলিপুরে যে-বাড়িতে দ্বিতীয় টিউশনটা করতে যায় সাইমন সেখানে অবশ্য আর মাইনের টাকা চায়নি। কেননা ও জানত এরাও দেবে না।

কিন্তু সময়টা জানা হল না যে। সাইমনের একটা ঘড়ি রয়েছে। ডিজিটাল। চাঁদনি থেকে চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনেছিল। ব্যাটারিটা সপ্তাহখানেক হল ফুরিয়েছে। এখনও ভরা হয়নি। সাইমন জানে যে, সময় দেখাটা ওর মুদ্রাদোষ। যখন হাতে ঘড়ি থাকে তখন ঘনঘন সময় দেখে ও। আর না থাকলে রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে।

সামনে থেকে একটা সুন্দর দেখতে মেয়েকে আসতে দেখল সাইমন। সামান্য চাপা গায়ের রং আর তাতেই যেন সৌন্দর্য বাড়ছে আরও। মেয়েটার পাশে একটা লোক। রোগাটে চেহারা, মুখটায় একটু ভিতু ভাব। হাত দিয়ে মেয়েটার কনুই ধরে আছে লোকটা। মেয়েটার বাঁ হাতে একটা ঘড়ি বাঁধা। একে সময় জিজ্ঞেস করা যায়। তবে ভণিতা করবে না আর। সরাসরি জিজ্ঞেস করবে এবার।

BanglaBook.org

সাইমন হাতের গোল ড্রইংহোল্ডারটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। তারপর এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ক'টা বাজে?"

লোকটা ভিতু মতো মুখটা তুলল, "অ্যাঁ?"

"ক'টা বাজে?" সাইমন আবার জিজ্ঞেস করল মেয়েটাকে লক্ষ্য করে।

মেয়েটা ঘড়ি দেখল, তারপর বলল, "বারোটা, বারোটা বাজে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" সাইমন হাঁটা দিল। লোকটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে শুনল লোকটা বলছে, "কী রে সোনাই, কালু তো এল না এখনও। কী হবে?"

সাইমন শুনল সুন্দরী সোনাই বলছে, "দাদা, চিন্তা করিস না, ঠিক আসবে।"

কে আসবে, না আসবে, সেসব শুনলে হবে না সাইমনের। ওকে তাড়াতাড়ি কালীঘাট ট্রামডিপোর কাছে গ্রিক চার্চের সামনে পৌঁছোতে হবে। ওর ফুটপাথের দোকান খুলতে দেরি হয়েছে যথেষ্ট।

ফুটপাথের দোকান বললেও এরও একটা নাম মনে মনে দিয়েছে সাইমন। 'সানশাইন স্টুডিয়ো'। গ্রিক চার্চের কাছে রাস্তার পাশের একটা রেলিংয়ে নিজের আঁকা কিছু ছবি ঝুলিয়ে রাখে সাইমন। তার সামনে ছোট্ট একটা টুল আর বড় ক্লিপবোর্ড নিয়ে বসে থাকে। আগ্রহী মানুষদের পোর্ট্রেট এঁকে দেয় ও। তার জন্য নেয় সত্তর টাকা, আর কেউ যদি আরও তিরিশ টাকা দেয় তা হলে সেই সঙ্গে মানুষটির একটা কার্টুন এঁকে দেয়। অবশ্য এতে খুব যে লাভ কিছু হয়, তা নয়, কিন্তু কিছু তো একটা করবে ও। সারা সপ্তাহে দু'দিন করে দুটো টিউশনি করে সাইমন, আর খবর পেলে বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজিংয়ের ফার্মে যায় কাজের আশায়।

এই যেমন আজও গিয়েছিল। ক্যামাক স্ট্রিটে অ্যাডগ্র্যাম বলে একটা অফিস আছে। অ্যাড ক্যাম্পেন তৈরি করে। বর্তমানে ওরা একটা সফট ড্রিঙ্কসের ক্যাম্পেনে কাজ করছে। ওদের কথা মতো তারই কিছু লে-আউট করে নিয়ে গিয়েছিল ও। কোম্পানির মালিক শতানিক বাসুর সঙ্গে সরাসরি দেখা করেছিল ও। সব দেখে শুনে ভদ্রলোক পছন্দ করেছিলেন ওর লে-আউট। কিন্তু তারপরই একটা ফালতু প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

সামনে রবীন্দ্রসদন মেট্রো স্টেশন দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি গ্রিক চার্চের সামনে যেতে হলে মেট্রো ধরে কালীঘাট স্টেশনে নামতে হবে ওকে। কিন্তু চার টাকা ভাড়া। টাকা বাঁচাবার জন্য ও ক্যামাক স্ট্রিটের সেই মাথা থেকে হাঁটতে হাঁটতে এতটা পথ এসেছে। কিন্তু আর পারছে না। এই ভারী

BanglaBook.org

ড্রইংহোল্ডার আর হাতে ড্রইংবোর্ডটা ধরে এতটা হেঁটে এসে এবার বেশ ক্লান্ত লাগছে ওর। এখান থেকে কালীঘাট অবধি আর হাঁটতে পারবে না ও। বাসেও যেতে পারে, কিন্তু মেট্রোর গর্তটা ওকে টানছে খুব। খুব একটা মেট্রো রেলে চড়ে না সাইমন। দরকার হয় না। কিন্তু কখনও সখনও যখন চড়ে তখন খুব ভাল লাগে ওর। কেমন অদ্ভুত আলোর একটা সুড়ঙ্গ। পরিষ্কার, সুন্দর। এই সুড়ঙ্গে ঢুকলে কলকাতার মানুষগুলোও কেমন যেন বদলে যায়। সেই যেখানে-সেখানে পিক, থুতু, সিগারেট, গুটখার প্যাকেট ফেলা লোকগুলো হঠাৎ করে কেমন বদলে যায় যেন! সাইমনের মনে হয়, যারা শব্দ করে চায়ে চুমুক দেয় তারাও বোধহয় নিঃশব্দে চায়ের কাপ থেকে চা তুলবে মুখে।

এখান থেকে মেট্রোর মুখটা কেমন অন্ধকার লাগছে। ভেতরের টিউবটা জ্বলছে না। সাইমন মনে মনে বলল, ব্ল্যাক হোল। আর সেই কৃষ্ণগহ্বরের টানে ওর শরীর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেই দিকে।

মেট্রোয় আজ বিশাল লাইন। দেখে একটু দমে গেল ও। টিকিট কাটতেই দেরি হয়ে যাবে। কখন আর গিয়ে ওর স্টুডিয়ো খুলবে ও? ধীর পায়ে একটা লাইনের শেষে গিয়ে দাঁড়াল সাইমন। পকেটে আটত্রিশ টাকা আছে। তার থেকে দুটো দু'টাকার কয়েন হাতে নিল ও।

কালকে পঁচিশে ডিসেম্বর। ও ক্রিশ্চান হলেও এই দিনটা ওর কাছে নতুন কোনও অনুভূতি এনে দেয় না। বড় হওয়ায় দিনগুলোয় ও দেখত আকণ্ঠ বিষাদে ডুবে থাকা বাবা আর বিছানার সঙ্গে মিশে যাওয়া বোন। প্রতিটা বড়দিন ওর কাছে আর একটা দিনের মতোই ছিল। স্যান্টাক্লজ নিয়ে কোনও ফ্যান্টাসি ছিল না ওর। ঘুমানোর আগে লাল মোজা ঝুলিয়ে রাখার কথাও মনে আসেনি কোনওদিন। তবে বোনটা খুব তাকিয়ে থাকত এই দিনটার দিকে। যখন ছোট ছিল তখন বোন ভাবত স্যান্টাক্লজ বলে রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে লোকটা এসে একদিন হাত ধরে ওকে নামিয়ে আনবে বিছানা থেকে। বোন ভাবত ও হাঁটতে পারবে, তারপর প্রজাপতির পেছনে দৌড়োতে পারবে, বাবার হাত ধরে কিনতে যাবে ক্রিসমাস ট্রি। কিন্তু স্যান্টাক্লজ আসেনি। বোনও দৌড়োতে পারেনি প্রজাপতির পেছনে। শুধু বিছানার সঙ্গে আরও, আরও মিশে গেছে ও। যেন কোনও অদৃশ্য শিকড় বোনের কোমর থেকে বেরিয়ে ওকে গেঁথে রেখেছে বিছানার সঙ্গে।

শুধু মাঝে মাঝে সাইমন একটা গান শুনত। আকণ্ঠ মদ খেয়ে জড়ানো

BanglaBook.org

গলায় বাবা মাঝে মাঝে গান গাইত একটা। ছোটবেলার থেকেই অদ্ভুত সুরের গানটা শুনত সাইমন, কিন্তু জড়ানো গলার জন্য কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারত না স্পষ্ট। খুব কৌতূহল হত সাইমনের। কিন্তু বিষণ্ণ বাবাকে জিজ্ঞেস করতে ঠিক ভরসা পেত না ও। ভয় লাগত, কী জানি বাবা কী রকম রিঅ্যাক্ট করে!

তবে বড় হওয়ার পর একবার এক ক্রিসমাসের আগের সন্ধ্যায় গানটার শব্দগুলো স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল সাইমন।

সেদিন বোনের জ্বর ছিল খুব। বাবা, বোনের জন্য কিনে আনা ছোট্ট ফ্রকটা ওর মাথার কাছে রেখে, একটা চেয়ার টেনে বসেছিল পাশে। বোনের হুঁশ ছিল না কোনও। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, প্রায় লুকিয়ে, সাইমন শুনেছিল বোনের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বাবা গাইছে—

'I saw Mommy kissing Santa Claus
Underneath the mistletoe last night.
She didn't see me creep
down the stairs to have a peep;
She thought that I was tucked
up in my bedroom fast asleep.
Then, I saw Mommy tickle Santa Claus
Underneath his beard so snowy white;
Oh, what a laugh it would have been
If Daddy had only seen
Mommy kissing Santa Claus last night.'

একদিন জেঠিমার প্রচণ্ড গালাগালির মুখে সাইমন শুনেছিল, মা যে-মানুষটার সঙ্গে চলে গিয়েছে, তার নাকি দাড়ি ছিল মুখ-ভরতি।

টিকিট কেটে গেটের দিকে এগোল সাইমন। সেখানেও লম্বা লাইন। ছোট্ট সিকিউরিটি ব্রিজ পার হওয়ার সময় দেখল দু'জন পুলিশ ওর পিঠে ঝোলানো ড্রইংহোল্ডারটার দিকে সন্দেহজনক ভাবে তাকাচ্ছে। সাইমন ভাবল পুলিশ দুটো এটাকে রকেট লঞ্চার ভাবছে নাকি? ইচ্ছে হল ড্রইংহোল্ডারটাকে একবার পিঠ থেকে খুলে রকেট লঞ্চারের মতো তাগ করে ওদের দিকে। তা

BanglaBook.org

হলে দেখা যাবে ওদের ক্যাদ্দানি। সাইমন ভাবে কলকাতার মেট্রোয় যা অবস্থা তাতে যখন তখন বড়সড় কেলেঙ্কারি ঘটে যেতে পারে। ওই যে পুলিশ দুটো ওর দিকে সন্দেহজনকভাবে তাকাল, কই দেখতে তো চাইল না ওর এই লম্বাটে কেসটার মধ্যে সত্যিই কী আছে! এর মধ্যে যদি জিলেটিন স্টিক আর ডেটোনেটর থাকে? একবার পেছনের ভিড়ের দিকে তাকাল ও। ওই ভিড়ের মধ্যে কারও কাছে ওসব নেই তো?

স্টেশনে নেমে দাঁড়াল সাইমন। ঘড়িতে এখন বারোটা ষোলো। এক্ষুনি ট্রেন আছে একটা। গোল গোল থামগুলোর একটায় পিঠ রেখে দাঁড়াল সাইমন। ভালই ভিড় রয়েছে স্টেশনে। তবু তার মধ্যেও একটা দৃশ্য দেখে বেশ অস্বস্তি লাগল ওর। সামনের গোল থামটার কাছে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই শীতেও মেয়েটা একটা সাদা হাতকাটা গেঞ্জি আর লো-ওয়েস্ট জিনস পরে আছে। গেঞ্জি আর প্যান্টের মধ্যে বেশ খানিকটা জায়গা উন্মুক্ত। ছেলেটা সেখানে হাত দিয়ে রেখেছে। মেয়েটাও ফিসফিস করে বলছে কিছু আর ছেলেটার গালে হাত বোলাচ্ছে আলতো করে। চারিদিকের মানুষজন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। বিনে পয়সায় সিনেমা। সাইমন দেখল ওদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ, ওর দেখা, বেশ কয়েক বছর আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেল। ওর প্ল্যানেটোরিয়ামের লাগোয়া একটা ছোট ছাদ রয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে ও এরকমই একটা দৃশ্য দেখেছিল। একটা মেয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমু খেয়েছিল একটা ছেলেকে। একটা ছাদের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ছিল সাইমন, তবু যেন ওর মনে হয়েছিল সহসা চুম্বনে ছেলেটা বিব্রত। মেয়েটা সরে গেলে ছেলেটার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ও হয়েছিল সাইমনের। তখন সংবিৎ ফিরেছিল ওর। লজ্জা লেগেছিল। মনে হয়েছিল অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওভাবে দখল বসাতে নেই।

আজও মুখ ঘুরিয়ে নিল সাইমন। প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির দিকে তাকাল একবার। সময় হয়ে গেছে। ট্রেন আসছে কি? সাইমনের প্রশ্নের উত্তর হিসেবেই যেন প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ঢুকল ট্রেন। ছেলেমেয়ে দু'জনও বিচ্ছিন্ন হয়ে ট্রেনের ব্যাপারে সচেতন হল। ড্যাবড্যাবে পাবলিক অসময়ে সিনেমার শো ভেঙে যাওয়ার দুঃখ নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ট্রেনের দিকে।

যতীন দাস পার্ক স্টেশনে দরজা খুলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ট্রেনটা।

BanglaBook.org

ফলে কালীঘাটে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় বারোটা পঁয়ত্রিশ বেজে গেল সাইমনের। বেশ খিদে পাচ্ছে ওর। সকালে বিশেষ কিছুই খাওয়া হয়নি। ওই নিউ আলিপুরের ওখানে যে-স্টুডেন্ট থাকে, তার বাড়িতে স্যান্ডউইচ আর চা দিয়েছিল, সে-সব কখন শরীরের সঙ্গে মিশে গেছে! রোজ বেলা একটা নাগাদ ছাতু আর একটু আচার খায় সাইমন, আজ পেট একটু তাড়াতাড়িই হ্যাংলামো শুরু করেছে। ওই যে অতটা হেঁটেছে, সেইজন্যই বোধহয়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে কালীঘাট ট্রাম ডিপোর দিকে হাঁটতে শুরু করল সাইমন। এখন চারিদিকে কেমন একটা ছানা-কাটা ভিড়। সাইমন জানে আজ বিশেষ কাস্টমার পাওয়া যাবে না এখন। তবে সন্ধের দিকে, চার্চে যখন মানুষ আসতে শুরু করবে, তখন কিছু মানুষ পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য আজ বিকেলের পর থেকে রাস্তাঘাটের অবস্থা কেমন থাকবে তার ওপরও নির্ভর করছে অনেক কিছু। আজ তো বিশ্বশান্তির জন্য মহামিছিল আছে।

বিশ্বশান্তি একটা অদ্ভুত, হাস্যকর শব্দ। সভ্যতার একদম প্রথম অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত কোনওদিন শান্তি থেকেছে পৃথিবীতে? সবসময় তো যুদ্ধ, মারামারি লেগেই আছে। যা আছে, থাকবে। তার বিরুদ্ধে মিছিল করে কলকাতার গলা টিপে ধরার কী মানে কে জানে! যাই করো, মানুষের প্রবৃত্তিকে ঠেকাবে কী করে? আর এই যখন-তখন মিছিল করে সব কিছু থামিয়ে দেওয়াটাও তো অশান্তির মধ্যেই পড়ে।

ফুটপাথের পাশে লাল টালি বসানো একটা ছোট্ট মন্দিরের সামনে আজও পাগলাটাকে বসে থাকতে দেখল সাইমন। নেড়া মাথা, গায়ে ছিন্নভিন্ন একটা চাদর। লোকটা হাত জোড় করে বলছে, "ভগবান, মানুষের ভাল করো, আমার মাথার চুলকানি কমিয়ে দাও, আমায় একটা লাল-কালো জুতো দাও। ভগবান, যারা যারা সেয়ানাগিরি করছে সবার পেছনে দিয়ে দাও।"

সাইমন, দিনের মধ্যে এই প্রথম হাসল, ইউনিক প্রার্থনা। ও ও যদি এমন করতে পারত!

নিজের জায়গায় গিয়ে কাঁধ থেকে ড্রইংহোল্ডারটা খুলে রেলিংয়ের ওপর ঝুলিয়ে দিল সাইমন। তারপর পাশের ঠেলার দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল। এটা ন্যাপাদার ঠেলা। চা, বিস্কিট, পাউরুটি, ডিমভাজা, চাউমিন, চপ, নানা রকম জিনিসপত্তর বিক্রি করে ন্যাপাদা। ঠেলাটা নামে ঠেলা হলেও আকারে

BanglaBook.org

এমন বড় যে, তাকে সত্যিই ঠেলা দিয়ে সরানো মুশকিল। সাইমন রেলিংয়ে যে পাঁচ-ছ'টা ছবি ঝোলায়, তা, কাজ শেষ হলে প্লাস্টিকে ভাল করে মুড়ে এই ন্যাপাদার ঠেলাতেই রেখে যায়।

ন্যাপাদা সামনে দাঁড়ানো একজনের জন্য চাউমিন তৈরি করছিল। ওকে দেখে বলল, "ওই বাঁ দিকের সেলাইডিংটা খোল, তোর ছবি পেয়ে যাবি। ডান দিক থেকে আজ সরিয়ে রেখেছি এই দিকে। তা আজ এত দেরি হল?"

সাইমন ছবিগুলো বের করতে করতে বলল, "ওই ক্যামাক স্ট্রিটে গিয়েছিলাম একটা কাজে।"

চাউমিনগুলো বড় তাওয়ার একপাশে জড়ো করে একটা ডিম ভেঙে তাওয়ার মধ্যে ফেলে ঘাঁটতে ঘাঁটতে ন্যাপাদা বলল, "হয়েছে কাজটা?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

ন্যাপাদা কিছু বলার আগেই সামনে দাঁড়ানো লোকটা বলে উঠল, "আরে, বললাম লঙ্কা কম দিতে। অত লঙ্কা দিচ্ছেন কেন?"

ন্যাপাদা খুন্তি দিয়ে লঙ্কা সরাতে সরাতে বলল, "তা তুই এবার বড়দিনে দেশে যাবি না?"

সাইমন থমকাল একটু, তারপর বলল, "না গো, এবার আর যাওয়া হবে না। বোনটা বলেছিল, কিন্তু জানোই তো অবস্থা। বাড়িওয়ালা কী বলেছে তোমায় তো বলেছি।"

"তোদের বাড়িওলাটা মহা হারামি। দিতে পারিস না কোনওদিন ঠুকে? যাক গে, দেখ কী করতে পারিস?"

সাইমন জানে যে, বাড়িওলা মানুষটা ভাল, শুধু একটু বোকাসোকা এই যা। না হলে এই যে, ওর চার মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে তাতে তো ঘাড় ধরে বের করে দেয়নি ওকে। তবে এবার অবশ্য আলটিমেটাম দিয়েছে। বলেছে, "সামনের একত্রিশ তারিখের মধ্যে ঘরভাড়া মেটাতে না পারলে কিন্তু তোমায় তুলে দেব এবার। আর রাখব না।" কিন্তু সাইমন কোথায় পাবে দু'হাজার টাকা? কে দেবে ওকে ধার? সাইমনের মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। প্ল্যানেটোরিয়াম হলেও, মাথা গোঁজার ঠাঁই তো! এটা চলে গেলে কোথায় দাঁড়াবে ও? অবশ্য ও জানে এর পেছনে কার ইন্ধন আছে! সেই মোহন সেন নামে মালটার!

দেওয়ালের গায়ে এক-এক করে ছবিগুলো টাঙাল সাইমন। তারপর ছোট

BanglaBook.org

টিনের বোর্ডটা ইংরেজি 'A' অক্ষরের মতো খুলে দাঁড় করাল ফুটপাথে। এর গায়েই লেখা রয়েছে পোর্ট্রেট আর কার্টুন আঁকার কথা। এটা ওর সাইনবোর্ড। এটাও ন্যাপাদার ঠেলায় থাকে। ছোট্ট টুলটা নিয়ে এবার বসল সাইমন। সময় মতো বিজ্ঞাপনের লে-আউটগুলো দেখতে হবে একবার। আসলে এটা সাইমনের অভ্যাস, কাজটা হল কি হল না, সেটার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে কাজটাকে আরও ভাল করার চেষ্টা ও শেষ পর্যন্ত করে যায়। কিন্তু এখন আগে কিছু খেতে হবে। কোলের ওপর বোর্ডটা নিয়ে বাঁ দিকে তাকাল। ছাতুওলাটা কই কে জানে! এখনও এল না তো। খিদে পাচ্ছে এত! ও জানে ন্যাপাদাকে বললেই ন্যাপাদা খাইয়ে দেবে। পয়সাও নেবে না। কিন্তু বলবে না সাইমন। ও বলে না।

চার্চের দিকে একবার তাকাল ও। কী সুন্দর ছোট ছোট বাল্‌ব আর রিবন দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে চারিদিকে। বোনটা দেখতে পেলে কী খুশিই যে হত! ও দেশে গেলেই কলকাতার গল্প শোনার জন্য বায়না করে বোন। আর ওর প্রিয় ক্রিসমাসে যদি একবার ওকে আনা যেত এখানে। বোনটার কথা মনে পড়ায় চোখটা জ্বালা করে উঠল সাইমনের। কী অবস্থায় আছে ও? অন্য বার ক্রিসমাসে বাড়ি যায় সাইমন, কিন্তু এবার গেল না। কাল উৎসবের বাজারে যদি ছবি এঁকে কিছু রোজগার হয়। বাড়ি ভাড়াটা মেটানো খুব জরুরি। না হলে তো রাস্তায় দাঁড়াতে হবে ওকে।

"এই নে ধর।" সাইমন দেখল ন্যাপাদা একটা প্লেটে করে ওর দিকে চাউমিন বাড়িয়ে ধরেছে।

ও হাসল, "খিদে নেই ন্যাপাদা। ক্যামাক স্ট্রিটে খেয়েছি আমি।"

ন্যাপাদাও হাসল, বলল, "তবু খা। আমার মন রাখতে খা। শরীর ঠিক না থাকলে বোনটাকে কে দেখবে? খা বলছি।"

ন্যাপাদার কথাগুলোর ভেতরে কী ছিল কে জানে? সাইমনের গলার ভেতর ছোট্ট একটা বেলুন ফুলতে লাগল। চোখের জ্বালাটা আর্দ্রতায় পরিণত হল। সাইমন হাত বাড়িয়ে প্লেটটা নিল এবার।

ন্যাপাদা বলল, "জানিস, সোয়া এগারোটা নাগাদ রাসবিহারী মোড়ে ব্যাপক কিচাইন হয়েছে।"

"মানে?" চাউমিন চিবোতে চিবোতে প্রশ্ন করল সাইমন।

"অটোওলাদের সঙ্গে একটা লোকের লেগেছিল। লোকটার পা-টা ভেঙে গেছে রে। নার্সিংহোমে যেতে হয়েছে।"

BanglaBook.org

"কেন, অটোওলারা মেরেছে?"

"কে জানে? মারতেও পারে। তবে শুনলাম লোকটারই নাকি দোষ। ফোনে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালাচ্ছিল। কেন, তুই আসার সময় কিছু দেখলি না?"

"না তো। সব ঠিক আছে দেখলাম।"

ন্যাপাদা কিছু বলার আগেই একটা প্রশ্নে সাইমন ডান দিকে তাকাল। একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাঝারি উচ্চতা। চোখমুখ ভীষণ সুন্দর। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। দেখে মনে হচ্ছে রেনেসাঁ যুগের কোনও ইতালীয় পুরুষ। ভদ্রলোকের গলার স্বরটাও খুব সুন্দর। ভদ্রলোককে দেখে কেমন জানি অস্বস্তি হল সাইমনের। চেনা লাগল কি?

সাইমন তাকাতেই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ছবি এঁকে দেবেন?"

"নিশ্চয়ই", সামনের ছোট টুলটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সাইমন বলল, "বসুন।"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি খেয়ে নিন, আমি বসছি। নো প্রবলেম।"

"নো প্রবলেম?" আরে সকালে এই লোকটার সঙ্গেই তো ধাক্কা লেগেছিল ওর টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে! তখনও তো 'নো প্রবলেম' বলেছিলেন উনি! সাইমন দেখল ছোট টুলের ওপর বসে ভদ্রলোক সামনের গুমটি থেকে বেরোনো একটা ট্রামকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে দেখছেন।

গোগ্রাসে চাউমিন খেতে লাগল সাইমন আর ভাবল, দু'হাজার টাকা এই ক'দিনের মধ্যে জোগাড় করতেই হবে। না হলে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে ওকে। বোনটার কী হবে তখন? কিন্তু আর মাত্র সাত দিন সময় আছে। তা হলে কি ওই মিথ্যেবাদী শতানিক বাসুর ওইসব উলটোপালটা কথা শুনেও ওকে ওঁর প্রস্তাব মেনে নিতে হবে? ওই অসম্মানজনক প্রস্তাব?

কী করবে ও? সাইমন সামনে তাকাল। ভদ্রলোক এখনও ট্রাম দেখে যাচ্ছেন।

BanglaBook.org

মহেশ ২৪ ডিসেম্বর, দুপুর একটা পাঁচ

ট্রাম দেখতে এখনও খুব ভাল লাগে মহেশের। কেমন ছোট্ট দু'কামরার যান একটা। ওপরের তারের সঙ্গে টিকি বেঁধে কেমন ভাসতে ভাসতে যায়! এই যানটি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে প্রত্যেকেরই টিকি কোথাও না কোথাও বাঁধা। সবাই কোথাও না কোথাও যেন বদ্ধ।

ট্রামটা এখন ফাঁকা, সদ্য গুমটি থেকে বেরিয়েছে, পথে লোক তুলতে তুলতে সে তার গন্তব্যের দিকে যাবে। আজ মহেশেরও গন্তব্যে পৌঁছোনোর দিন। আজ চব্বিশে ডিসেম্বর, ওর জন্মদিন, আবার আজই ওর মৃত্যুদিনও হবে।

ট্রামটা দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ। তবু মাথা ঘুরিয়ে যতক্ষণ সম্ভব সেই দিকে তাকিয়ে রইল মহেশ। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল ওর। ও আর রৌনক দু'জনে ট্রামে করে স্কুল থেকে ফিরত। তখন কলকাতায় এত লোক ছিল না। যানবাহন বিকেলের দিকটায় একটু ফাঁকাই থাকত। ক্লাস সেভেনের মহেশের ট্রামে চড়ার ভাললাগা ছাড়া অন্য আর একটা কারণও ছিল। খোঁড়া দাদুর লজেন্স। একটা কাঠের পা নিয়ে ট্রামে উঠত লোকটা, সঙ্গে একবয়াম টক-ঝাল লজেন্স। সারাজীবনে সেই ছোটবেলার মতো টক-ঝাল লজেন্স আর কোথাও পেল না মহেশ। অবশ্য ছোটবেলার মতো কিছুই আর পাওয়া যায় না বোধহয়।

সেই যে অত বন্ধু ছিল রৌনক, তারও কি কোনও খবর আছে আর? কলেজ অবধি পৌঁছোনো ওদের গভীর বন্ধুত্বটা তো ভেঙে গেল মাত্র এক দিনের ঘটনায়। একটা দিন, কয়েকটা মুহূর্ত— এই যথেষ্ট মানুষের সম্পর্কে আর তার জীবন পালটে দেবার জন্য। মহেশকে কলেজে সবাই 'ছদ্মবেশী রাজপুত্র' বলে ডাকত। ছোটবেলার থেকেই সবার থেকে ওকে শুনতে হয়েছে যে, ওকে নাকি রাজপুত্রের মতো দেখতে! কে জানে রাজপুত্র কাকে বলে? ওর বাবা তো স্কুলমাস্টার ছিল।

কলেজের আগে অবধি ছোট-বড় নানান বয়সি মেয়ে ওর কাছে এলেও মহেশ কোনওদিন তাদের আমল দেয়নি, আগ্রহ বোধ করেনি। কিন্তু কলেজে ওর শেষ বছরে, ফার্স্ট ইয়ারে ভরতি হওয়া শ্রীপর্ণা ওকে মেরে ফেলেছিল একবারে। মেয়েটাকে দেখামাত্র ওর পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিল

BanglaBook.org

নিমেষে। ওর মনে হয়েছিল এই মেয়েটা, একমাত্র এই মেয়েটার জন্যই ও অপেক্ষা করেছিল সারাজীবন।

কিন্তু শ্রীপর্ণাকে বলতে পারেনি কোনওদিন, বরং বলেছিল রৌনককে। এমন নিভৃত আনন্দের কথা বন্ধুকে ছাড়া আর কাকেই বা বলবে মানুষ? রৌনক সব শুনে খুব উৎসাহ দিয়েছিল ওকে। বলেছিল, "এগিয়ে যা তুই, কোনও ভয় পাস না।" কিন্তু শ্রীপর্ণাকে দেখলেই কী জানি হয়ে যেত ওর, সব গুলিয়ে যেত। মনে হত জিভটা কেউ চোয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে গেঁথে দিয়েছে। ফলে কোনও দিনই এগোনো হয়নি। বরং একটা ঘটনায় পিছিয়ে এসেছিল ও।

মহেশের সাবজেক্ট ছিল ফিজিক্স। শ্রীপর্ণাও ফার্স্ট ইয়ারে ফিজিক্স অনার্স নিয়েই ভরতি হয়েছিল। শীতের শুরুতে একবার ওদের ডিপার্টমেন্ট থেকে সব ইয়ার মিলিয়ে ওরা একটা পিকনিক আয়োজন করে। দু'দিনের পিকনিক। মহেশ হই-হট্টগোল এড়িয়ে থাকলেও এই পিকনিকটায় গিয়েছিল একমাত্র শ্রীপর্ণা যাবে বলে।

মহেশ ভাবে হয়তো ওটাই ঠিক হয়নি ওর। কারণ, না গেলে গেস্ট হাউসের ছাদে, সন্ধের অন্ধকারে ওই দৃশ্যটা দেখতে হত না ওকে। রৌনককে খুঁজতে ছাদে উঠে ও দেখেছিল ছায়াময় দুই অবয়ব পাগলের মতো খুঁড়ে চলেছে একে অপরকে। তাদের অস্ফুট গোঙানি, তাদের শরীরী ভঙ্গিমা আর শ্বাসের শব্দ নড়তে দিচ্ছিল না মহেশকে। নড়তে দিচ্ছিল না আরও একটা কারণে, ক্রমশ অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ায় ও বুঝতে পারছিল মানুষ দুটি কে! শ্রীপর্ণার তলপেটে মুখ গুঁজে থাকা রৌনককে চিনতে একফোঁটা অসুবিধে হয়নি ওর। সে-দিন, সেই শেষ অগ্রহায়ণের সন্ধেবেলা অদৃশ্য এক বজ্রপাত এসে মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছিল ওকে। ও ভেবেছিল, এই রৌনক আদৌ কি ওর বন্ধু? বন্ধু এরকম কাজ করতে পারে?

রৌনককে জিজ্ঞেস করায় ও বলেছিল, "দেখ, এটা কোনও ব্যাপার নয়। উই হ্যাভ সেক্স। দ্যাটস অল। নো স্ট্রিংস অ্যাটাচড।"

"মানে? তুই এমনি এমনি মেয়েটার সঙ্গে ওসব করলি? তুই ভালবাসিস না ওকে?"

রৌনক বলেছিল, "যতক্ষণ ওর শরীরের সঙ্গে ছিলাম ততক্ষণ তো ভালবেসেছিলাম, তারপর আর প্রয়োজন নেই।"

BanglaBook.org

"মানে? কী আবোল তাবোল বকছিস?"

রৌনক হেসে বলেছিল, "আবোল তাবোল নয়, দিস ইজ মি। আ টোটাল ফ্রি স্পিরিট। আই লিভ ফর দ্য মোমেন্ট।"

মহেশ বুঝেছিল ওদের বন্ধুত্বের মুহূর্তও শেষ হল।

রৌনক যা করেছিল তা আজ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবেই মেনে এসেছে মহেশ। কিন্তু গত রাতে ও নিজে যা করেছে, তারপর থেকে ও নিজের মধ্যেও একজন রৌনককে দেখতে শুরু করেছে।

সামনের শিল্পী ছেলেটাকে এবার দেখল মহেশ। দ্রুত চাউমিন খাচ্ছে। একেই বলে গোগ্রাস। মায়া হল ওর। ও বুঝতে পারল মহেশকে যাতে অপেক্ষা না করতে হয় সেইজন্য দ্রুত খাবার শেষ করছে ছেলেটা। মহেশ বলল, "আপনি আস্তে খান। আমার তাড়া নেই। আমি অপেক্ষা করছি।"

সত্যিই আজ তাড়া নেই মহেশের। তাড়াহুড়ো করে মৃত্যুর কাছে যেতে চায় না ও। গত মাস চারেক হল ওর লাং ক্যান্সার ধরা পড়েছে। ডাক্তার বলেছেন দেরি হয়ে গেছে বেশ। আর নাকি কয়েক মাসের মামলা। কথাটা কাউকে জানায়নি ও। অবশ্য জানাবার মতো ভাই ছাড়া আর আছেই বা কে? ভাই আর ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গেই থাকে মহেশ। বাবা-মা নেই। আর ও তো বিয়েই করেনি।

মাস ছয়েক হল বিয়ে হয়েছে ভাইয়ের। বাড়ির নীচের তলায় থাকে ওরা আর ওপরের তলার দুটো ঘরে মহেশ। ভাইটা খুব ভাল ওর। একটা প্রাইভেট কোম্পানির সেলস-এ আছে। মাঝেমধ্যে বাইরে যেতে হয়। অবশ্য বিয়ের পর বেশ কয়েক মাস ঠেকিয়ে রেখেছিল বাইরে যাওয়াটা, কিন্তু গত পরশু কোয়েম্বাটুর যেতে হয়েছে ওকে।

ভাই ওর চেয়ে প্রায় চোদ্দো বছরের ছোট। নরমসরম মানুষ, তাই ভাইটাকে আর শরীরে কর্কটের হানার ব্যাপারটা বলেনি। বললে, ও জানে, ভাই ভেঙে পড়বে।

মহেশ গত মাস কয়েক ধরে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে ধীরে ধীরে। ও বিমা কোম্পানির চাকরি ছেড়েছে, বন্ধুবান্ধব ছেড়েছে, বই পড়াও ছেড়ে দিয়েছে। বুকের ভেতর পোষা কর্কট নিয়ে ও নিজেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে ওর চারিপাশ থেকে। বুকের ভেতর ওই পোষা প্রাণী ক্রমেই তার ব্যস্ততা বাড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে তীব্র কামড়ও বসাচ্ছে। জানান দিচ্ছে যে, সময় ফুরিয়ে আসছে ওর।

BanglaBook.org

দীর্ঘ দিন ধরে মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে মহেশের চারিপাশে। ও-ও চিন্তা করছে এবার হয়তো নিজের থেকে সরে যাওয়াই ভাল হবে। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না ওর। কিন্তু তবু এই পৃথিবীর মায়া কাটানোও সহজ নয়। তাই বুকের পোষা প্রাণীরা যতই দামাল হয়ে উঠুক না কেন তাকে বহন করতেই হয়েছে ওকে। তবে আজ এই প্রাণীদেরও শেষ হওয়ার দিন। ভোররাতেই মনস্থির করে নিয়েছে মহেশ। গতকাল রাতের সেই ঘটনার পর আর বেঁচে থাকার মুখ নেই ওর। বুকের কর্কট নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু মনের কর্কট আরও হিংস্র, আরও হত্যাপ্রবণ। মহেশ জানে, গত রাতে ও বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়েছে। বিশ্বাস ভেঙেছে ও। তাই আজ, চব্বিশে ডিসেম্বর, ওর জন্মদিনে, নিজের থেকেই সরে যাবে মহেশ।

তবে সরে যাওয়ার আগে শেষ বারের মতো একটু আনন্দ করে নেবে ও। এই ছবি আঁকাবে নিজের, তারপর বিরিয়ানি খাবে, টক-ঝাল লজেন্স খাবে, একটু হাঁটবে রাস্তা দিয়ে আর একসময় চলন্ত কোনও বাসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে।

ছেলেটা খাওয়া শেষ করে সামনের একটা বড় ঠেলার কাছে গিয়ে প্লেটটা রেখে দিল। তারপর ঠেলার ওপর রাখা জগের থেকে জল নিয়ে ধুয়ে ফেলল মুখটা। ছেলেটার তাড়া দেখে মায়া হল মহেশের। এই যে ফুটপাথে বসে ছবি আঁকে ছেলেটা, তাতে কতই বা রোজগার হয় ওর? ওর বাড়িতে কে কে আছে? কারা নির্ভরশীল ওর রং-তুলির ওপর? মহেশ ভাবল, আজ ও শেষ করতে যাচ্ছে ওর জীবন আর ওর সামনেই আরেক জন বেঁচে থাকার, ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। এই বৈপরীত্য, এই সাদা-কালো, এই মৃত্যু আর জীবন এই সব কিছুর জন্যই তো পৃথিবী এত বর্ণময়, এত অদ্ভুত। ঠিক যেন টক-ঝাল লজেন্স।

ছেলেটা এসে বসল এবার। জিজ্ঞেস করল, "আপনার শুধু পোর্ট্রেটই আঁকব কি?"

মহেশ উত্তর না দিয়ে পালটা জিজ্ঞেস করল, "আপনার নামটা ভাই?"

ছেলেটা থমকাল একটু। চোখেমুখে আশ্চর্য ভাব। হয়তো কেউ কোনওদিন ওকে নাম জিজ্ঞেস করেনি। ছেলেটা বলল, "সাইমন রুপেন মণ্ডল।"

হাসল মহেশ। অদ্ভুত নাম। তবে ভাল। ও বলল, "সাইমন, ডু ইউ মাইন্ড ইফ আই কল ইউ সাইমন?"

BanglaBook.org

"না, আপনি বলুন।"

মহেশ বলল, "আপনি আমায় দুটোই এঁকে দিন। পোর্ট্রেট আর কার্টুন। দেখি আমায় কার্টুনে কেমন দেখতে লাগে। সারাজীবন তো কার্টুনের মতোই কাটিয়ে দিলাম।"

সাইমন হাসল, বলল, "আচ্ছা। আপনি একটু স্থির হয়ে বসবেন, কেমন? আর মুখটা একটু পাশে ঘোরান। আর একটু, হ্যাঁ। আলোটা একটু এভাবে দরকার।"

মহেশ বাধ্য হয়ে সাইমনের নির্দেশ মতো মুখ ঘোরাল। ও দেখল ফরসা ছেলেটা কোলের ওপর রাখা ক্লিপবোর্ডে সাদা পাতা আটকাচ্ছে। এলোমেলো হাওয়ায় অবাধ্য পাতাটা উড়ছে ফরফর করে। আজ সারাদিন খুব হাওয়া দিচ্ছে কলকাতায়।

সাইমনের কথা মতো চুপচাপ বসে রইল মহেশ। সাদা পাতায় মোটা পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকা শুরু হয়েছে। এক একটা আঁচড়ে ক্রমশ ফুটে উঠছে মহেশ। ওর ছবি স্পষ্ট হচ্ছে কলকাতায়। ওর শেষ ছবি।

ছবিটা আঁকা হলে এটা ওদের বাড়ির ঠিকানায় ক্যুরিয়ার করে দেবে মহেশ। ওর ভাইয়ের নামে পাঠাবে ছবিটা। ভাইটা খুব দুঃখ পাবে, ও জানে। কিন্তু পেলেও কিছু করার নেই। ও আর ভাইয়ের সামনে দাঁড়াতে পারবে না কোনওদিন। গতকাল রাতটা যদি জীবন থেকে মুছে দিতে পারত! যা ঘটেছে, তা ঘোর অন্যায়। বিশ্বাসঘাতকতা। গতরাতে কয়েকটা মুহূর্ত ওর বুকের খাঁচায় বন্ধ থাকা কর্কটকে খুলে ছেড়ে দিয়েছে ওর মনে। একে মারার একমাত্র উপায় গোটা শরীরটাকে শেষ করে দেওয়া।

মন দিয়ে ছবি এঁকে চলেছে সাইমন। ওর কামড়ে ধরা ঠোঁট, কুঁচকে রাখা ভুরু আর দ্রুত হাতে পেনসিল চালানো দেখতে দেখতে কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে গেল মহেশ। ওর ভাইও ভাল ছবি আঁকত একসময়। ঠিক এরকমভাবে চোখ কুঁচকে, ঠোঁট টিপে ছবি আঁকত ভাই। গাছ, পাহাড়, সূর্য, বাড়ি সব নিখুঁত করে এঁকে এনে দেখাত মহেশকে। বলত, "দাদা দেখ ভাল হয়েছে না?"

মহেশ গাল টিপে দিত ভাইয়ের, কোলে তুলে নিত। চোদ্দো বছরের ছোট ভাইকে যেন কতকটা নিজের সন্তানের মতোই দেখত মহেশ। আর ভাইটাও কেমন যেন বিড়ালের মতো লেগে থাকত পায়ের সঙ্গে। যেখানে মহেশ সেখানেই যেত, পেছনে পেছনে ঘুরত। কেউ কিছু দিলে বাবা-মাকে না দিয়ে

BanglaBook.org

এক ছুটে এসে জিনিসটা ধরিয়ে দিত মহেশের হাতে। বলত, "দাদা, তুই সাবধানে রেখে দিস তো এটা।"

এবারও তো ট্যুরে যাওয়ার সময় বলেছিল, "লালিকে একটু দেখিস তো দাদা।"

মহেশ বলেছিল, "সে দেখব। কিন্তু তুই চিন্তা করছিস কেন? তোর শাশুড়িও তো রয়েছেন।"

ভাই হেসে বলেছিল, "তাও তুই দেখিস। না হলে আমার ঠিক শান্তি হয় না।"

মহেশ তো ভাইকে কথাও দিয়েছিল। বলেছিল, "চিন্তা করিস না, দেখব আমি।" কিন্তু কী যে হল, সব গন্ডগোল হয়ে গেল একদম। মহেশ ভাবল এই বিষাক্ত শরীর আর রাখবে না ও। এর আয়ু পূর্ণ হয়েছে। একে এবার বিদায় নিতে হবে।

"মুখটা একটু নামান।" সাইমনের নির্দেশে সংবিৎ ফিরল মহেশের। ও মুখটা নামাল। তারপর হালকাভাবে জিজ্ঞেস করল, "আর কত দেরি ভাই?"

"এই আর মিনিট খানেক।"

মহেশ বলল, "ঠিক আছে। ডোন্ট হেস্ট। টেক ইয়োর টাইম।"

সাইমন শেষ কয়েক বার পেনসিল টেনে ছবিটা এগিয়ে দিল ওর দিকে, বলল, "এই দেখুন, হয়েছে তো?"

মহেশ হাতে নিল ছবিটা, তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, "বাঃ, একদম আমার মতো দেখতে হয়েছে, তবে এটা আমি নই।"

"আপনি নন?" সাইমন থতমত খেয়ে তাকাল ওর দিকে।

মহেশ দেখল ছেলেটা ঘাবড়ে গেছে একটু। হয়তো নিজের ওপর সংশয়ও জেগেছে ওর। মহেশ বলল, "না না আপনার আঁকা ঠিক আছে, শুধু এটা ঠিক এখনকার আমি নই। এটা চব্বিশ ঘণ্টা আগের আমি।"

সাইমন একরাশ প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে রইল।

মহেশ বলল, "আমি এখন আর এরকম নই।"

সাইমন বলল, "কিন্তু আমার তো এরকমই লাগছে। আমি যেমন দেখলাম তেমনই তো আঁকব। অবশ্য আপনার যদি পছন্দ না হয়..."

মহেশ ওকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বলল, "খুব পছন্দ হয়েছে। তা ছাড়া পুরনো নিজেকে দেখারও তো আনন্দ আছে একটা।"

BanglaBook.org

এরপর কার্টুনটা আঁকতে আরও মিনিট পাঁচেক সময় নিল ছেলেটা। সেটা দেখে মহেশ বলল, "এটা একদম আমার মতো হয়েছে। রিডিকুলাস ইয়েট ট্রু।"

সাইমন এবার আর কোনও উত্তর না দিয়ে হাসল শুধু। মহেশ পকেট থেকে একশো টাকা বের করে সাইমনকে দিল। ছবি দুটোকে একটা পাতলা পলিথিনের প্যাকেটে ভরে সাইমন এগিয়ে দিল মহেশের দিকে, তারপর বলল, "মেরি ক্রিসমাস।"

মহেশ প্যাকেটটা নিয়ে হাসল একবার, "ফর দ্য লাস্ট টাইম, মেরি ক্রিসমাস।"

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে এবার হাজরার দিকে হাঁটতে লাগল মহেশ। একটা ক্যুরিয়ার খুঁজতে হবে। ছবিগুলো পাঠাতে হবে যে। এটাই আপাতত ওর কাজ। ভাইয়ের মুখটা হঠাৎ মনে পড়ল ওর। ভাইটাকে আর দেখতে পাবে না কোনওদিন। কিন্তু সেটাই বোধহয় ভাল। ভাইয়ের হাসিমুখটা নিয়েই যেতে চায় ও। কোনও প্রিয় বস্তু ওর কাছে গচ্ছিত রেখে, নিশ্চিন্ত ভাইয়ের হাসিমুখ।

সামনেই ক্যুরিয়ার সার্ভিসের একটা দোকান দেখল মহেশ। ও ঢুকল দোকানটায়। একটা মেয়ে বসে আছে কাউন্টারে। ওকে দেখে মেয়েটা নড়েচড়ে বসল, "বলুন।"

মহেশ হাতের প্যাকেটটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা ক্যুরিয়ার করতে হবে।"

মেয়েটা হাতের প্যাকেটটা নিয়ে একটা বড় খামে ঢোকাল তারপর একটা ফেল্ট পেন এগিয়ে দিল মহেশের দিকে। বলল, "ঠিকানাটা লিখে দিন একটু।"

মহেশ আলতো করে খামের ওপর নাম, ঠিকানা লিখল। বেশি জোরে চাপ দিলে ছবির ওপর দাগ পড়ে যেতে পারে। মেয়েটা খামটা নিয়ে একটা স্লিপ লিখল। তারপর বলল, "পনেরো টাকা দিন।" মহেশ টাকাটা বের করে দিল। মেয়েটা আবার বলল, "কাল পৌঁছে যাবে।"

মহেশ হাসল। কাল? তখন ও কোথায়? মহাকালের মাঝে? কেন ক্যুরিয়ার করল ও ছবি দুটো? কেন নিজের ছবি রেখে দিতে চাইল ভাইয়ের কাছে? নিজেই জানে না ও। শুধু এটুকু জানে, এই এক জন পৃথিবীতে রয়ে গেল যে ওকে নিজের কাছে রেখে দেবে সারাজীবন।

এবার বিরিয়ানি খাবে মহেশ। সামনেই একটা দোকান। বোর্ডে লেখা দেখে

BanglaBook.org

ও বুঝল, এখানে বিরিয়ানি পাওয়া যায়। দোকানে ঢুকল মহেশ। শ্বেতপাথরের টেবিল, পুরনো কালচে কাঠের চেয়ার। দোকানটা একটু সাবেক ধরনের। দেখে ভাল লাগল ওর। ছোটবেলায় এরকম দোকানে বাবার সঙ্গে খেতে আসত ওরা। আজকাল তো চারিদিকে গিজগিজ করছে রেস্টুরেন্ট। তাতে রোগা রোগা চেয়ার, টেবিল, উর্দি পরা খয়াটে চেহারার বেয়ারা। দেখলেই আর খেতে ইচ্ছে করে না মহেশের।

একটা ফুল সোয়েটার পরা লোক এগিয়ে এল মহেশের কাছে, "কী খাবেন?"

মহেশ বলল, "বিরিয়ানি, মটন বিরিয়ানি আর মটন পসিন্দা। হবে?"

"দশ মিনিট বসুন।" লোকটা টেবিলে এক গ্লাস জল রাখল।

পকেটে হাত দিয়ে টাকাপয়সা বের করল মহেশ। একশো কুড়ি টাকা আছে। এখানে প্রায় নব্বই টাকার মতো লাগবে। বাকিটা কি তা হলে পকেটে থেকে যাবে? থাকুক।

লোকটার দিয়ে যাওয়া বিরিয়ানি আর মাংস খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেল মহেশ। ওর মনে হল মৃত্যুদণ্ডের আগে নিজেই যেন নিজের শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করে নিল। তা ছাড়া খিদেও পেয়েছিল। আজ অনেক সকালে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। কাল সারারাত ঘুমোতে পারেনি তো, তাই বাড়িতে থাকতে পারছিল না ও। অপরাধবোধ ওকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

খাওয়া শেষে নব্বই টাকা দাম আর দশ টাকা টিপ দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল মহেশ। বুকে একটা হালকা ব্যথা শুরু হয়েছে। সারা সকাল চুপচাপ থেকে বুকের প্রাণীগুলো নড়াচড়া শুরু করেছে এবার। শরীরে খাবার পড়ায় শরীরও নিঝুম হয়ে আসছে। সকাল থেকে এদিক ওদিক ছন্নছাড়া ভাবে অনেক ঘুরেছে মহেশ। আর পারছে না। এবার ওর ঘুম চাই।

পাশে একটা ছোট্ট পানের দোকান। মহেশ সেখান থেকে একটা টক-ঝাল লজেন্স কিনল। আঃ, দারুণ খেতে। প্রায় ছোটবেলার মতো। ঘড়ির কাঁটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে আবার ছোট হয়ে যেতে ইচ্ছে করল মহেশের। মনে হল আবার শীতের রোদের মধ্যে ট্রামের জানলার ধারে বসে বাড়ি ফিরতে। নিমেষের জন্য ওর মনে হল মা তো বসে রয়েছে ওর অপেক্ষায়।

সত্যিই কি মা বসে রয়েছে কোথাও? তারার পর তারা পেরিয়ে, নক্ষত্রের পর নক্ষত্র পেরিয়ে মা তুমি কি বসে রয়েছ? আমার বড় ঘুম পাচ্ছে মা। বড়

BanglaBook.org

ক্লান্ত লাগছে। ঘড়ি দেখল মহেশ, দুটো বাজতে এক। নাঃ, আর না। এবার সময় হল। প্রতাপবাবু ঠিকই বলেছেন, বিশ্বাসঘাতকদের বেঁচে থাকার কী দরকার?

রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল মহেশ। সাঁ-সাঁ করে বাস, ট্যাক্সি ছুটে যাচ্ছে। রাস্তা জুড়ে মানুষের ভিড়। উৎসবের প্রস্তুতিতে কলকাতা জমজমাট। ও দেখল কাজটা সোজা। ওকে শুধু পায়ে পায়ে নেমে গিয়ে দাঁড়াতে হবে চলন্ত কোনও বড় বাসের সামনে। এক মুহূর্তের আলিঙ্গন। তারপর ঘুম।

মাথাটা খুব হালকা লাগছে মহেশের। বুকের কর্কটকুল চঞ্চল হয়ে উঠেছে বড়। কে যেন চোখের সামনের দৃশ্যগুলো ধীরে ধীরে মুছতে শুরু করেছে। ভাসতে ভাসতে মহেশ ফুটপাথের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে দিয়ে অবিরাম গাড়ি যাচ্ছে। বাস, ট্যাক্সি, অটো নানান সব গাড়ি। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, সামনের চলন্ত ট্যাক্সির জানলা দিয়ে একটা মেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। কে মেয়েটা? চেনা চেনা লাগছে? কিন্তু এটাও মাথায় থাকল না আর। শুধু হাওয়া আর মেঘ যেন দখল নিয়ে নিয়েছে মাথার। ডান দিক দিয়ে বিশাল বড় একটা লাল বাস খ্যাপা জন্তুর মতো ছুটে আসছে। মহেশ বুঝল, এই ওর সময়। ও আবার একবার বাঁ দিকে তাকাল। মেয়েটার ট্যাক্সিটা দূরে চলে গেছে। কে মেয়েটা? চেনা লাগছে? আজ সকালে দেখা হয়েছিল না? কিন্তু কিছুই আর স্পষ্ট মনে নেই। মাথার ভেতরটা কেন অবশ হয়ে গেছে। ডান দিক থেকে বাসটা এগিয়ে আসছে ক্রমশ। আর দেরি করা যাবে না। গ্যাস বেলুনের মতো মাথাটা নিয়ে ভাসতে ভাসতে রাস্তায় নামল মহেশ। তারপর বাসের দিকে এগোতে লাগল।

কলকাতায় ওলটপালট হাওয়া দিচ্ছে তখন, সূর্য বাঁক নিচ্ছে, আর পিচ দাপিয়ে ছুটে আসছে রক্তিম এক মৃত্যু।

BanglaBook.org

ইরা ২৪ ডিসেম্বর, দুপুর একটা উনষাট

ট্যাক্সির সিটে ঘুরে বসল ইরা। এতক্ষণ পেছনের কাচ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল ও। ভদ্রলোক ওরকম বিপজ্জনকভাবে রাস্তায় নামছেন কেন? সকালে মামার বাড়িতে তো ভদ্রলোককে দেখল ও। এখানেও দেখে হাত নাড়ল। কিন্তু ভদ্রলোক এমনভাবে তাকালেন যে, কিছু নজরেই পড়ছে না ওঁর। কেমন অদ্ভুত স্থির দৃষ্টি। মানুষটার চোখ দুটো যেন পাথরের হয়ে গেছে।

ট্যাক্সিটা ওই ভদ্রলোককে পার করে আসার পরও ইরা পেছনের কাচ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল ওঁকে। ভাবছিল অমন বিপজ্জনকভাবে রাস্তায় নামছেন কেন উনি? অমনভাবে কেউ রাস্তা পার করে নাকি? কিন্তু এর বেশি আর দেখতে পায়নি। পেছনে একটা পাবলিক বাস এসে ঢেকে দিয়েছে পুরো দৃশ্যটা। ইরা ভাবল ভদ্রলোক কি নেশাগ্রস্ত?

সামনে রাসবিহারী মোড়ের সিগনাল। ভাগ্য ভাল সেটা সবুজ হয়ে আছে। ট্যাক্সিটা বাঁ দিকে বাঁক নিল এবার। হিন্দুস্তান পার্কে যেতে হবে ওকে নেমন্তন্ন করতে। সামনের তিরিশে ডিসেম্বর ওর বাবা মায়ের বিবাহবার্ষিকী। আবার সেইদিন বাবার জন্মদিনও। এ-বছর মা চাইছে চেনাশুনো লোকজনদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে। কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করার দায়িত্ব পড়েছে ইরার ওপর। ইরা তাই বেরিয়েছে আজ।

এই যে বাবা-মায়ের বিবাহবার্ষিকীর নেমন্তন্ন করছে ও, তাতে সবাই ভালভাবে ব্যাপারটা নিলেও মোহনদা কিন্তু টিপ্পনি কাটছিল খুব। এই লোকটাকে দেখলেই ঘেন্না করে ইরার। এমন নোংরা মানুষ ও দেখেনি। ওকে দেখলেই বহু বছর আগের সেই দুপুরের দৃশ্যটা ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে।

ইরা তো বলেছিল মাকে যে, আর সব জায়গাতে গেলেও ওই ভবানীপুরে মোহনদার বাড়িতে ও যাবে না।

মা রাগ করেছিল, বলেছিল, "ওর সঙ্গে কী তোর? ছোট থেকে দেখছি ওকে সহ্য করতে পারিস না তুই। ও কিন্তু তোর সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। দেখ ইরু, তোর জেঠুরা কলকাতায় থাকে না। মোহন আছে। ওকে নেমন্তন্ন না করলে হয়?"

ইরা বলেছিল, "তুমি ফোনে বলে দাও ওকে।"

BanglaBook.org

মা রাগ করে বলেছিল, "এবার বাড়াবাড়ি করছিস তুই। ফোনে কোনওদিন আমরা কাউকে নেমন্তন্ন করি? মোহনের ছুটি আছে আজ। তুই গিয়ে ওকে আর ওর বউকে নেমন্তন্ন করে আয়।"

ইরা তাও গাঁইগুঁই করেছিল, কিন্তু মা শোনেনি। মেজাজ খারাপ করেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ইরা। আটটা নাগাদ আর্চির সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন জায়গায় নেমন্তন্ন করতে করতে সোয়া একটা নাগাদ পৌঁছেছিল মোহনদার বাড়ি।

সকালে আর্চি ওর মাথা গরম করে দিয়েছিল, তারপর মামার বাড়িতে গিয়ে এমন একটা কথা শুনেছিল যে, রাগটা আর কয়েক ধাপ চড়ে গিয়েছিল। অবশ্য বাবার সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত হয়েছে কিছুটা। তবে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নয়। পুরোপুরিটা নির্ভর করছে আজ ঠিক সময়ে আর্চির আসার ওপর।

মোহনদার বাড়িতে ঢোকার সময় স্বভাবতই একটা টেনসড অবস্থায় ছিল ইরা। মোহনদার ফ্ল্যাটটা দোতলায়। বেল বাজতে মোহনদা নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল ওকে। তারপর বলেছিল, "আসুন রানি এলিজাবেথ। এতক্ষণে সময় হল!"

ইরা কোনও উত্তর না দিয়ে মোহনদার স্ত্রী শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বউদি এত রোগা হয়ে গেছ কেন গো?"

শ্রেয়া কিছু উত্তর দেবার আগেই মোহনদা বলেছিল, "আমি খেতে দিই না তো, তাই।"

ইয়ারকির ছলে কথাগুলো বললেও ইরা কিন্তু ভেতরের শ্লেষটা ধরতে পেরেছিল। ইরা বুঝতে পারছিল ও যেমন সেই দুপুরটার কথা ভোলেনি মোহনদাও ভোলেনি।

সেদিন দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল ইরা। অবশ্য বেশিক্ষণের জন্য নয়। কিছু পরে আপনা থেকেই ঘুম ভেঙে যায় ওর। ইরার মনে হয়েছিল একটু ছাদে যায়। মা রোদে যে চালতার আচার রেখেছিল তা একটু টেস্ট করে দেখবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ই কিছু পড়ে যাওয়ার জোরালো শব্দ শুনেছিল ইরা। ও বুঝতে পেরেছিল যে, শব্দটা মোহনদার ফ্ল্যাট থেকে আসছে। ও দৌড়ে উঠে গিয়েছিল মোহনদার ঘরের সামনে। আর তখনই মোহনদার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসা মেহেরের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল ওর। বিস্ময়

BanglaBook.org

আর ভয় মেশানো দৃষ্টিতে ইরা দেখেছিল গোড়ালির কাছে পাজামা জড়ো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে নগ্ন মোহনদা।

মেহেরকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল ইরা। মোহনদাও হাত দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করছিল ওর অর্ধ উদ্ধত পুরুষাঙ্গ। মেহের কাঁদছিল খুব। কোনও কথা বলতে পারছিল না। ইরা ওকে ধরে নিয়ে এসেছিল দোতলায় ওর ঘরে। মেহের কেঁদেই যাচ্ছিল। ইরা ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোকে কী করেছে মোহনদা? আমায় বল।"

মেহের বলেছিল, "পাজামা খুলে ওটা ধরতে বলছিল আমায়... আমার গায়ে হাত দিয়ে নিজের দিকে টানছিল..."

ফোঁপানো মেহেরের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ইরা। এ কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল মোহনদা? এসব জানাজানি হলে তো বিপদ হবে খুব। ও তাকিয়ে দেখেছিল মেহের তখনও ভয়ে কাঁপছে।

ইরা মেহেরকে বলেছিল, "শোন, এই কথাটা কাউকে বলিস না কিন্তু। খুব সমস্যা হবে।"

"বলব না?" কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল মেহের, "আমায় এমন করল তবু কাউকে বলব না ইরাদি? মাকেও না?"

"শোন," মেহেরকে পাশে বসিয়েছিল ইরা, "মোহনদাকে এই বাড়ি থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করছি আমি। তোকে কথা দিলাম, সাত দিনের মধ্যে যদি মোহনদা এই বাড়ি ছেড়ে না যায়, তা হলে সবাইকে তুই বলে দিস ও কী করেছিল।"

"কিন্তু ইরাদি, আমার যে ভয় করছে।" মেহেরের গলাটা খুব বিপন্ন শুনিয়েছিল।

ইরা জড়িয়ে ধরেছিল ওকে, তারপর বলেছিল, "আমায় বিশ্বাস করিস তো তুই? আমি বলছি তোর কিছু হবে না। কোনও ভয় নেই তোর। মোহনদাকে এই বাড়ির থেকে সাত দিনের মধ্যে তাড়িয়ে ছাড়ব আমি। তুই চিন্তা করিস না।"

মেহেরকে নীচে ওর ঘর অবধি পৌঁছে দিয়ে আর এক মুহূর্ত দেরি করেনি ইরা, সোজা উঠে গিয়েছিল তিনতলায়, মোহনদার ঘরে।

খাটের ওপর দু'পায়ের মাঝে মাথা রেখে বসে ছিল মোহনদা। মেঝের ওপর পড়ে ছিল ভাঙা গিটার। যদিও ঘরটায় ঢুকতে গা ঘিনঘিন করছিল ইরার

BanglaBook.org

তবু ও বুঝতে পারছিল যে, এ ছাড়া ওর উপায় নেই কোনও। মোহনদাকে এ-বাড়ি থেকে তাড়াতেই হবে। ওর সেই অল্প বয়সের অভিজ্ঞতা দিয়েই ইরা বুঝেছিল যে, মোহনদা একবার বিফল হয়েছে, কিন্তু যৌনতা এমন জিনিস যে, মানুষকে পশু করে দেয়। মোহনদা আবার সুযোগ বুঝে মেহেরকে ধরবে। এত দিন যাবৎ পিডোফিল শব্দটা শুনেছিল ইরা, এবার নিজের জ্যাঠতুতো দাদার মধ্যে সেই মানসিক রুগিটাকে আবিষ্কার করেছিল ও।

ইরাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তড়িঘড়ি খাট থেকে নামার চেষ্টা করেছিল মোহনদা। ইরা হাত তুলে বাধা দিয়েছিল। বিপন্ন মুখে মোহনদাই প্রথম কথা শুরু করেছিল। ও বলেছিল, 'ইরা, আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর, আমি সজ্ঞানে করিনি কিছু। আমার মাথায় ভূত ঢুকেছিল। আমি ভীষণ অন্যায় করেছি। তুই কাউকে বলিস না প্লিজ। প্লিজ আমায় ক্ষমা করে দে। মেহেরের কাছে গিয়েও আমি আলাদাভাবে ক্ষমা চেয়ে নেব।"

ইরা ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল মোহনদার দিকে। ওর চোখের সামনে ভাসছিল অর্ধ উদ্ধত সেই পুরুষাঙ্গটা। গা গুলোচ্ছিল ইরার। তবু মোহনদাকে কথা বলার সময় দিয়েছিল ও। কিন্তু যেই মোহনদা মেহেরের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেছিল, তখন আর ও ঠিক থাকতে পারেনি। হাত তুলে ও থামিয়ে দিয়েছিল মোহনদাকে। তারপর কঠিন গলায় বলেছিল, "একদম মেহেরের আশেপাশে ঘেঁষবে না তুমি। আর শোনো, আমি চাই না তোমার মতো নোংরা ছেলে আমাদের বাড়িতে থাকে। সাত দিনের মধ্যে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে তুমি।"

"সাত দিন? কিন্তু কোথায় যাব?" মোহনদার গলায় অসহায়তা টের পেয়েছিল ইরা। ও বলেছিল, "জাহান্নামে যাও, আমার জানার দরকার নেই। শোনো, আমি মেহেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়েছি। ও সাত দিন কাউকে কিছু বলবে না। কিন্তু তারপর যদি ও তোমায় এ-বাড়িতে দেখে তা হলে কিন্তু সবাইকে বলে দেবে ও। আর আমি ওকে সেকন্ড করব। তখন বুঝতে পারছ তো কী হবে? জানো তো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের জন্য আজকাল জল কত দূর গড়ায়। যদি ভাল চাও, তা হলে সাত দিনের মধ্যে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। আর খবরদার মেহেরের আশেপাশে ঘেঁষবে না একদম।"

মোহনদা বলেছিল, "কাকু-কাকিমা মানবে আমার চলে যাওয়া? ওদের কী বলে বোঝাব আমি?"

BanglaBook.org

ইরার হাত-পা জ্বালা করছিল খুব। মনে হচ্ছিল, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় জানোয়ারটার গালে। ও চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, "বাবা-মা যদি জানে যে, একটা ছোট মেয়ের পেছনে তুমি ন্যাংটো হয়ে দৌড়োচ্ছ তা হলে সেটা কি মেনে নেবে ওরা? দেখো, ভাল চাও তো কেটে পড়ো। বাবা-মাকে কীভাবে তুমি কনভিন্স করবে সেটা তোমার ব্যাপার। মোট কথা, সাত দিন পর এ-বাড়িতে থাকলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে, বুঝেছ?"

মোহনদা সেদিন আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ইরা শোনেনি। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল মোহনদা। তারপর মেহেররা যত দিন ওদের বাড়িতে ছিল তত দিন আর ওদের বাড়িমুখো হয়নি। মা অবশ্য এক রাতে বলেছিল, "কেন যে মোহনটা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, বুঝলাম না। বন্ধুদের সঙ্গে রুম শেয়ার করে কি এখানের চেয়ে আরামে থাকবে? এত ভাল ছিল ছেলেটা!"

ইরার খুব ইচ্ছে করছিল ভাল ছেলের স্বরূপটা ফাঁস করে দিতে। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছিল ও। শুধু বলেছিল, "যে চলে গেছে যাক না। তুমি অত ভাবছ কেন?"

সেই মোহনদা এখন বড় চাকরি করে এক নামকরা মাল্টিন্যাশনালে। ওর বউ শ্রেয়া খুব ভাল মেয়ে। ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাটটার ভাড়া দেয় ওর অফিস। মোহনদা অফিস থেকে গাড়িও পায়। কিন্তু এখনও ইরা আর মোহনদার মধ্যে অদৃশ্য মেহের ঘোরাফেরা করে। ঘোরাফেরা করে সেই তিনতলার ঘর, সেই নির্জন দুপুর আর শীতকাল। আর ওদের মধ্যে পড়ে থাকে তার-ছেঁড়া ভাঙা একটা গিটার। ইরা কিছুতেই সহজভাবে কথা বলতে পারে না মোহনদার সঙ্গে। মোহনদাও কেমন যেন একটা বাঁকা সুরে কথা বলে সবসময়।

দুপুরে মোহনদার ফ্ল্যাটে গিয়ে তিরিশ তারিখ ইরাদের বাড়িতে যাবার জন্য নেমন্তন্ন করার পরই যেমন মোহনদা বলেছিল, "হঠাৎ এই বয়সে কাকু-কাকিমার বিবাহবার্ষিকীর মতিভ্রম হল? লোকে হাসবে তো।"

"যাঃ, কী বলছ!" শ্রেয়া বাধা দিয়েছিল।

মোহনদা তবু বলছিল, "তা টোপর-মুকুট পরিয়ে বসাবি তো? না কি একদম সাদামাটা?"

ইরা চুপ করে শুনছিল। শ্রেয়া উত্তর দিয়েছিল, "আরে শুধু কি বিবাহবার্ষিকী নাকি? শুনলে না সেদিন কাকুরও জন্মদিন!"

BanglaBook.org

খিকখিক করে গা-জ্বালানো হাসি দিচ্ছিল মোহনদা। বলেছিল, "কাকুর জন্মদিন? এই বয়সে? কী রে মাথায় রঙিন টুপি পরিয়ে, গলায় বিব্ বেঁধে কেক কাটাবি নাকি? সত্যিই যা খেল দেখাচ্ছিস না তোরা!"

আর চুপ করে থাকতে পারেনি ইরা। দুম করে বলে দিয়েছিল, "কে কেমন খেল দেখায় জানা আছে। আমি যদি খেল দেখানো আর মতিভ্রমের কথা তুলি অনেকের পাজামা খুলে যাবে।"

জোঁকের মুখে নুন পড়েছিল যেন। একদম চুপ করে গিয়েছিল মোহনদা। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পরে চলেও গিয়েছিল ভেতরের ঘরে।

শ্রেয়া কিন্তু তা বলে উঠে যায়নি। মেয়েটা এতটা সরল যে, এর ভেতরে যে একটা গন্ডগোল আছে সেটাও বুঝতে পারেনি। ও জোর করে বসিয়ে রেখেছিল ইরাকে। অনেক গল্প করেছিল। ইরার আপত্তি অগ্রাহ্য করে ডিমের অমলেট করেও খাইয়েছে। খুব ধরেছিল দুপুরে ভাত খেয়ে যাবার জন্য, কিন্তু ইরা এটা আর মানেনি। কারণ এখান থেকে বেরিয়ে ওকে যেতে হবে রিনিদির কাছে। রিনিদি বলে রেখেছে, আজ দুপুরে যেন ওর ওখানেই খায় ইরা।

ওদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় ইরা আবার বলেছিল তিরিশ তারিখ যেতে। তারপর শ্রেয়ার কান বাঁচিয়ে চাপা গলায় মোহনদাকে বলেছিল, "ভদ্রভাবে আসতে পারলে আসবে। না হলে এসো না।"

"দিদি, কোন গলিতে বাঁক নেব?" ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথায় সংবিৎ ফিরল ইরার। ও বলল, "সামনের থেকে বাঁ দিকে।"

গাড়িটা বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে এগোনোমাত্র ইরা আবার নির্দেশ দিল, "ওই ডান দিকের হলুদ বাড়িটার সামনে দাঁড়ান।"

গাড়ি থামলে, ও দেখল তেতাল্লিশ টাকা উঠেছে। টাকাটা দিয়ে গাড়ি থেকে নামল ও। এখানে একটা-দেড়টা নাগাদ আসবে বলেছিল ইরা। এখন প্রায় সোয়া দুটো বাজে। রিনিদি নিশ্চয়ই রাগ করেছে। তাই একবারও ফোন করে খোঁজ নেয়নি। ইরা ব্যাগের থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল।

আরে স্ক্রিন সাদা কেন? এই রে চার্জ চলে গেছে বোধহয়। তাই কি রিনিদি ফোন করেও পায়নি! ও ব্যাগটা তন্নতন্ন করে খুঁজল। এমনই কপাল চার্জারটাও আনেনি সঙ্গে করে। এখন কী হবে? যাক গে, রিনিদির কাছে যদি চার্জার থাকে তা হলে চার্জ দিয়ে দেবে ফোনটা। ও এগিয়ে গিয়ে কলিং বেল টিপল।

BanglaBook.org

দরজা খুলেই হইহই করে উঠল রিনিদি, "আরে কোথায় ছিলি তুই? কখন থেকে তোকে ফোন করছি। লাইন পাচ্ছিলাম না। সুইচ অফ করে রেখেছিলি নাকি? ক'টা বাজে দেখেছিস? খিদে পায়নি তোর? এত দেরি হল কেন? কোনও সমস্যা হয়েছিল?"

ইরা ঘরে ঢুকে ব্যাগটাকে সামনের টেবিলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, "এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়? তার চেয়ে তাড়াতাড়ি খেতে দাও রিনিদি, তাড়া আছে।"

"তাড়া? কেন? ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস?"

"না গো তিনটের সময় কাজ আছে একটু। ভীষণ দরকারি। প্লিজ খেতে দিয়ে দাও এবার। আর, ভাল কথা, তোমার কাছে মোবাইলের চার্জার আছে। আমার মোবাইলের ব্যাটারিটা গেছে।"

"চার্জার?" রিনিদি এ-দিক ও-দিক তাকাল। তারপর বলল, "তুই হাতটা ধুয়ে বস আমি আনছি।"

ইরা বাড়ির সবটা চেনে। মাঝে মাঝেই এখানে আসে ও। রিনিদি ওর নিজের দিদি নয়। রবীন্দ্রসংগীত শেখার সময় আলাপ হয়েছিল। তাও অনেক বছর হল। ইরা ভাবে নিজের দিদি থাকলেও বোধহয় তার সঙ্গে এত ভাল সম্পর্ক হত না ওর।

হাত ধুয়ে, মুখে জল দিয়ে ঘরে এসে ইরা দেখল রিনিদি চার্জার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও হাত বাড়িয়ে চার্জারটা নিয়ে বলল, "এ মা এতে তো হবে না। তোমাদের এই চার্জারটা তো ফিট করবে না আমার মোবাইলে।"

"এই রে কী হবে তা হলে?" চার্জারটা ফেরত নিয়ে জিজ্ঞেস করল রিনিদি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইরা। এখনই এটা হতে হল? ও বলল, "যাক গে, খেতে দিয়ে দাও।"

খাওয়ার টেবিলে গিয়ে অবাক হয়ে গেল ইরা। ও বলল, "এত কিছু কে খাবে? আরও কেউ আসছে নাকি?"

রিনিদি বলল, "এত কিছু কোথায়? মোটে তো চারটে পদ। চুপ করে বসে খা তো, পাকামো করতে হবে না। এই যে পি এইচ ডি করবি বলে লাফাচ্ছিস, ভাল করে না খাওয়া-দাওয়া করলে পড়াশুনো করার শক্তি পাবি গায়ে? বস।"

রিনিদি কাঁধ ধরে জোর করে বসিয়ে দিল ওকে। তারপর ওর সামনে রাখা চৌকো কাচের প্লেটটা সোজা করে তাতে ফ্রায়েড রাইস বাড়তে লাগল।

BanglaBook.org

ঘটনাটা সত্যিই। ইরা পি এইচ ডি করবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও কাজ শুরু করে উঠতে পারেনি। তবে তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারল না ও।

ইরা বুঝল শ্রেয়ার খাওয়ানো অমলেটটা ওর খিদেটাকে মেরে দিয়েছে। এখানে খাওয়ার নেমন্তন্ন আছে বলেই তো খেতে চায়নি ও। কিন্তু মেয়েটা এমন জোর করল! ও জানে রিনিদি দারুণ রান্না করে। কিন্তু কী করবে? খিদেটা তেমন নেই যে। অবশ্য এজন্য শুধু অমলেটকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ওর ভেতরে যে-টেনশনটা পাক মারছে সেটাও কিছু খেতে দিচ্ছে না ওকে।

ফ্রায়েড রাইসের ভেতরে আঙুল চালাতে চালাতে ইরা ভাবল আজ ঠিক সময়ে এসে পৌঁছোবে তো আর্চি? দু'-দু'বার বাবার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করেছে ও। আজকেই শেষ সুযোগ। ওর ইচ্ছে হল রিনিদির মোবাইল থেকে একটা ফোন করে আর্চিকে। একবার খোঁজ নিয়ে দেখে কোথায় আছে ও। একবার জিজ্ঞেস করে, ঠিক সময়ে আসছে তো? কিন্তু নিজেকে সামলাল ও। কেন প্রতিবার ও যাবে নিজের থেকে? আর্চির কোনও দায়িত্ব নেই? কোনও কমিটমেন্ট নেই ওর তরফ থেকে? সব কি একতরফা ইরাকেই করে যেতে হবে? যদি আজ আর্চি ঠিক সময়ে না আসে তা হলে ও সত্যি সত্যিই আর কোনও যোগাযোগ রাখবে না ওর সঙ্গে। তাতে মা তিরিশ তারিখ সবার সামনে যা খুশি বলুক, ও মেনে নেবে।

"কী রে কিছুই খাচ্ছিস না যে? খারাপ হয়েছে?" ইরা দেখল খাওয়া থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে রিনিদি। ও বলল, "না না ভালই হয়েছে।"

"তা হলে? মন খারাপ? কাকিমা আবার বিয়ে নিয়ে ঝঞ্ঝাট করছে নাকি?"

ইরার মনে পড়ে গেল আজ মামার বাড়ি থেকে বেরোবার পর ওর সঙ্গে বাবার কথোপকথন।

ও বলল, "না গো, বোধহয় অম্বল হয়ে গেছে। তাই ভাল লাগছে না। গা গুলোচ্ছে।"

রিনিদি হাসল, "বিয়ের আগেই গা গুলোচ্ছে?"

ইরাও হাসল এবার, "ধ্যাত, খালি বাজে কথা, না? তা নিখিলদা কই?"

"কোথায় আর, অফিসে। বললাম তুই আসবি, ছুটি নাও। বলে কিনা অফিসে বিদেশিরা আসছে। ওকে যেতেই হবে।"

ইরা জানে নিখিলদা খুব বড় চাকরি করে। রিনিদির সঙ্গে বিয়ের দিনও

BanglaBook.org

নাকি অফিস করেছিল নিখিলদা। লোকটা কাজপাগল। ও জিজ্ঞেস করল, "আর সুগত? ও কোথায়? অফিসে?"

"আর অফিস!" রিনিদি বাঁ হাত দিয়ে ওর পাতে মাংস দিয়ে বলল, "সে আজ সকালবেলা বন্ধুদের সঙ্গে ডুয়ার্স গেছে। পুরো রাস্তাটা গাড়িতে যাবে। কেমন ছেলে জানিস? আজ খুব ভোরে আমায় ঘুম ভাঙিয়ে বলছে ওকে নাকি সকাল দশটায় বেরোতে হবে। অফিসের থেকে তো উর্নি এসে হাজির। মেয়েটা কাজ করে ওদের সঙ্গে। শুনলাম অফিসেও নাকি কী সব দরকারি কাজকর্ম ফেলে এসেছে ও। এই সুগতকে নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা। ওকে বললে বলে আর্টিস্টরা নাকি এরকমই হয়। তোর নিখিলদা তো বলে, 'তোমার ভাইয়ের কিচ্ছু হবে না। যার ডিসিপ্লিন নেই তার কিচ্ছু নেই।' আমি কী করি বল তো?"

ইরা এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে ভাবল বাবাও এরকম কথা বলেছিল একবার। আর্চির সত্যিই কোনও ডিসিপ্লিন নেই। ভীষণ অগোছালো ছেলে। এই যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তিনটে অবধি আর্চি না এসে পৌঁছোলে আর্চির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না ও, সেটা কি খেয়াল আছে আর্চির? গা-টা আবার গুলিয়ে উঠল। একবার ওয়াক তুলল ইরা।

"কী রে সত্যি শরীর খারাপ লাগছে? আর খেতে হবে না, ওঠ, ওঠ।" রিনিদি চেয়ার থেকে উঠে বাঁ হাত দিয়ে ইরাকে টেনে তুলল চেয়ার থেকে। বলল, "নে, হাত ধুয়ে নে। একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে নিস। ঠিক হয়ে যাবি।"

ইরা উঠে পড়ল। মনে মনে ধন্যবাদ দিল রিনিদিকে। সত্যিই আর খেতে পারছিল না ও। কষ্ট হচ্ছিল। পেটের ভেতরে যেন এক পাহাড় প্রজাপতি উড়ছে। আর্চি ঠিক আসবে তো?

ইরা বাইরের ঘরে এসে চেয়ারে বসল। দুটো চল্লিশ বাজে। রিনিদি ছোট্ট কাপে করে একটা ওষুধ এনে বলল, "খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। ভাল লাগবে।" কাপটা নিয়ে গলায় ঢালামাত্র গলা জ্বলে গেল ওর। ওরে বাবা, এ ওষুধ না অ্যাসিড? ইরা মুখ বিকৃত করে বলল, "ভাল করে খেলাম না বলে শেষ পর্যন্ত বিষ দিলে?"

"মারব এক থাপ্পড়, ইয়ারকি হচ্ছে?" রিনিদি হেসে সামনে বসল।

ইরা টেবিল থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, "এবার আসল কথায় আসি। শোনো, তিরিশ তারিখ সন্ধেবেলা তুমি আর নিখিলদা আমাদের বাড়ি আসবে।

BanglaBook.org

বাবা-মায়ের বিবাহবার্ষিকীর সঙ্গে সে-দিন বাবার জন্মদিনও।" ইরা তৃতীয় ঘটনাটা আর বলল না। ওটা হলে ভাল হবে না মোটেই। তবে তৃতীয় ঘটনাটা ঘটবে কি না সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আজ আর্চির ওপর।

ইরা উঠল এবার। ঘড়ির কাঁটা পৌনে তিনটে পার হচ্ছে। এখান থেকে অটো করে প্রিয়া সিনেমার সামনে চলে যাবে ও। ইরা বলল, "আজ আসি গো রিনিদি। একটু তাড়া আছে।"

"কোথায়, যাবি কোথায়?"

"একটু প্রিয়া সিনেমার সামনে যাব।"

"মানে দেশপ্রিয় পার্ক? আরে সেখানে তো আজ মিছিল না কী সব আছে। সাবধানে যাস। জানিসই তো আজকাল মিছিল-টিছিলে কেমন গন্ডগোল হয়।"

তাই তো, আজ মিছিল আছে। এটা তো মনে ছিল না ওর। এই রে আর্চি আসতে পারবে তো তা হলে? ইরা নার্ভাস হয়ে রিনিদির দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর "ঠিক সময়ে চলে যেয়ো কিন্তু" বলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

হিন্দুস্তান পার্কের এই রাস্তাটা খুব নির্জন। দু'দিকে শুধু বড় বড় বাড়ি আর তাদের দেওয়ালের ওপর দিয়ে উঁকি দেওয়া নানা রকম ফুলগাছ। ইরা একবার আকাশের দিকে তাকাল। ধূসর রঙের প্লাস্টিক কে যেন টাঙিয়ে দিয়েছে কলকাতার মাথায়। আজ হাওয়া দিচ্ছে খুব। সকাল থেকেই দিচ্ছিল, কিন্তু এখন যেন বেড়েছে হাওয়ার বেগটা। জ্যাকেটের চেনটা গলা অবধি টেনে দিল ইরা।

বড় রাস্তা দিয়ে ফাঁকা অটো যাচ্ছিল একটা। ইরা হাত তুলে থামাল সেটাকে। অটোর চালক বলল, "দিদি, প্রিয়া সিনেমা অবধি গাড়ি যাচ্ছে, তারপর আর যেতে দিচ্ছে না।"

ইরা উঠে বসল অটোয়, বলল, "আমি প্রিয়া অবধিই যাব, চলুন।"

তিনটে বাজতে পাঁচে প্রিয়ার উলটো দিকের ফুটপাথে নামল ইরা। তারপর রাস্তা পার হয়ে গিয়ে দাঁড়াল প্রিয়ার সামনে।

এখানে খুব ভিড় এখন। সিনেমার শো শুরু হওয়ার সময় বলেই বোধহয়। একটা কোনা করে দাঁড়াল ইরা। চারিদিকে নানান রঙের মানুষ। সামনের দেশপ্রিয় পার্কের ভেতরের কিছুটাও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। সেখানে প্রচুর লোক জমা হয়েছে। মাইক নিয়ে চিৎকার করে কিছু বলা

BanglaBook.org

হচ্ছে। তবে বোঝা যাচ্ছে না স্পষ্ট। কিছু মাতব্বর গোছের লোক সামনের মেন রোডে লাঠি হাতে ঘুরছে। এরাই যানবাহন আটকাচ্ছে। ঘড়ি দেখল ইরা, তিনটে বাজতে দু'মিনিট বাকি। আর্চি কই? যদি গড়িয়াহাটের দিক থেকে আসে তা হলে কোনও ব্যাপার নেই। কিন্তু যদি রাসবিহারী মোড়ের দিক থেকে আসে? তা হলে? তা হলেই তো বিপত্তি। ইরা মনে মনে বলল, তবু আর্চিকে প্রমাণ করতে হবে ওর সিনসিয়ারিটি।

পাশে খচমচ শব্দ হওয়ায় ইরা দেখল ওর থেকে হাত পাঁচেক দূরে, ফুটপাথে, একটা নেড়া মাথার লোক বসে রয়েছে। লোকটার গায়ে শতছিন্ন একটা চাদর। লোকটা খুব গম্ভীরভাবে একটা পুরনো খবরের কাগজের পাতা উল্টোচ্ছে। আরে, এই লোকটার ছবিই সকালবেলায় তুলছিল না আর্চি? ভাল করে দেখল ইরা। হ্যাঁ, তাই তো, এই তো লোকটা।

ইরা এবার অন্য দিকে তাকাল। দেশপ্রিয় পার্কের ভেতরে লোক বেড়েছে আরও। আর সবাই মিলে বড় লাইন করে প্ল্যাকার্ড তুলে এগোচ্ছে পার্কের গেটের দিকে। মিছিল শুরু হল। মাইকে স্লোগান ফেটে পড়ছে ঘনঘন। কিন্তু আর্চি কই? এ-দিক ও-দিক তাকাল ইরা। একটু দূরে অদ্ভুত গোলাপি রঙের একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্য সময় হলে হয়তো অদ্ভুত রঙের গাড়িটা দেখে ওর প্রতিক্রিয়া হত। কিন্তু এখন যেন আমলই দিল না ও।

ঘড়ি দেখল ইরা। ঠিক তিনটে বাজে। আর্চি তুমি কই? তবে কি মা-ই ঠিক? তবে কি তুমি ইরেসপন্সিবল? প্রেমের দাম নেই তোমার কাছে? এ-দিক ও-দিক তাকাল ইরা। কী করবে ও? আর্চি কি আজও আসবে না? তবে কি আর্চি সত্যি ওকে নিয়ে সময় কাটাচ্ছিল? ইরা দেখল মিছিলটা প্রায় পৌঁছে গেছে পার্কের গেটে। আর্চি এল না তা হলে?

প্রথম সূত্র সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্বিতীয় সূত্র

ইরা ২৪ ডিসেম্বর, সকাল সোয়া আটটা

"শোনো ইরা, প্লিজ রাগ কোরো না। শোনো..."

ইরা কঠিন গলায় বলল, "ঠিক তিনটে, প্রিয়ার সামনে।"

আর্চিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ইরা জোরে হাঁটতে লাগল। সামনে একটা এসডি-ফোর বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইরা সোজা গিয়ে উঠে পড়ল বাসটায়। লেডিস সিটটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। সেখানে গিয়ে বসল ও। সত্যিই, আর্চি ইনকরিজিবল। ও পাগলের মতো কথা বলে যাচ্ছিল, আর আর্চি? কখনও বিস্কিট খাচ্ছে, কখনও ক্যামেরা নিয়ে ভিখিরিদের ছবি তুলছে। এ ছেলেটা সত্যিই এত ক্যাজুয়াল যে, মাঝে মাঝে আর পারা যায় না। কী ভাবে ও? সবটাই ইয়ারকি? সবটাই কি বাচ্চাদের খেলা? এই যে বাবা আজ আর্চির সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে, তার জন্য কি কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ওকে? এসব বোঝে না কেন ও? দিনকে দিন ওর ক্যালাসনেস যেন বাড়ছে।

বাসটা ছেড়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ থেকে এস পি মুখার্জি রোডের দিকে বাঁক নিল। জানলার পাশে বসে ইরা দেখল ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ভীষণ বিরক্ত মুখে কার সঙ্গে জানি ফোনে কথা বলছে আর্চি। ইরা, যতক্ষণ পারা যায় তাকিয়ে রইল, কিন্তু আর্চি একবারও তাকাল না বাসের দিকে।

গতকাল থেকে মন খারাপ হয়ে আছে ইরার। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। আজকের বিকেলটার ওপর জীবনের অনেক কিছুই নির্ভর করছে ওর। অনেক বার আর্চিকে ক্ষমা করে দিয়েছে ইরা। কিন্তু আর নয়। আজ যদি এক মিনিটও দেরি করে তা হলে আর আর্চির সঙ্গে সম্পর্ক নয়। ভীষণ রাগ হচ্ছে ইরার। ছেলেটা কি একটুও সিরিয়াস নয়! সত্যিই ওকে ভালবাসে তো?

BanglaBook.org

বাসের জানলা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসছে একটা। দুর্বল রোদ সেই হাওয়া ভেঙে এখনও নিজের গুরুত্ব বোঝাতে পারেনি। ইরা দেখল পেছনের গেটের রোগা মতো কনডাক্টরটা এগিয়ে এল ওর দিকে, "দিদি, টিকিট"।

ইরা বলল, "নিউ আলিপুর, গোল চক্করটার ওখানে।"

ইরার বাড়িয়ে দেওয়া কুড়ি টাকার নোটটা দেখে ভুরু কোঁচকাল লোকটা। বিরক্ত গলায় বলল, "সকালবেলাতেই এত বড় নোট দিলেন? খুচরো কোথায় পাব?"

"বড় নোট মানে?" ভুরু কুঁচকে গেল ইরার, "কুড়ি টাকা বড় নোট?"

"আপনারা বড়লোক, আপনাদের কাছে এটা ছোট হলেও আমাদের কাছে বড়। আপনি খুচরো দিন।"

ইরা শক্ত মুখে বলল, "খুচরো নেই। ওখান থেকেই টিকিট দিন।"

"আচ্ছা মুশকিল", লোকটা হঠাৎ গলা চড়াল, "খুচরো না দিতে পারলে নেমে যান, যত্ত সব।"

"মানে? হোয়াট ননসেন্স?" ইরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে মনে ঠিক করল আর একটা বাজে কথা বললে ও থাপ্পড় মারবে লোকটাকে। রাগটা আর আয়ত্তে থাকছে না ওর।

কিন্তু অত অবধি আর গড়াল না ঘটনাটা। সামনের গেটের বয়স্ক কনডাক্টরটা এসে কুড়ি টাকার নোটটা ছিনিয়ে নিল লোকটার হাত থেকে। তারপর টিকিট কেটে, বাকি টাকাটা টিকিট সমেত ফেরত দিল ইরার হাতে। লোকটা বলল, "দিদি কিছু মনে করবেন না। ভুল হয়ে গেছে।"

ইরা একবার কটমট করে তাকাল রোগা কনডাক্টরটার দিকে, তারপর জানলা ঘেঁষে বসে পড়ল আবার।

ফালতু ঝামেলা, ইরা ভাবল, আজকাল দিনগুলো যা যাচ্ছে তাতে গন্ডগোল ছাড়া আর কোনও ঘটনাই নেই। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো পেরিয়ে ছুটে চলেছে বাস। রাস্তায় লোকজন বাড়ছে আস্তে আস্তে। এই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহটা এলেই বাবার ভেতরে কেমন একটা ছুটির আমেজ চলে আসে। মানুষ শ্লথ হয়ে পড়ে, তারা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। ঘুম চোখে তাকিয়ে থাকে কলকাতার দিকে। গাড়ি ভরতি করে থালাবাসন বাজিয়ে যায় পিকনিক করতে। ব্যস্ততা আর দায়িত্বের টানটান

BanglaBook.org

সুতোটা কেমন যেন ঢিলে হয়ে যায় হঠাৎ। কাজের দিক থেকে মনটা ঘুরে যায়। এ-সময়টা বড় আলসে করে দেয় মানুষকে। ছোটবেলার কথা মনে আছে ইরার। এ সময় পরীক্ষা শেষ হয়ে যেত ওদের। বাবা ঘুরতে নিয়ে যেত নানা জায়গায়। পিকনিকেও বহু বার গেছে বছরের এই সময়টায়। শীতকাল বরাবর প্রিয় ইরার। বিশেষ করে ডিসেম্বরের এই শেষ সপ্তাহের শীতটুকু। ওর মনে পড়ল এরকম একটা শীতের দিনেই তো আলাপ হয়েছিল আর্চির সঙ্গে। দিনটা এখনও মনে আছে ওর, একত্রিশে ডিসেম্বর।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একটা ফ্লাওয়ার শো-তে গিয়েছিল ইরা। এসব শো-টো যে ওর খুব একটা ভাল লাগে তা নয়, কিন্তু যেতে হয়েছিল, ও ভেবেছিল, গিয়ে অন্তত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মজা তো হবে।

চারিদিকে নানা মাপের, নানা ধরনের ফুল সাজানো। চেনাশুনো ফুল ছাড়াও অচেনা অনেক ফুল রাখা ছিল সেখানে। প্রতিটা ফুলের পরিচিতি, তাদের ল্যাটিন নাম, ইত্যাদি নানান তথ্য লিখে ফুলগুলোর পাশে পাশে টাঙানো ছিল।

ইরা সাজানো ফুলের ভেতর দিয়ে একা একাই হাঁটছিল। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে, পড়ে নিচ্ছিল ওইসব ছোট ছোট ফুলের বৃত্তান্ত। অনেক লোকের মাঝে বেশ কয়েক জন ফোটোগ্রাফারও ছিল। অনবরত তাদের শাটার টেপার শব্দ আসছিল আশপাশ থেকে।

খানিকক্ষণ এখানে ওখানে ঘোরার পর, ওর মনে হতে লাগল কে যেন ওকে লক্ষ করছে। এক জোড়া চোখ যেন অনবরত পেছনে পেছনে ফলো করে যাচ্ছে ওকে। দু'-একবার এ-দিক ও-দিক তাকালেও ও বুঝতে পারছিল না কে লক্ষ করছে। তারপর হঠাৎ একবার মুখ তুলেছিল ও আর তখনই দেখেছিল ঘটনাটা।

একটা ছেলে ওর দিকে ক্যামেরা তাক করে ছবি তুলছে। এ কী অসভ্যতা! ওকে না জিজ্ঞেস করে ছবি তুলছে কেন? ভীষণ রাগ হয়ে গিয়েছিল ইরার। ও দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল ছেলেটার দিকে। ওকে অমন মারমুখিভাবে আসতে দেখেও ছেলেটা ঘাবড়ে না গিয়ে একটার পর একটা স্ন্যাপ নিচ্ছিল। ক্যামেরার খচ খচ শব্দটা কাঁটার মতো বিঁধছিল ওর মাথায়। আচ্ছা বেয়াড়া ছেলে তো!

ছেলেটার কাছে গিয়ে ইরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যামেরাটা কাড়তে

BanglaBook.org

গিয়েছিল ওর। কিন্তু ছেলেটা চট করে সরে গিয়ে বলেছিল, "সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান মেগা পিক্সেল ক্যামেরা। খুব কস্টলি, প্লিজ হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার।"

ইরার মাথা আরও গরম হয়ে গিয়েছিল, ও চিৎকার করে বলেছিল, "হাউ ডেয়ার ইউ টেক মাই পিকচার! কাকে বলে তুমি ছবি তুলছ আমার?" কোনও আপনি-টাপনির ধার ধারেনি ইরা।

"কাউকে বলিনি তো। আর তোমার গায়ে তো লেখা নেই— ফোটোগ্রাফি প্রোহিবিটেড। আমার ভাল লাগল, তাই তুললাম।"

"ভাল লাগল?" রাগে বিস্ময়ে কথা হারিয়ে ফেলছিল ইরা।

"হ্যাঁ, ভালকে খারাপ বলব কোন যুক্তিতে?"

ছেলেটার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল ইরা। ও কি বুঝতে পারছে না যে, একটা ভীষণ গর্হিত কাজ করেছে? না বলে অন্যের ছবি তোলা চুরি করার সমান। একে কি বাবা-মা শিক্ষা দেয়নি? ইরা বলেছিল, "এখনও এত কথা বলছ? অশিক্ষিত নাকি?"

"খানিকটা তাই। ইংলিশে অনার্স করার পর আর পড়াশুনো করিনি। এই থার্ড আই-টা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।"

"আমি জানতে চেয়েছি? জানতে চেয়েছি এত কথা?" ইরা চিৎকার শুরু করেছিল।

ছেলেটা হাসতে হাসতে বলছিল, "কী জানি? মনে তো হচ্ছে জানতে চেয়েছ। বাই দ্য ওয়ে আমি অর্চিষ্মান, কমপ্রেস করে আর্চি। তুমি?"

ইরা মাথা ঘুরিয়ে দেখেছিল আশেপাশে বেশ কিছু লোক জমা হয়ে গেছে। বন্ধুরাও চলে এসেছে পাশে। ও শেষ চেষ্টা করেছিল, "তুমি আর্চি না অ্যাস্টেরিক্স না টিনটিন তা জেনে আমার লাভ?"

এবার ইরার পাশ থেকে ওর বান্ধবী পলি বলেছিল, "আপনি না বলে ছবি তুলছেন কেন? জানেন আপনাকে পুলিশে দিতে পারি?"

আর্চি ঠান্ডা গলায় বলেছিল, "তা পারো তোমরা, তবে তার আগে দেখে নাও কেমন ছবি উঠল।" বলেই পাশে রাখা মোটা ব্যাগটা খুলে একটা ল্যাপটপ আর ছোট বাক্স মতো জিনিস বার করেছিল।

ইরা বলেছিল, "দেখব না ওসব। আমরা কেউ দেখতে চাই না।"

আর্চি হেসেছিল, "তুমি দেখো না কিন্তু অন্যদের দেখতে দাও।" তারপর ইরার বন্ধুবান্ধবদের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "তোমরা দেখবে তো?"

BanglaBook.org

বন্ধুরা কী উত্তর দিয়েছিল তা আন্দাজ করার জন্য কোনও পুরস্কার নেই।

একটু দূরের একটা টেবিলে ল্যাপটপটা রেখে সেটাকে চালু করেছিল আর্চি। তারপর একটা তার দিয়ে ছোট বাক্সটা কানেক্ট করেছিল ল্যাপটপের সঙ্গে। এরপর ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে তার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট চৌকো চ্যাপটা মতো মেমরি স্টিক বের করে গুঁজে দিয়েছিল ওই বাক্সটায়। কম্পিউটার স্ক্রিনে ডাকটিকিট মাপের প্রায় দশ-বারোটা ছবি ভেসে উঠেছিল। সবক'টাই ছিল ইরার। আর্চি, ল্যাপটপের টাচ প্যাডে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে একটা একটা করে ছবি বড় করে দেখাচ্ছিল ওদের। দেখব না দেখব না করেও ইরা দেখেছিল ছবিগুলো। ফুলের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নেওয়া ওর ছবি। ইরা কোনওদিন নিজের এতটা ন্যাচারাল আর সুন্দর ছবি দেখেনি।

পলি তো বলেই ফেলেছিল, "ইরা তোকে তো দারুণ লাগছে দেখছি। এত সুন্দর ছবি তুলেছে তোর, আর তুই রাগ করছিস?"

সবার মধ্যে দাঁড়িয়েও, শুধু ইরা শুনতে পায়, এমন গলায় আর্চি বলেছিল, "আমি তেমন তুলতে পারিনি। দ্য সাবজেক্ট ইজ মোর বিউটিফুল।"

ছবিগুলো দেখার সময়ই রাগ চলে গিয়েছিল ইরার। আর এই শেষের কথাটায় হঠাৎই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল ওর। রোদের রংটা পালটে গিয়েছিল যেন। ফুলগুলোর পাপড়ি যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। আশপাশের সমস্ত কোলাহল যেন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল নিমেষের মধ্যে।

ফ্লাওয়ার শো থেকে বেরোবার সময় আর্চি জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমার ছবিগুলো পৌঁছে দেব কী করে?"

ইরা খুব নরম স্বরে নিজের মোবাইল নম্বরটা জানিয়ে দিয়েছিল ওকে।

এরপর দিন চারেকের মাথায় ফোন করেছিল আর্চি। ইরা ওকে বিকেলের দিকে সময় দিয়েছিল দেখা করার। সেদিন মাত্র দুটো ছবি সঙ্গে করে এনেছিল আর্চি। তারপর ইরার অবাক মুখ দেখে কাঁচুমাচু হয়ে বলেছিল, "বাকিগুলো আনতে ভুলে গিয়েছি। আর এক দিন যদি..."

আর এক দিনও সময় দিয়েছিল ইরা। সেদিনও মাত্র দুটো ছবি নিয়ে এসেছিল আর্চি। এরকম করে ছ'দিনের দিন ও বলেছিল, "সব ছবি তো দিয়ে দিলাম, এবার?"

ইরা মুখ টিপে হেসে বলেছিল, "আমি সব ছবি ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। পরের দিন আবার প্রথম থেকে শুরু কোরো।"

BanglaBook.org

আর্চি এগিয়ে এসে হাত ধরেছিল ওর। আর গঙ্গার ধারে অল্প হাওয়া, নেমে আসা সন্ধে আর বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর জ্বলে ওঠা আলোর সামনে ইরা আলতো করে মাথা রেখেছিল আর্চির বুকে। আর্চি নিচু স্বরে বলেছিল, "দিস ইজ আ কোড্যাক মোমেন্ট, দ্য মোমেন্ট অব মাই লাইফ।"

কথাটা সত্যি কি না কে জানে? মাঝে মাঝে মনে হয় আর্চির জীবনে ও ছাড়া আর কেউ নেই। আবার মাঝে মাঝে আর্চিকে চিনতে পারে না ও। ইদানীং এই দ্বিতীয় ব্যাপারটাই যেন বেশি করে মনে হচ্ছে ইরার।

আর্চির কথা মাকে বলায়, মা প্রথমে খুব রাগারাগি করেছিল। কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনা করে মাকে রাজি করিয়েছিল ইরা। মা তখন বলেছিল, "এবার তোর বাবাকে বল, ও যদি না করে দেয়, তা হলে কিন্তু আমি তোর জন্য ছেলে দেখব।"

বাবা না করেনি। বলেছিল, "তুই যখন পছন্দ করেছিস, আমি জানি সে ভাল হবেই। আর এখনকার দিনে ফোটোগ্রাফি ইজ আ ভেরি গুড প্রফেশন। তুই ওকে নিয়ে আয় একদিন।"

"কবে আনব?" উজ্জ্বল মুখে প্রশ্ন করেছিল ইরা।

অক্টোবরে একটা দিন সময় দিয়েছিল বাবা। আনন্দে লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরোবার সময় ইরা দেখেছিল মায়ের মুখটা গোমড়া হয়ে আছে। অর্থাৎ মা সত্যি সত্যি রাজি হয়নি তা হলে!

কিন্তু দিনটা মিস করেছিল আর্চি। বাবা অপেক্ষা করতে করতে সামান্য বিরক্ত হয়েছিল আর সেই সুযোগে মা নিজের অপছন্দের ব্যাপারটা জানিয়ে রেখেছিল। আর্চি যে ইরেসপনসিবল এবং ইরাও যে ভুল পছন্দ করেছে, সেটা বিভিন্ন ভাবে বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল মা। কিন্তু আর্চি যে অমন নয়, সেটা কী করে বোঝাবে ইরা? ওর টেনশন হয়েছিল খুব। বাবা আবার মায়ের কথায় কনভিন্সড হয়ে যাবে না তো? আর্চির সঙ্গে বাবার দেখা হওয়াটা খুব জরুরি। তাই অনেক বলেকয়ে ইরা নভেম্বরের আর একটা দিন আর্চির সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজি করিয়েছিল বাবাকে। বাবা রাজিও হয়েছিল। কিন্তু সে-দিনও বাবা সারাটা সকাল ঠায় বসে থাকলেও আর্চির টিকিও দেখা যায়নি। বাবাও এবার রেগে গিয়েছিল ভীষণ। আর মা তাতে ঘি ঢেলেছিল ক্রমাগত। সেদিন এয়ারপোর্টে আর্চির সঙ্গে মিনিট পনেরোর জন্য দেখা করেছিল ইরা। একটা কথাও ওকে বলতে দেয়নি সেদিন। যা খুশি বলে অপমান করেছিল আর্চিকে। আর্চি মাথা নত করে শুনেছিল শুধু।

BanglaBook.org

রাত্রে নিজের ঘরে শুয়ে খুব কেঁদেছিল ইরা। ভেবেছিল আর্চি কত দূর চলে গেল। সেই কাশ্মীর। ওকে এভাবে না বললেই পারত কথাগুলো। কিন্তু এই যে ওর দুঃখ হচ্ছে, সেটুকুও কি বোঝে আর্চি? তাই কাশ্মীরে আর ওকে ফোন করেনি ইরা।

এর পরের এক মাস মা পাগলের মতো পাত্র দেখেছে ওর জন্য। অবশেষে মিলন সেন নামে এক ডাক্তার পাত্রকে পছন্দ হয়েছে মায়ের। বাবা অবশ্য এখনও কোনও কংক্রিট মতামত দেয়নি। তবে মা ফুল সুইংয়ে মিলন সেনের হয়ে ক্যাম্পেন করে যাচ্ছে বাবার কাছে। কে জানে বাবা কী ভেবে রেখেছে?

কুড়ি তারিখ যে আর্চি ফিরছে, সেটা ও জানত। আর্চি দু'বার ফোনও করেছিল ওকে। কিন্তু ও কোনও ফোনই রিসিভ করেনি। তারপর গতকাল সকালবেলা সাহসে ভর করে বাবার কাছে গিয়েছিল ও। অনেক অনুনয় করে বাবাকে আর একবার চান্স দিতে বলেছিল আর্চিকে। ও বলেছিল, "দেখো, এবার নিশ্চয়ই আসবে ও।"

বাবা গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিল, "তুমি এত করে বলছ যখন তখন ঠিক আছে, কাল বিকেল ঠিক সোয়া তিনটের সময় আমার অফিসে নিয়ে এসো ওকে। তবে আমার মনে হচ্ছে হি ইজ নট সিরিয়াস অ্যাবাউট ইউ। শোনো, এবার যদি তোমার আর্চি না ম্যানড্রেক, না আসে তা হলে মায়ের কথা অনুযায়ী মিলনের সঙ্গেই তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। মাইন্ড ইট, দিস ইজ আর্চিস লাস্ট চান্স।"

লাস্ট চান্স! বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছে ইরার। আর্চি যদি না আসে আজও? যে, ওর সঙ্গে বহুদিন পর দেখার পরেও বিস্কিট খায় অন্যমনস্ক হয়ে, রাস্তার পাগল ভিখিরিদের ছবি তোলে, সে কি সত্যিই ওর প্রতি সিরিয়াস? কিন্তু এত কিছুর পরেও আর্চির মুখটা, ওর অন্যমনস্ক চোখ দুটো, ওর হঠাৎ হেসে ওঠাটা মনে পড়লে কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায় ইরার। প্রতি বার আর্চিকে চুমু খাওয়ার সময় লবঙ্গের গন্ধ পায় ও, সেটা হঠাৎ স্মৃতিতে ফিরে আসে। ওর মনে পড়ে নানা রঙের ফুলের ভেতর থেকে এক জোড়া চোখ তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। মনে পড়ে সেই পড়ন্ত আলোর গঙ্গার পাড়। ওদের কোড্যাক মোমেন্ট। এসব কি মা কোনওদিন বুঝবে? বুঝবে বাবা? সেই মিলন ডাক্তার কি অমন সুন্দর ছবি তুলে দিতে পারবে ওর। জড়িয়ে ধরে বলতে পারবে— "মোমেন্ট অব মাই লাইফ"? জীবনে মানুষ মাত্র একবারই

BanglaBook.org

ঠিক মানুষকে খুঁজে পায়। আর কোনও কারণে যদি সে চলে যায়, মানুষ বাকি জীবনটা অন্য কেউ হয়ে বাঁচে। তার নিজস্ব কিচ্ছু থাকে না আর। ইরা ভাবল, আজকের পরে ও নিজেও কি অন্য কেউ হয়ে যাবে?

নিউ আলিপুরের গোল চক্করটায় বাস থামামাত্র নেমে পড়ল ইরা। এবার মামার বাড়ি যেতে হবে ওকে। ও জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখল একবার। নাঃ, আছে কৌটোটা। এতে এক জোড়া সোনার বালা আছে। মামি গত সপ্তাহে ফেলে এসেছিল ওদের বাড়িতে। আজ মামাদের কীসের একটা নেমন্তন্ন আছে। মা তাই বালাজোড়া দিয়ে পাঠিয়েছে ইরাকে। সন্ধেবেলা নেমন্তন্ন হলেও, ইরার সারাদিন আর সময় হবে না বলেই সকালে এসেছে ও। আর ইচ্ছে করেই আর্চিকেও সকালে ডেকে পাঠিয়েছিল। ইরা চেয়েছিল যে, সকাল সকাল আর্চিকে বিকেলে 'দেখা করার' কথাটা বললে ও সারাদিনের কাজটা সেইমতো গুছিয়ে নিতে পারবে। এখন দেখা যাক আর্চি কী করে!

টুং টুং করে শব্দ হল ব্যাগের ভেতর। ইরা ব্যাগটা খুলে মোবাইলটা বের করল। একটা মেসেজ এসেছে। রিনিদি। লিখেছে— DONT B LATE, CU @ 1.30। নিজের মনে হাসল ইরা। রিনিদি নেমন্তন্নের অ্যালার্ট দিচ্ছে, যেমন আজ সকালে আর্চিকে দিয়েছিল ও নিজে।

মোবাইলটা ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে আবার হাঁটতে লাগল ইরা। ওই তো সামনে গলি। অবশ্য গলি বললেও রাস্তাটা বেশ চওড়া। নানারকম দোকান রয়েছে। ওই তো সামনের নামকরা কেক-পেস্ট্রির দোকানটা খুলছে এখন। এখানেই ওর মামার বাড়ি। দূর থেকে বাড়িটাকে দেখতে পেল ইরা। দেখল দোতলার বারান্দায় মামা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মামাকে এক লক্ষ লোকের মধ্যেও এক বারে চেনা যায় শীতকালে। কারণ পৃথিবীর কেউই বোধহয় এরকম ক্যাটক্যাটে কচি কলাপাতা রঙের মাঙ্কি টুপি পরে না।

মামা বারান্দা থেকেই দেখেছিল ইরাকে। তাই বেল বাজাবার আগেই মামাদের দোতলার ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে গেল। ওদের বাড়িতে যে-মেয়েটা কাজ করে সেই খুলে দিল দরজাটা। ইরা ভেতরে ঢুকল।

মামাদের এই ফ্ল্যাটের ঘরগুলোয় আলো ঢোকে না বিশেষ। সবসময় আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। শীতকাল বলেই ঘরটাকে আরও ঠান্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে

BanglaBook.org

লাগল ইরার। ও দেখল, ওর মামাতো বোন বাইরে যাবার ড্রেস করে চেয়ারে বসে মোজা পরছে। ইরা জিজ্ঞেস করল, "কী রে কোথায় যাচ্ছিস? কলেজ?"

বোন বলল, "হ্যাঁ। সোমবার থেকে ফেস্ট শুরু হচ্ছে তো, তাই কাজ আছে অনেক।" ইরা কিছু বলার আগেই বারান্দার দরজার কাছে দাঁড়ানো মামা বলল, "ফেস্ট না ছাই। আরে সব ইয়ং ছেলে-মেয়ে, বছরের শেষে একটু দেখাসাক্ষাৎ না হলে চলে? ওই যে তোরা বলিস না, ঝাড়ি, তাই আর কী!"

বোন রেগে গিয়ে বলল, "সবসময় বাজে কথা। সব যেন তোমাদের মতো হবে।"

মামা মুখ ব্যাজার করে বলল, "আমাদের আর কিছুই হবে না। এই যে এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলাম, কত মেয়েই তো গেল রাস্তা দিয়ে, কিন্তু কেউ তো তাকাল না!" বোন কিছু বলতে গিয়েও হেসে ফেলল। ইরাও হাসল। সত্যিই মামাটা একই রকম রয়ে গেল? কে বলবে মেয়ে কলেজে পড়ে? বাবা আর মেয়ের এরকম কথোপকথন আর কোথাও হয় বলে ওর জানা নেই।

বোন আর কথা বাড়াল না। 'আসি' বলে বেরিয়ে গেল। ইরা দেখল রান্নাঘর থেকে একটা বাটি হাতে বেরিয়ে এল মামি। তারপর ইরাকে বলল, "এটা খেয়ে নে তাড়াতাড়ি।"

ইরা বাটিটা হাতে নিয়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, "কী এটা? আর তুমি বুঝলে কী করে আমি এসেছি?"

মামি হাসল, "তোর গলা পেলাম যে। এখন নে, খা। পুলিপিঠে করেছি।"

ইয়াক। সকাল সকাল মিষ্টি? গা গুলিয়ে উঠল ইরার। মিষ্টি একদম পছন্দ করে না ও। তা ছাড়া আজকাল কোমরের কাছটায় হালকা ফ্যাট হচ্ছে। তাই সতর্ক হয়েছে ইরা। মিষ্টি আর তেল জাতীয় জিনিস খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে একদম। এখনও বাটিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল ইরা। খেতে ইচ্ছে করছে না।

মামা বলল, "দু'চামচ খেয়ে বাকিটা আমায় দে। আর সত্যিই তো," মামা এবার মামির দিকে তাকাল, "সকালে কারও এসব খেতে ভাল লাগে?"

মামি বলল, "তা হলে তুমি খেতে চাইছ কেন? তোমায় তো দিব্বি ভাল লাগে দেখছি!"

মামা হাসল, "আমি তো পিঁপড়ের জাত। মিষ্টি দেখলে কি সকাল রাত্রি খেয়াল থাকে আমার? দে ইরু, একটু মুখে ছুঁয়ে পিঠেটা আমায় দে।"

ইরা যেন হাঁফ ছাড়ল। কোনওমতে দু'চামচ মুখে দিয়ে মামার হাতে ধরিয়ে

BanglaBook.org

দিল বাটিটা। তারপর পকেট থেকে সোনার বালার কৌটোটা বের করে মামির হাতে দিল।

মামি কৌটোটা হাতে নিয়ে বলল, "পিঠেটা খেলি না যখন, তখন দিয়ে দিচ্ছি নিয়ে যা বাড়িতে।"

"বাড়িতে? পাগল? আমায় এখন রাজ্যের জায়গায় যেতে হবে নেমন্তন্ন করতে। ও পরে নেব।"

মামা বলল, "খুব বড় করে হচ্ছে তো অনুষ্ঠান? ইয়ে ড্রিঙ্কস্ থাকবে তো পার্টিতে?"

ইরা কিছু বলার আগেই মামি ঝাঁঝিয়ে উঠল, "আর ওসব ছাইপাঁশ খেয়ে কাজ নেই। দু'ফোটা পেটে পড়লেই তো গন্ডগোল করো।"

মামা বলল, "সে-দিন তো ট্রিপল অনুষ্ঠান, আমি খাব না!"

"ট্রিপল! মানে?" ইরা হকচকিয়ে গেল।

হ্যাঁ, বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন আর তোর এনগেজমেন্টের অ্যানাউন্সমেন্ট। ট্রিপল!"

"কী?" তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল ইরা, "আমার কী বললে?"

মামি ঘাবড়ে গেল, "তুই জানিস না? দিদি যে আমাদের বলল, ডক্টর মিলন সেন, তোর হবু বর। তিরিশ তারিখে তোদের এনগেজমেন্ট ডেট অ্যানাউন্স করবে!"

"মা বলেছে?" মামার গোটা ফ্ল্যাটটা যেন হঠাৎ দুলে উঠল মুহূর্তের জন্য। কই ও তো জানে না কিচ্ছু। বাবাও তো ওকে কিছু বলেনি! তা হলে? এসব কী হচ্ছে ওর আড়ালে? ইরা আর বসল না।

মামা জিজ্ঞেস করল, "কী রে এর মধ্যেই চললি?"

"হ্যাঁ, আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে তো।" ইরা দরজার কাছে গিয়ে জুতো পরতে লাগল। মামা মাথার থেকে মাঙ্কি ক্যাপটা খুলে চেয়ারে রেখে এসে দাঁড়াল ওর পাশে, তারপর ওর মাথায় হাত দিতে বলল, "বিয়েটায় তোর আপত্তি আছে? দিদির সঙ্গে কথা বলব আমি?"

ইরা ছলছলে চোখে তাকাল মামার দিকে। কোনও কথা বলতে পারল না। মামা বাঁ হাতে ধরা পিঠের বাটিটা টেবিলে রেখে বলল, "চিন্তা করিস না। জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বল তুই। দরকার হলে আমিও বলব। জোর করে তোকে বিয়ে দেওয়া হবে না, বুঝলি?"

BanglaBook.org

ইরা কোনওমতে হাসল, তারপর বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট থেকে। শুনল মামা বলছে, "কোনও দরকার পড়লে ফোন করিস আমায়, কেমন?"

সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়েই ইরা বাবার মোবাইলে রিং করল। এখনই বাবার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলা দরকার। চার বার রিং হওয়ার পর ফোনটা ধরল বাবা, "বল।"

"তোমরা আমার এনগেজমেন্ট অ্যানাউন্স করছ তিরিশ তারিখ? আমায় বলোনি তো? আমায় না জানিয়ে এসব কী হচ্ছে? তুমি... তুমি..." গলা বুজে আসছে ইরার।

বাবা বলল, "এখনও ফাইনাল কিছু হয়নি। মিস্টার সেনদের বলাও হয়নি। তবে তোর টিনটিন যদি আজ ঠিক সময়ে না আসে তা হলে আজ সন্ধেবেলাতেই সেনদের সঙ্গে কথা ফাইনাল করব। শোন এখনও বলছি, ইয়োর ম্যান স্টিল হ্যাজ দ্য লাস্ট চান্স? আমি এমন কারও সঙ্গে তোর বিয়ে দেব না, যে তোকে ইগনোর করে।"

ইরা কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে দিল বাবা।

লাস্ট চান্স! এখনও সুযোগ আছে তা হলে? ইরা ভাবল, আর্চি আজ আর মিস করবে না তো? ওর হাতে ধরা মোবাইলটা কুঁক শব্দ করল একবার। ব্যাটারি শেষের দিকে। পাত্তা দিল না ইরা। ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল ফোনটা। তারপর নীচে নেমে গেল। মাথায় শুধু একটাই চিন্তা। আর্চি।

"এখানে কি প্রতাপ দে থাকেন?" সামনে থেকে আসা প্রশ্নে চিন্তাটা ছিঁড়ল ইরার। ও মুখ তুলে তাকাল। একজন ভীষণ সুন্দর দেখতে মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওর সামনে। কে ভদ্রলোক?

মহেশ ২৪ ডিসেম্বর, সকাল ন'টা পাঁচ

মহেশ আবার জিজ্ঞেস করল, "এখানে কি প্রতাপ দে থাকেন? অ্যাডভোকেট প্রতাপ দে?"

মেয়েটা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাবেন টু 'এ' ফ্ল্যাট। দরজায় নাম লেখা আছে।"

মহেশ হাসল, "ধন্যবাদ"।

BanglaBook.org

মেয়েটা বলল, "না, না, ধন্যবাদের কী আছে? আমার মামা হন। আপনি চলে যান ওপরে।"

"মামা হন?" মহেশ দ্বিধা করল মুহূর্ত তারপর বলল, "আমি গেলে এখন দেখা করবেন নিশ্চয়ই?"

মেয়েটা ঠোঁট চাটল, ঘড়ি দেখল একবার, একবার ব্যাগটা কাঁধ বদল করল। মহেশের মনে হল মেয়েটা কোনও কারণে টেনসড আছে বোধহয়। এভাবে ওকে আটকে রাখা ঠিক হচ্ছে না একদম। ও আবার, "সরি, আপনাকে আটকে রেখেছি।"

মেয়েটা হাসল এবার, বলল, "না, না, আপনি ওপরে চলে যান, মামা আছে বাড়িতে। নিশ্চয়ই দেখা করবেন।"

মহেশ আর দাঁড়াল না। ধন্যবাদ দিয়ে ওপরে উঠে গেল। মেয়েটাও চলে গেল বড় রাস্তার দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা কাঠের দরজার সামনে দাঁড়াল মহেশ। দরজার গায়ে নেমপ্লেটে লেখা আছে প্রতাপ দে-র নাম।

মহেশ পাশের কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল। ভেতরের সুরেলা শব্দটা বাইরে থেকেও শুনতে পেল মহেশ। ভাবল, ওকে কি চিনতে পারবেন প্রতাপবাবু?

খটাং শব্দে দরজাটা ফাঁক হল একটু। একটা অল্পবয়সি মেয়ের মুখ উঁকি দিল, "কাকে চাই?"

"প্রতাপবাবু আছেন?"

"আপনার নাম?" মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

"মহেশ চট্টরাজ।"

"একটু দাঁড়ান", বলে মেয়েটা আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল। মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজার দিকে তাকিয়ে মহেশ ভাবল, এখন সত্যিই কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। বিশ্বাস! গত রাতের কথা মনে পড়তেই নিজের ওপর ঘৃণা হল ওর। মনে মনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া মেয়েটাকে বলল, "ঠিক করেছ তুমি, আমায় বিশ্বাস কোরো না।"

কিছুক্ষণ পরে দরজাটা খুলল আবার। মহেশ দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রতাপ দে। ভদ্রলোককে দেখে হাসল মহেশ, নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "চিনতে পেরেছেন আমায়?"

BanglaBook.org

প্রতাপ হাসলেন, "বিলক্ষণ। ভেতরে আসুন।"

একটু অবাক হল মহেশ, "চিনতে পেরেছেন?"

প্রতাপ সরে দাঁড়িয়ে মহেশকে ভেতরে ঢোকার মতো জায়গা করে দিয়ে বললেন, "আপনার মতো রূপবান পুরুষকে ভোলা অত সহজ নাকি। আসুন, ওইখানটায় বসুন।"

রূপবান? মনে মনে হাসল মহেশ। প্রতাপ তো জানেন না ভেতরটা কত কদর্য ওর! ও প্রতাপের দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারটা থেকে একটা কচি কলাপাতা রঙের মাঙ্কি টুপি পাশের চেয়ারে সরিয়ে রেখে বসল।

প্রতাপ নিজে মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে, তারপর মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "তা বলুন, হঠাৎ, কী মনে করে?"

মহেশ একটু গুছিয়ে বসল। ও জানে, যে-কথাটা জিজ্ঞেস করতে ও এসেছে সেটা এই ভদ্রলোকের কাছে অবান্তর, পাগলের প্রলাপের মতো মনে হলেও, ওর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আজ ভোর রাতের দিকে হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়েছে ওর।

ও বলল, "আজ থেকে পাঁচ-ছ' বছর আগে আমাদের বিমা কোম্পানি নদিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছোট ছেলের ইনশিয়োরেন্স করেছিল না? মনে আছে আপনার? ছোট ছেলে হঠাৎ এক রাতে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার বেশ অনেক মাস পরে ওর দাদা, ভাইয়ের হয়ে টাকাটা ক্লেম করেছিল, কিন্তু বডি পাওয়া যায়নি বলে, আমরা ওর প্লি রিজেক্ট করেছিলাম। তাই কেস করেছিল ওর দাদা। মনে পড়ে?"

প্রতাপ ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে তাকালেন। মহেশ বুঝল ভদ্রলোক দ্রুত অতীতে ফিরে চলেছেন। ও অপেক্ষা করল। মনে মনে বলল, "প্রতাপবাবু, আপনি সময় নিন। মনে করুন, মনে করাটা খুব জরুরি।"

প্রতাপ মুখ তুললেন, "শেঠ পরিবারের ঘটনাটা? পরে যে-মামলাটা অন্য দিকে মোড় নিল?" উজ্জ্বল হয়ে উঠল মহেশের চোখ। যাক ওঁর মনে পড়েছে তা হলে।

ও বলল, "হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। ক্লেমের মামলাটা তো ঘুরে গিয়েছিল অন্য দিকে, না?"

প্রতাপ বললেন "হ্যাঁ নিরুদ্দিষ্ট লোকটির স্ত্রী এসে তো একদিন কোর্টে

BanglaBook.org

কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। তারপর নালিশ করেছিলেন যে, ভাসুরই ওর স্বামীকে মেরে ফেলেছে। ভাসুরের সঙ্গে নাকি দৈহিক সম্পর্ক ছিল মহিলার। আমার তো মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। বলেন কী ভদ্রমহিলা? তবে হ্যাঁ, বডির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। অবশ্য যায়নি, না টাকা পয়সা দিয়ে ওই ভাসুরটি গোটা ঘটনাটাকে চেপে দিয়েছিল, বলা মুশকিল। ভদ্রমহিলার কথার ভিত্তিতে তো আটক করা হয়েছিল ভাসুর ভদ্রলোককে। তার ওপর মামলাও তো চলে।"

মহেশ হেলান দিয়ে বসল, তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা আপনি জানেন কী হয়েছে সেই মামলার?"

প্রতাপ ঠোঁট ওলটালেন, "কী জানি। তবে বোধহয় কেসের নিষ্পত্তি হয়নি এখনও। এ-দেশে ক'টা কেস দ্রুত মেটে বলুন? তা, আপনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করছেন? আপনি জানেন না? আপনি তো অনেক বার কোর্টে এসেছিলেন তখন বিমা কোম্পানির তরফ থেকে। আপনারা খোঁজ রাখেননি আর?"

মহেশ বলল, "না, আমার তো অন্য ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার হয়ে যায়!"

প্রতাপ বললেন, "সত্যিই জীবন খুব অদ্ভুত। শেষ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে শুতে হল? তা হঠাৎ আপনি এত দিন পর এ ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হলেন?"

মহেশ হাসল, "হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আচ্ছা আপনার কী মনে হয়? ওর দাদার কি শাস্তি হওয়া উচিত?"

"শাস্তি?" প্রতাপ নাক টানলেন একটু, তারপর বললেন, "আমি শাস্তি দেবার কে বলুন? তবে এরকম খারাপ লোকদের বেঁচে থাকার কী দরকার? আমার মতে বিশ্বাসভঙ্গের মতো ঘৃণ্য কাজ খুব কম হয়।"

"বেঁচে থাকার কী দরকার?" কথাটা মহেশের শরীরের ভেতর ধাক্কা খেয়ে বেড়াতে লাগল। এটাই তো ও চিন্তা করে এসেছে গতকাল সারাটা রাত। ওরও মনে হয়েছে বিশ্বাসভঙ্গের মতো ঘৃণ্য কাজ খুব কম হয়। মহেশ মাথা নিচু করে বসে রইল। ওই দাদা লোকটার কী হয়েছে সেটাই জানতে এসেছিল ও। কিন্তু তা জানতে পারল না। অবশ্য নিজের অজান্তেই প্রতাপ বলে দিয়েছেন মহেশের সমস্যার সমাধান। মহেশ ভাবল, মৃত্যুই একমাত্র উপায়। ও বুকে হাত দিল একবার। ফুসফুসের ভেতর কর্কটকুল নিদ্রিত এখনও। তবে ওরা মহেশকে শেষ করার আগে, মহেশ নিজেই সরে যাবে। আর যাবে, আজই। আজ, চব্বিশে ডিসেম্বর, ওর জন্মদিনে।

BanglaBook.org

প্রতাপ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি এখনও ওইখানেই চাকরি করছেন?"

মহেশ বলল, "না এখন আর ওখানে নেই আমি।"

"ও"। প্রতাপ আর আগ্রহ দেখালেন না। বরং দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ঘড়ি দেখলেন একবার, অর্থাৎ এবার উঠতে হবে।

ইঙ্গিতটা বুঝে মহেশ উঠে দাঁড়াল। সত্যিই অনেক সময় নিয়েছে ও ভদ্রলোকের। তা ছাড়া ওর এরকম হঠাৎ আগমনে ভদ্রলোক কী ভাবলেন কে জানে! ও বলল, "অনেক ধন্যবাদ, আপনি অনেকখানি সময় নষ্ট করলেন আমার জন্য।"

প্রতাপ হাসলেন, "সে ঠিক আছে। পারলে আসবেন আর এক দিন। পুরনো লোকেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলে ভাল লাগে খুব।"

"আচ্ছা, আসি।" হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল মহেশ।

বড় রাস্তায় এসে দেখল রোদটা বেড়েছে একটু। কিন্তু হাওয়া দিচ্ছে খুব। শীত শীত করছে মহেশের। ও-পাশে তাকাল। নাম করা এক কেকের দোকান। তার কাচের দরজার গায়ে ক্রিসমাস উপলক্ষে নানারকম স্টিকার লাগানো। দরজাটার পাশে ইয়াব্বড় একটা স্যান্টাক্লসের মূর্তি রাখা। কাল বড়দিন। উৎসবের দিন। কিন্তু না, ওর মতো লোকের এই উৎসবে যোগ দেবার অধিকার নেই কোনও।

ও দেখল একটা বাচ্চা মেয়ে মায়ের হাত ধরে ওই কেকের দোকানটায় ঢুকছে। চোখে চোখ পড়ায় বাচ্চা মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে হাসল একটু, তারপর হাত নাড়ল। মহেশও পালটা হাত নাড়ল একবার। মেয়েটা দোকানে ঢুকে গেল।

হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল সেই বাচ্চা মেয়েটার কথা। বিমা কোম্পানির থেকে ওকে পাঠানো হয়েছিল নদিয়ায় সেই শেঠবাড়িতে। এখনও চোখের সামনে ছবির মতো ভাসে বাড়িটা। বিরাট বড় ঝিলের পাশে প্রকাণ্ড বড় একটা বাড়ি। সামনে বড় মাঠ। সুন্দর করে ছাঁটা লন। তার মধ্যে দিয়ে লাল মোরামের রাস্তা চলে গেছে। লনে সাদা টেবিল ঘিরে একই রঙের কয়েকটা চেয়ার।

বাড়ির বয়স্ক এক ভৃত্য মহেশকে নিয়ে গিয়েছিল বড় ভাই ত্রিদিবেন্দ্র শেঠের কাছে। বিশাল বড় দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল মহেশ। তারপর

BanglaBook.org

শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, অনেক পায়রায় ভরা ছাদ পেরিয়ে একটা বড় স্টাডিতে গিয়ে থেমেছিল মহেশ। প্রচুর বই-ভরতি ঘরের মাঝখানে বসেছিলেন ত্রিদিবেন্দ্র শেঠ। সেখানেই ওঁর ছোট ভাইয়ের ছবি দেখেছিল মহেশ। সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো হাসিখুশি মানুষের ছবি একটা। মাথায় চুল খুব কম হলেও হাসিখুশি উজ্জ্বল চোখের এক মানুষ। সৌমেন্দ্র শেঠ।

কথা বলে চলে আসার সময় ছোট্ট মেয়েটাকে দেখেছিল মহেশ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল একা। ওকে দেখে হেসে হাত নেড়েছিল। এখনও সব ছবির মতো মনে আছে মহেশের। মনে আছে, ওর সামনেই এক ভদ্রমহিলা এসে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল মেয়েটিকে। অপূর্ব সুন্দরী সেই মহিলার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মহেশ। সাদা পোশাকের ঔজ্জ্বল্য ছাপিয়ে যেন ঠিকরে আসছিল হাতে পরে থাকা এক জোড়া সোনার বালা। চিনতে পেরেছিল মহেশ। সৌমেন্দ্র শেঠের স্ত্রী।

মহেশ বড় রাস্তার দিকে এগোল। আজ খানিকক্ষণ এখানে ওখানে ঘুরবে ও। যা ইচ্ছে তাই করবে, তারপর সুযোগ বুঝে গিয়ে দাঁড়াবে চলন্ত বাসের সামনে। এভাবেই ও নিজেকে শেষ করবে, ঠিক করেছে ও। কিন্তু এখনও তার দেরি আছে কিছু ঘণ্টা। ততক্ষণ আর একটু বেঁচে নেবে মহেশ। আর একটু সময় কাটিয়ে নেবে পৃথিবীতে। ও বুকের ওপর হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, "ওহে কর্কটকুল আর একটু সবুর করো। তারপর একসঙ্গেই শেষ হব আমরা।"

বহুদিন লেকে গিয়ে বসা হয় না মহেশের। ও ভাবল এখান থেকে অটো করে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি চলে যাবে। তারপর সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে লেকের দিকে। জলের কাছে বসবে একটু।

বড় রাস্তায় গিয়েই অটো পেয়ে গেল মহেশ। পেছনের কোনার সিটে উঠে বসল ও। পাশের খোলা অংশ দিয়ে হুহু করে হাওয়া ঢুকছে। শরীর শিরশির করছে ওর। ঠান্ডা লাগলে বুকের ব্যথাটা শুরু হয়। মহেশ হাত দুটোকে জড়ো করে রাখল বুকের কাছে। আরও লোক উঠছে অটোয়। ওর পাশে মোটা মতো একটা লোক উঠে ওকে প্রায় চেপটেই দিল। মহেশ কিছু বলল না। ও সরে বসল যথাসম্ভব। হঠাৎ মনে পড়ে গেল গত রাতের কথা। লালি বলেছিল, "আপনি সবসময় সরে সরে থাকেন কেন?"

BanglaBook.org

লালি। ভাইকে বিয়ে দিয়ে যখন লালিকে নিয়ে এসেছিল মহেশ তখন বুঝতেই পারেনি মেয়েটার মনে কী আছে।

বিয়ের প্রথম থেকে মহেশ দেখত লালি ওর সঙ্গে একটু বেশি কথা বলে, বেশি খেয়াল রাখে ওর। ও ভাবত বাচ্চা মেয়ে তাই নতুন সংসার পেয়ে হয়তো উৎসাহ বেশি। কিন্তু মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়াত লালি। ভাই না থাকলে, স্নান করে শায়াটা বুকের কাছে বেঁধে চলে আসত ওপরে। মহেশের ঘরের সামনের বারান্দায় মেলে রাখত জামাকাপড়, শাড়ি, প্যান্টি, ব্রা। লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিত মহেশ। লালি মাখনের মতো কাঁধের ওপর দানা দানা জলের ফোঁটাকে টোকা মেরে ফেলতে ফেলতে অদ্ভুত সংকেতময় চোখে তাকাত ওর দিকে।

ভাইকে কিছু বলতেও পারত না মহেশ। লালির থেকে দূরত্ব রেখে ও শুধু পিছলে পিছলে থাকত। তবু মাঝে মাঝেই রাতে এটা ওটা দেবার নাম করে ওপরে উঠে আসত লালি। একবার তো শুধু শাড়িটা গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে ওপরে উঠে এসেছিল। কী? না ভাইয়ের পেট ব্যাথা করছে, ওষুধ চাই। মহেশ জিজ্ঞেস করেছিল, "পেটের কোথায় ব্যথা করছে?"

হঠাৎ নিজের পেটের কাছ থেকে শাড়িটা সরিয়ে লালি আলতো করে নিজের আঙুলটা পেটের নীচের দিকে বুলিয়ে দেখিয়েছিল, "এইখানে।"

দিনকে দিন মহেশের বিপদ বাড়ছিল। বুকের ভেতর রোগের দাপাদাপি, লালির ইঙ্গিত, সমস্তটাই খুব গোলকধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল ওকে। তাই, ভাই যখন বলল যে, ওকে অফিসের কাজে কোয়েম্বাটুর যেতে হচ্ছে, তখন মনে মনে প্রমাদ গুনেছিল মহেশ। ও ভাইকে বলেছিল, "এই ক'দিন তোর শাশুড়িকে এনে রাখ এখানে। লালি ছোট মেয়ে, ওর ভালও লাগবে, তা ছাড়া মায়ের কাছে থাকলে সেফ থাকবে।"

ভাই বলেছিল, "দাদা, তুই তো আছিস!"

মহেশ হেসে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল ভাইয়ের মাথায়। তারপর বলেছিল, "শোন, আমি ওপরে থাকি একা। লালি নীচে থাকবে। ওর ভয় লাগবে না? তা ছাড়া মা সঙ্গে থাকলে মেয়েরা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ থাকে।"

ভাই আর কথা বাড়ায়নি। নিয়ে এসেছিল শাশুড়িকে। তবু যাওয়ার সময় বলেছিল, "লালিকে একটু দেখিস তো দাদা।"

মহেশ বলেছিল, "সে দেখব। কিন্তু তুই চিন্তা করছিস কেন? তোর শাশুড়িও তো রয়েছেন।"

BanglaBook.org

ভাই হেসে বলেছিল, "তাও তুই দেখিস। না হলে আমার ঠিক শান্তি হয় না।"

গতকাল মহেশের শরীরটা ভাল ছিল না দুপুরের দিকে। তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল একটু। রাত্রে আর কিছুতেই ঘুম আসছিল না ওর। একটা ইংরেজি থ্রিলার নিয়ে পড়ছিল খাটে শুয়ে, হঠাৎ খটখট শব্দ করে খুলে গিয়েছিল দরজাটা। মহেশ চমকে উঠে দেখেছিল একটা চাদর গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লালি!

"তুমি? এখন?" মহেশ তাকিয়েছিল ঘড়ির দিকে। সোয়া এগারোটা পেরিয়ে রাত আরও গভীরের দিকে এগোচ্ছিল। লালি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছিল ওর দিকে, তারপর বলেছিল, "কী বলেছেন আপনি আপনার ভাইকে?"

"ক-কী বলেছি?" ভয়ে জিভ জড়িয়ে আসছিল মহেশের।

"আমি ছোট মেয়ে? আমি ছোট? ছোট মেয়েদের কোনওদিন এরকম থাকে?" বলে আচমকা চাদরটা খুলে ফেলেছিল লালি। আর ভয়ে, বিস্ময়ে মহেশ দেখেছিল লালি শুধু সায়া পরে এসেছে, গায়ে কিচ্ছু নেই। গায়ে আবরণ না থাকায় ডিসেম্বরের ঠান্ডায় শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল লালির, বাদামি বৃন্ত দুটো উদ্ধত হয়েছিল ভয়ংকরভাবে। ভয়ে সরে গিয়েছিল মহেশ। অস্ফুটে বলেছিল, "না, তুমি চলে যাও।"

সায়ার দড়ি খুলতে খুলতে লালি যেন ফুঁসছিল। বলছিল, "আপনি সবসময় সরে সরে থাকেন কেন? কেন কাছে আসতে দেন না আমায়।" সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে লালি উঠে পড়েছিল খাটে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ওর দিকে এগোতে এগোতে বলছিল, "কোনও ভয় নেই, কেউ জানতে পারবে না। মা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে। আপনি আজ আমায় নিন।"

মহেশ সিঁটিয়ে বসেছিল খাটের কোনায়। তবু অবাক হয়ে মহেশ দেখেছিল ওর অসুস্থ শরীরও সাড়া দিচ্ছে লালিকে দেখে। মহেশ শেষ চেষ্টা করে বলেছিল, "আমার ভাইটাকে কী বলব আমি?"

লালি একদম ঘন হয়ে এসেছিল ওর কাছে, পাজামার ওপর দিয়ে ওর উত্তেজনাকে ধরে বলেছিল, "কিচ্ছু বলার দরকার নেই। সব কিচ্ছু সবাইকে বলতে নেই।" তারপর ওর পাজামার দড়ি খুলতে খুলতে বলেছিল, "দেখি আপনার এইটাও আপনার মতো সুন্দর কি না!"

লালি যখন ওর উরুর মাঝে উপুড় হয়ে ওকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছিল মহেশের চোখের সামনে দুলে উঠেছিল ওই ঘর, বারান্দা, ওই রাত্রি। ক্রমশ রাত্রির অন্ধকার এসে প্রবেশ করছিল মহেশের মধ্যে। আরামে অবশ হয়ে

BanglaBook.org

আসছিল ওর শরীর। নিজের অজান্তেই লালিকে টেনে নিয়েছিল ও। লালির মাথাটা ও চেপে ধরেছিল প্রাণপণ। তার পরের ঘটনা আর স্পষ্ট মনে নেই। শুধু চিত হয়ে শোয়া মহেশের ওপর প্রাণপণে ওঠাপড়া করা লালির ছবির টুকরো দৃশ্য মনে আছে ওর। মনে আছে লালির থুতনি থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছিল মহেশের ঠোঁটে। চোখের জলের মতো তার স্বাদও লোনা।

কখন লালি চলে গিয়েছিল মনে নেই মহেশের। শুধু লালির শরীরের গন্ধ, ওর ঘাম লেগেছিল মহেশের গায়ে। ওর মনে হয়েছিল অনেক দূরে ভাই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে এখন।

সারারাত আর ঘুম আসেনি ওর। বুকের খাঁচার থেকে কর্কটকুল বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল ওর অবসন্ন শরীরে। অসুস্থ ফুসফুস যৌন উত্তেজনার অতিরিক্ত বায়ু বহন করার পর প্রতিবাদ জানাচ্ছিল তীব্র স্বরে। ওর মন ওকে বিদ্ধ করছিল ক্রমাগত। ও ভাবছিল, এটা কী করল ও? কেন করল এমন? ওর ভাইয়ের বিশ্বাসকে ভেঙে দিল এভাবে? ও তো ফিরিয়ে দিতে পারত লালিকে, দিল না কেন? কেন ওর শরীর সাড়া দিচ্ছিল লালিকে দেখে? তা হলে কি এতদিন ধরে অবচেতনে এই দিনটার প্রতীক্ষাতেই ছিল ও? ও কি নিজের অজান্তেই লালির শরীরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল? কেন যৌনতার শীর্ষে পৌঁছে ও আঁকড়ে ধরেছিল লালিকে? কেন ও লালির বৃন্তে মুখ দিয়েছিল? তা হলে কি যৌনতাই মানুষের বেঁচে থাকার শেষ কথা? আর ক'দিনই বা বাঁচবে ও? আর যত দিন বাঁচবে তত দিন কি ভাইয়ের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবে ও? নিজের প্রতি তীব্র ঘৃণায় ও স্থির করেছিল, আর নয়, এবার ওর চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। মনের কর্কট নিয়ে বাঁচার সাহস ওর নেই। আর তখনই ওর মনে পড়ছিল ত্রিদিবেন্দ্র শেঠের কথা।

ঠিকই বলেছেন প্রতাপবাবু, বিশ্বাসঘাতকদের বেঁচে থাকার কী দরকার? আজ তাই সরে যাওয়ার সময়।

"কী দাদা নামবেন না?" অটোওলার খড়খড়ে গলায় মুখ ফেরাল মহেশ। টালিগঞ্জ ফাঁড়ি এসে গেছে। ও ভাড়া দিয়ে নামল। ও ভাবল এই আলো, এই আকাশ ছেড়ে চলে যেতে হবে? হ্যাঁ, যেতে হবে, দোষীদের যেতেই হয়।

মহেশ হাঁটতে লাগল। হঠাৎ সব শূন্য লাগছে ওর। উৎসবের কলকাতায় এই শেষ বারের মতো হাঁটছে ও। সামনের একটা বাস থেকে হুড়মুড় করে

BanglaBook.org

কিছু মানুষজন নামল। তাদের একজনের সঙ্গে ধাক্কাও লাগল মহেশের। মহেশ তাকাল না। শুধু মানুষটার থেকে ভেসে আসা 'সরি'র পরিবর্তে বলল, "নো প্রবলেম"।

আর কোনও প্রবলেম নেই জীবনে। ডেথ সলভস্ অল।

সাইমন ২৪ ডিসেম্বর, সকাল ন'টা আটত্রিশ

কাঁধের থেকে খসে পড়া ড্রইংহোল্ডারটা কোনওমতে ধরল সাইমন। আর একটু হলেই পড়ে যেত। অবশ্য লোকটার কোনও দোষ নেই। ধাক্কাটা লেগেছিল ওর নিজের তাড়াহুড়োর জন্যই। বাসের থেকে এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমেছিল যে, খেয়াল করতে পারেনি। ভাগ্যিস ভদ্রলোক কিছু বলেননি।

পাশেই একটা বড় পানের দোকান। সেখানে তারস্বরে গান বাজছে রেডিয়োতে। হিমেশ রেশম্মিয়া এই সকালবেলাতেই ছড়িয়ে পড়ছে চারিপাশে। দোকানটার বড় আয়নায় মুখ দেখল সাইমন। গালে সামান্য দাড়ি বেড়েছে। অন্য দিন হলে না কামালেও চলত, কিন্তু আজ কামাতেই হবে। ক্যামাক স্ট্রিটে অ্যাডগ্ল্যাম কোম্পানিতে যেতে হবে। ওই কোম্পানির প্রপাইটর শতানিক বাসু ডেকেছেন ওকে। একটা সফট ড্রিঙ্কস্ কোম্পানির অ্যাড ক্যাম্পেনের কাজের জন্য প্রেজেন্টেশন লে-আউট তৈরি করার কথা ছিল। ভদ্রলোক একদম আনকোরা ছেলে খুঁজছিলেন। খবর পেয়ে যোগাযোগ করেছিল সাইমন। শতানিক ওকে অ্যাডভান্স হাজার টাকা দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি একটা লে-আউট করো। যদি পছন্দ হয়, ইউ উইল ডু ইট ফর মি। শোনো, গোটা ব্যাপারটা হবে অ্যানিমেশন বেসড। সিম্পল ইয়েট ফানি হবে। আর দেখো, তৈরি করাটা যেন কস্ট এফেক্টিভ হয়। বাইরে নিকি বসে রয়েছে, ইউ গেট দ্য ডিটেল ফ্রম হার।"

সাইমন জিজ্ঞেস করেছিল, "কবের মধ্যে আনব স্যার?"

শতানিক বলেছিলেন, "টোয়েন্টি ফোর্থ ডিসেম্বর আনবে। সকাল সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে চলে আসবে এখানে। ডোন্ট বি লেট। আর হ্যাঁ, কম্পিউটার অ্যানিমেশন জানো?"

হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়েছিল সাইমন।

BanglaBook.org

"ব্যস, তা হলে তো দারুণ। লে-আউট পছন্দ হলে, তুমি আমার এখানকার সেট-আপ-এ বসেই করে নেবে কাজটা। মাথায় রেখো, দিস প্রজেক্ট ইজ টু ইমপরট্যান্ট। এরকম কাজ রোজ রোজ পাওয়া যায় না। তা, বলো কত টাকা নেবে তুমি?"

একটু সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল সাইমন। কত নেবে ও? যদিও ওর একটা ধারণা আছে কেমন টাকাপয়সা নেওয়া হয়। তবু চিন্তা করেছিল একবার। এটা তো জাস্ট একটা প্রপোজালের মতো দিতে হবে সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের কোম্পানিটাকে। পরে ফাইনালাইজ হলে তো অনেক কাটাছেঁড়া হবে এর ওপর। এর জন্য কত আর দাম চাইবে এখন?

সাইমন জিজ্ঞেস করেছিল, "স্যার, কাজটা যদি আপনারা পান, তা হলে আমায় দিয়ে কাজটা করাবেন তো?"

শতানিক হেসেছিলেন, "এটা কোনও প্রশ্ন হল? হ্যাঁ, বললাম তো তোমাকেই করতে হবে। আর কে করবে? বলো কত নেবে তুমি?"

সাইমন থেমে থেমে বলেছিল, "ওই স্যার... ইয়ে... আট হাজার।"

"আট হাজার?" ভুরু তুলে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন শতানিক। অস্বস্তি লাগছিল সাইমনের। এমনিতেই অমন কোট পরা, চুরুট চিবোনো মানুষটাকে দেখলেই পেটের ভেতর কেমন করে। আর সে যখন ওরকমভাবে তাকিয়ে থাকে, তখন তো অস্বস্তি হবেই। শতানিক হেসেছিলেন, বলেছিলেন, "ঠিক আছে, তাই হবে, বাট দ্য জব শুড বি গুড। কেমন?"

"ঠিক আছে স্যার!" উঠে দাঁড়িয়েছিল সাইমন।

"ও, ওয়ান থিং," শতানিক হাত তুলেছিলেন, "এরকম শ্যাবি ড্রেসে এখানে এসো না। ওয়্যার সামথিং গুড অ্যান্ড গেট আ শেভ। পরের বার ভালভাবে আসবে। কেমন? নাও, মার্চ।"

আয়নায় মুখটা আবার দেখল সাইমন। ওর গায়ের লোমের ভার কম। দাড়িও খুব বেশি ঘন নয়। তবু শ্যাওলার মতো থুতনিতে আর গালে একটু একটু লেগে রয়েছে। এটাকে কামাতে হবে এখন।

সাধারণত দশ টাকার একটা ছোট্ট রেজার দিয়ে বাড়িতেই দাড়ি কামিয়ে নেয় ও। কিন্তু ওর দেরি হয়ে গেছে খুব। বাড়ি যেতে গেলে আর ঠিক সময়ে অ্যাডগ্ল্যামে পৌঁছোতে পারবে না ও। এখানেই কোথাও দাড়ি কামিয়ে নিতে

BanglaBook.org

হবে ওকে। পানের দোকানের তাকে একটা ছোট্ট ঘড়ি রাখা আছে। ন'টা চল্লিশ বাজে। দাড়ি কামিয়ে বাস ধরবে সাইমন। সাড়ে দশটার মধ্যে ঠিক পৌঁছে যাবে।

দূরে একটা সেলুন দেখা যাচ্ছে। পা চালিয়ে সেখানে গেল সাইমন। তিনটে আয়নার সামনে তিনটে চেয়ার। আর তার প্রত্যেকটাতেই লোক বসে রয়েছে। পেছনের লম্বা বেঞ্চটায় আরও পাঁচ জন বসে রয়েছে। সাইমন বুঝল, এখানে দাড়ি কামাতে গেলে কালকে গিয়ে পৌঁছোবে ক্যামাক স্ট্রিটে। এখন কী করবে ও? কোথায় যাবে? এ-দিক ও-দিক দেখল সাইমন। কোথাও কোনও নাপিতের দোকান নেই আর। ও ভাবল তা হলে কি এভাবেই চলে যাবে? আসল তো হচ্ছে ওর কাজ। সেটা তো শেষ করেছে ও। দাড়ি কামানো, না কামানোর ওপর কী আসে যায়? কিন্তু পরক্ষণেই শতানিকের মুখটা মনে পড়ল সাইমনের। মনে পড়ল নিখুঁত আঁচড়ানো চুল, কামড়ে ধরা চুরুট, দামি সুট আর ওই ঠান্ডা চোখের দৃষ্টি। লোকটা নিজে খুব নিখুঁত হয়ে থাকেন। ওঁর কথা অমান্য করা ঠিক হবে না একদম।

সাইমন এ-দিক ও-দিক তাকাতে তাকাতে হাঁটতে লাগল। কোথাও তো পাবে একটা সেলুন। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল রাস্তার ধারের একটা বড় বটগাছের গোড়ায় একজন মানুষ ছোট্ট টিনের সুটকেস নিয়ে বসে রয়েছে। ও পা চালিয়ে এগিয়ে গেল সে দিকে। হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছে ও। গাছের গোড়ায় বসে থাকা মানুষটিকেই খুঁজছিল ও।

সাইমন ভাল করে দেখল লোকটাকে। কাঁচা-পাকা চুল মানুষটার মাথায়। একটা চোখ নুড়ি পাথরের মতো ঘোলাটে। কিন্তু গোঁফটা ইয়াব্বড়। সাইমন ভাবল, এর কাছে দাড়ি কামাতে বসতে হবে? গালের সঙ্গে গলা নামিয়ে দেবে না তো? কিন্তু এর চেয়ে বেটার চয়েস কি আছে এই মুহূর্তে? সাইমন দেখল লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখেমুখে একটা চাপা প্রত্যাশা। ও ভাবল, ওর সানসাইন স্টুডিয়োর সামনে যখন কোনও লোক এসে দাঁড়ায়, ওর মুখটাও কি তখন অমন হয়ে ওঠে?

ও লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদু, দাড়ি কামাব হবে?"

লোকটার ঘষা পাথরের চোখেও আলো জ্বলে উঠল, "হবে বাবু। বসুন।" সাইমন দেখল লোকটার সামনে একটা বড় ভাঙা ব্যাটারি উলটো করে রাখা আছে। ও বুঝল, এটাই বসার আসন। সাইমন, ক্লিপবোর্ডটা গাছের গায়ে

BanglaBook.org

হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে বসে পড়ল ভাঙা ব্যাটারির ওপর। হঠাৎ হাসি পেল ওর। কোটি কোটি টাকার সফট ড্রিঙ্কস্ কোম্পানির জন্য যে অ্যাড লে-আউট করছে, সে ভাঙা ব্যাটারির ওপর বসে দাড়ি কামাচ্ছে। দেশ সত্যিই উন্নতি করছে। হাতির সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে পিঁপড়েকে। অন্ধ মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে টেলিস্কোপ। সফ্‌ট ড্রিঙ্কস্ খেতে গেলে যে-মানুষ দু'বার ভাবে, তাকে দিয়ে সেই সফট ড্রিঙ্কস্-এরই বিজ্ঞাপন আঁকাচ্ছে!

সাইমন জিজ্ঞেস করল, "দাদু, ব্লেডটা নতুন তো?"

লোকটা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ বাবু, নতুন। চিন্তা নেই। এখুনি হয়ে যাবে।"

ওই অদ্ভুত ঘষা চোখটার দিকে তাকিয়ে ও ভাবল চিন্তা নেই বললেই কি সব চিন্তার সমাধান হয়ে যায়? গালে সাবান লাগানোর সময় শরীরটা ঠান্ডায় শিরশির করে উঠল। হাওয়া দিচ্ছে বেশ। উত্তর দিক থেকে লুঠেরার মতো হাওয়া হইহই করে ঢুকে পড়ছে কলকাতায়।

চোখ বন্ধ করল সাইমন। ভাবল, বোনটা কী করছে এখন? ওই ছোট্ট ঘরটায় শুয়ে কি ওর আসার প্রতীক্ষা করছে? যেতে কি পারবে সাইমন? আজ যদি ওর কাজ পছন্দ হয় শতানিকের, উনি আট হাজার টাকা দেবেন। যদিও তারপরও কয়েক দিন কাজ করে দিতে হবে, তবু আট হাজার টাকা বলে কথা। বোনের জন্য একটা ছোট এফ এম রেডিয়ো কিনে নিয়ে যাবে ও। চাঁদনিতে দেখেছে। ষাট টাকা দাম। ছোট্ট দেশলাই বাক্সের মতো দেখতে। গায়ে দুটো সুইচ আছে। কানে হেডফোন দিয়ে শুনতে হয়। বোনটা সারাদিন একা একা শুয়ে থাকে বিছানায়। ওকে দিলে, ও শুনতে পারবে। বোনটার জন্য কিছুই করতে পারে না ও। মাঝে মাঝে ভাবে, সমস্ত জীবনটাই ওলট পালট হয়ে গেল ওর মায়ের জন্য। কে এমন সেই মানুষ যার জন্য সদ্যোজাত সন্তানকে ছেড়ে চলে যায় মা? এই কি প্রেম?

"হয়ে গেছে বাবু, দেখে নিন।" লোকটা ছোট্ট কাঠ বাঁধানো আয়না হাতে ধরিয়ে দিল সাইমনের। সাইমন আয়নায় দেখল নিজেকে। গালের শ্যাওলা পরিষ্কার হয়ে গেছে। মুখটা আরও ফরসা লাগছে এখন। বোন দেখলে বলত বড়লোকের মতো লাগছে। ও টাকা মিটিয়ে বোর্ড নিয়ে উঠে পড়ল। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "দাদু, কত সময় হল?"

লোকটা বাঁ কবজিতে বাঁধা ঘড়িটা দেখে বলল, "ন'টা পঞ্চাশ বাবু।"

ন'টা পঞ্চাশ! সর্বনাশ! সাইমন এ-দিক ও-দিক তাকাল। এখান থেকে

BanglaBook.org

ক্যামাক স্ট্রিটের উত্তর দিকের মোড়ে যাবার বাস পাবে কোনও? ও শুনেছে একটা নতুন বাস চালু হয়েছে আজকাল। এখন মাঝে মাঝেই নানা রকম বাস চালু হয় কলকাতায়! কত ফ্লাইওভার বাড়ছে কলকাতায়, ফলে অনেক নতুন নতুন রুট খুলছে। বাস যে বাড়বে, স্বাভাবিক!

সামনেই একটা বাস স্ট্যান্ড। সেখানেই গিয়ে দাঁড়াল সাইমন। এখানের থেকে কিছু একটা পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। সাইমন অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তেমন কিছুই আসছে না। সাইমন ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হতে লাগল। শতানিক বাসু ওর শেষ লাইফ লাইন। এটাকে মিস করা যাবে না একদম। তা হলে বিপদ হবে। অসহায় বোনটাকে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ও দেখল বাস আসছে একটা, কিন্তু এটা পার্ক স্ট্রিট মোড় অবধি যাবে। নিমেষে কর্তব্য স্থির করে নিল ও। তাই সই, সাইমন উঠে পড়ল বাসে। আর অপেক্ষা করা যাবে না। ও চায় না শতানিক বাসু ওর জন্য অপেক্ষা করুন।

একটা সিট জুটে গেল সাইমনের। বোর্ডটা কোলে নিয়ে বসে পড়ল ও। ভেতরে ভেতরে একটু টেনশন হচ্ছে ওর। রাত জেগে বিজ্ঞাপনের লে-আউটের কাজটা করেছে সাইমন। শতানিকের দেওয়া হাজার টাকার পরেও ওর নিজের পঞ্চাশ টাকার মতো রং, তুলি, আর কাগজের পেছনে বেরিয়ে গেছে। এখন কে জানে শতানিকের পছন্দ হবে কি না। মাঝে মাঝে সাইমন ভাবে কী দরকার ছিল ওর এই লাইনে আসার?

ছোটবেলা থেকেই একাচোরা থাকত সাইমন। ওদের অঞ্চলের কোনও বাচ্চাই ওর সঙ্গে বিশেষ মিশত না। বরং মাকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলত ওকে। এমনকী পাড়ার বড়দেরও বলতে শুনেছে যে, ওর মা দারুণ 'মাল' ছিল। বড়রা আফশোস করে বলত যে, তাদের কপাল খারাপ যে, কেউ তারা ওর মাকে বিছানায় নিতে পারেনি। তাই এইসব নোংরামোর থেকে দূরে থাকার জন্য স্কুল ছুটির পরে, গ্রামের শেষে ভাঙা গড়ে, একা একাই যেত সাইমন। সেই শেষ বিকেল, সেই ভাঙাচোরা স্থাপত্য আর নির্জনতায় বসে নিজের মনে গোমরাত ও। এত কিছু বলার ছিল ওর, এত কিছু জানাবার ছিল অন্যদের, কিন্তু কেউ আমলই দিত না ওকে। এই রকমই এক বিকেলবেলা সেই নির্জন গড়ে বসে পেনসিল দিয়ে অঙ্ক খাতার পেছনে ছবি এঁকে ফেলেছিল সাইমন। এঁকেছিল, সূর্যাস্তের নীচে ভাঙা গড়ের মাথার ওপর শকুন উড়ছে। দু'দিনের পরে অঙ্ক স্যারের চোখে আঁকাটা পড়ে। টিফিনের সময় উনি

BanglaBook.org

ডেকে পাঠিয়েছিলেন সাইমনকে। খুব ভয় হয়েছিল সাইমনের। ভেবেছিল, এবার নির্ঘাত মার খাবে ও। নিশ্চয়ই অঙ্ক ভুল করেছে। দুর্বল হাঁটু নিয়ে টিচার্স রুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সাইমন। স্যার অঙ্ক খাতার শেষ পাতাটা খুলে ধরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এটা তোমার আঁকা?"

ভয় পেয়ে সাইমন বলেছিল, "স্যার, আর আঁকব না আমি।'

স্যার হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "না না অবশ্যই আঁকবে তুমি। একশো বার আঁকবে। আমি জানতে চাইছি এই ভাঙা গড়টার মাথায় তুমি শকুন উড়তে দেখেছ?"

এতক্ষণে সাহস এসেছিল সাইমনের। ও বলেছিল, "না দেখিনি, কিন্তু মনে হল তাই আঁকলাম।"

"কী মনে হল?" স্যার জানতে চেয়েছিলেন।

"মনে হল গড়টা তো মরে গেছে, শকুন উড়ছে তার মাথায়। রেল মাঠে মোষ মরে গেলে যেমন শকুন ওড়ে না স্যার? তেমন।"

স্যার বলেছিলেন, "দিস ইজ আর্ট। সবাই যা দেখছে, তুমিও সেটাই দেখছ, কিন্তু এমনভাবে যে, তাতে নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। বুঝলে কিছু?"

"না স্যার।" মাথা নেড়েছিল সাইমন।

স্যার বলেছিলেন, "বোঝার দরকারও নেই। বরং বেশি বুঝলে তার দ্বারা আর বিশেষ কিছু হয় না। তুমি এঁকে যাও, যা খুশি আঁকো। আর মাঝে মাঝে আমায় দেখিও। কেমন?"

এর পরের দিনই স্যার ক্লিপবোর্ড, খাতা, পেনসিল আর রং কিনে এনে দিয়েছিলেন সাইমনকে। সে-দিন থেকে সাদা পৃষ্ঠাই হয়ে গিয়েছে সাইমনের পৃথিবী আর রং হয়ে উঠেছে ওর ঋতু। সেই অঙ্কের স্যার এখন কোথায় কে জানে? ও ক্লাস টেনে উঠতে উঠতেই স্যার স্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন ও বুঝতে পারে ওর ভেতরের আর্টিস্ট সাইমনকে জাগিয়ে গিয়েছিলেন উনিই।

"এই যে দাদা, টিকিটটা।" সাইমন মুখ তুলল। কনডাক্টর। বাঁ হাতের আঙুলের মধ্যে টাকাগুলোকে লম্বা করে ভাঁজ করে জড়িয়ে রেখেছে। আর বুড়ো আঙুল দিয়ে মুঠোয় ধরে থাকা টিকিটগুলোর মাথায় ঘষে ছিড়িক শব্দ করছে। সাইমন পকেট থেকে টাকা বের করে স্টপেজের নাম বলল। টিকিট দিয়ে কনডাক্টর ছিড়িক ছিড়িক করতে করতে অন্য দিকে চলে গেল।

BanglaBook.org

জানলা দিয়ে দেখল সাইমন। ভবানীপুর। এখানেই তো থাকে ও। হঠাৎ ওর প্ল্যানেটোরিয়ামের কথা মনে পড়ে গেল। বাড়িওলা বলেছে একত্রিশ তারিখের মধ্যে গত কয়েক মাসের ভাড়া বাবদ দু'হাজার টাকা দিতে হবে। ও জানে এর পেছনে দোতলার ওই মোহন সেন লোকটার উসকানি আছে। লোকটা একটা আস্ত শয়তান। কত বয়স হবে? তিরিশ, একত্রিশ, কিন্তু এর মধ্যে লোকটার ভেতরটা পচে গেছে। লোকটা বাড়িওলাকে বুঝিয়েছে যে, সাইমন উঠে গেলে কোম্পানিকে বলে অনেক বেশি টাকায় ওপরের ওই ঘরটা ভাড়া নিয়ে নেবে ও। আর শুধু তাই নয়, ঘরটা মেরামত করে ছাদ ঢালাইও করে দেবে। এটাকে নাকি ও গেস্টরুম হিসেবে ব্যবহার করবে! সেই থেকে ওর পেছনে পড়ে আছে বাড়িওলা।

অবশ্য সাইমন জানে ওসব গেস্টরুম, ছাদ ঢালাই সব ঢপের কেত্তন। ওকে বের করে দেবার জন্যই এইসব করছে মোহন সেন। ও চলে গেলে ওই বদমাশটা মোটেও আর ওই শতছিন্ন চিলেকোঠা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কেন মোহন সেন সাইমনকে তাড়াতে চায়? এ-রহস্য কেবলমাত্র সাইমন জানে।

রাত জেগে ছবি আঁকার সময় প্রায়ই দোতলায় হুটোপাটি, চিৎকার আর চাপা কান্না শুনত ও। বিরক্ত লাগলেও তেমন আমল দিত না সাইমন। ভাবত অন্যের ব্যাপারে নাক না গলানোই ভাল। কিন্তু এক রাতে ব্যাপারটা চরমে ওঠে। সেই চিৎকার আর কান্নাটা মাত্রা ছাড়িয়ে উপচে পড়ছিল চারিদিকে। তার সঙ্গে অদ্ভুত ভোঁতা শব্দও আসছিল মাঝে মাঝে। সাইমন রং-তুলি ছেড়ে চুপ করে বসেছিল। মাথার ভেতরে টোকা মারছিল রাগ। কাঁহাতক আর রোজ রাতে এই বউ পেটানোর চিৎকার সহ্য করা যায়!

হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে ধুপধাপ একটা শব্দ বেয়ে উঠছিল ওপরে। তার সঙ্গে 'বাবা গো বাঁচাও' বলে চিৎকার আসছিল নারী কণ্ঠে। চেয়ার ছেড়ে উঠে হাতের পাশের বড় স্টিলের স্কেলটা নিয়ে ছাদে বেরিয়ে এসেছিল সাইমন। রাতের আবছা অন্ধকারে ও দেখেছিল নাইটি পরা শ্রেয়া বউদি কুঁকড়ে বসে আছে ছাদের মেঝেতে আর মোহন সেন চিৎকার করে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে এলোপাথাড়ি লাথি মারছে তাকে। এই দৃশ্যের সামনে আর রাগ সামলাতে পারেনি সাইমন। সোজা গিয়ে ধাক্কা মেরে মোহন সেনকে ফেলে দিয়েছিল মেঝেতে তারপর হাতের স্কেল দিয়ে বেধড়ক মার

BanglaBook.org

দিয়েছিল। মার খেয়ে নীচে পালাতে পালাতে মোহন বলেছিল, "শুয়োরের বাচ্চা দেখে নেব তোকে।"

সাইমন পালটা বলেছিল, "পোঁদে বাঁশ দিয়ে শহিদ মিনারে টাঙিয়ে দেব তোমায়। বউ পেটাচ্ছ? পুলিশকে বললে আস্ত নারকোল গাছ পেছন দিয়ে ঢুকিয়ে দেবে। ফারদার যদি নোংরামো করো বাঞ্চোত, বুঝিয়ে ছাড়ব সাইমন রুপেন মণ্ডল কে!"

সেদিন অতগুলো কথা কীভাবে বলেছিল আজও ভাবলে অবাক লাগে সাইমনের। হয়তো সারাজীবনের হতাশা, ব্যর্থতা, কষ্টগুলোই বেরিয়ে এসেছিল সেদিন। মোহনকে পেটানোর পর অদ্ভুত এক শান্তি পেয়েছিল সাইমন। এখন ও বোঝে মানুষের ভেতরের হিংস্র প্রাণীটা মাঝে মাঝে মারামারি করতে চায়। আহার, নিদ্রা, মৈথুনের মতো লড়াইটাও, অপ্রিয় হলেও মানুষের জান্তবতার প্রমাণ। জানলা দিয়ে মাথা নিচু করে দেওয়ালে বিশ্বশান্তির পোস্টার দেখল সাইমন। হাস্যকর! জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই আর মৃত্যু ছাড়া শান্তি নেই কোথাও।

সেই ঘটনাটা নিয়ে মোহন সেন হইচই করেনি একদম। কারণ ও বুঝেছিল যে, এতে ওর নিজের বিপদটাই বেশি হবে। কিন্তু ও অন্য একটা পন্থা ধরেছিল। বাড়িওলাকে ক্রমান্বয়ে তাতাচ্ছিল সাইমনকে তুলে দেবার জন্য। এত দিনে মওকা পেয়েছে। আর মাত্র সাতটা দিন সময় আছে। তার মধ্যে দু'হাজার টাকা দিতে না পারলে ওকে বের করে দেওয়া হবে রাস্তায়। জিতে যাবে বউ-পেটানো মোহন সেন।

পার্ক স্ট্রিটে নেমেই একজনকে সময় জিজ্ঞেস করল সাইমন। দশটা পঁচিশ। ও প্রাণপণে হাঁটতে লাগল। এই রাস্তাটা সবসময়ই কেমন স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। চারিদিকে বড় বড় বাড়িঘরের মধ্যে কেমন ড্যাম্প ধরা রাস্তা একটা। ফুটপাথে বেশ ভিড়। তার মধ্যে দিয়ে দ্রুত পা চালাতে লাগল সাইমন। ঠিক সময়ে পৌঁছোতে না পারলে খুব খারাপ ইমপ্রেশন পড়বে।

পার্ক স্ট্রিট থেকে ক্যামাক স্ট্রিটে ঢুকেই কয়েকটা বাড়ি পরে অ্যাডগ্ল্যাম। সেখানে যখন পা দিল সাইমন তখন দশটা পঁয়ত্রিশ বাজে। সামনের রিসেপশনে আজ একটা নতুন মেয়ে বসে রয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নাম বলল সাইমন। বলল, "মিস্টার শতানিক বাসুর

BanglaBook.org

সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।"

মেয়েটা সুরেলা ইংরেজি তুলল গলায়, "জাস্ট আ সেকেন্ড প্লিজ।" তারপর পাশে রাখা ইন্টারকমটা তুলে সাইমনের উপস্থিতি জানিয়ে দিল শতানিককে। শতানিকের উত্তর শুনে ফোনটা নামিয়ে রাখল মেয়েটা, তারপর সাইমনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইউ মে গো ইনসাইড, মিস্টার বাসু ইজ ওয়েটিং ফর ইউ।"

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সাইমন। চকচকে কাঠের টেবিলের ও-পাশে বসে রয়েছেন শতানিক। আজও জামাকাপড় নিখুঁত। চুল পাট করে আঁচড়ানো। দাঁতে কামড়ে ধরা চুরুট। সাইমনকে হাত দিয়ে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন উনি। সাইমন সংকুচিত হয়ে বসল। শতানিক হাত বাড়ালেন, "দেখি।"

ড্রইংহোল্ডারটা খুলে একটা রোল বের করল সাইমন, তারপর এগিয়ে দিল শতানিকের দিকে। শতানিক টেবিলের ওপর জায়গা করে ড্রইংগুলো খুললেন, "এ কী! এ কী করেছ?"

সাইমন বুঝতে পারল না ঠিক, "কেন স্যার?"

"এ তো স্কেচ। ফাইনাল জিনিস কই?"

"স্যার স্কেচই তো করব। কনসেপ্টটা তো এতেই আছে, এইবার গোটা ব্যাপারটাকে কম্পিউটারে বসে অ্যানিমেশনে ট্রান্সফার করে দেব।"

"সে কী, তোমায় তো আমি সম্পূর্ণটা পেপারে করে দিতে বলেছিলাম। বলেছিলাম এজন্য তোমায় দু'হাজার টাকা দেব।"

"দু'হাজার?" সাইমনের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

"হ্যাঁ। না তো কি দু' লক্ষ নাকি? এসব কী করেছ তুমি?"

"স্যার, আপনি তো জিজ্ঞেস করেছিলেন আমায় যে, আমি কম্পিউটারে অ্যানিমেশন জানি কি না।"

"অ্যানিমেশন? আমি বলেছিলাম?"

"হ্যাঁ স্যার, বললেন এখানকার সেট-আপ-এ বসে কাজ করতে হবে। আট হাজার টাকা দেবেন পুরো কাজটা করে দিলে।"

"আর ইউ ড্রিমিং অর হোয়াট? শোনো, এই কাজের জন্য দু'হাজার দিতে পারি আমি। ইউ ডু ওয়ান থিং, এগুলো রেখে যাও। টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি।"

BanglaBook.org

সাইমন উত্তর না দিয়ে শতানিকের সামনে বিছানো ড্রইংগুলো টেনে নিল নিজের দিকে। তারপর গোল করে গুটিয়ে ভরে নিল ড্রইংহোল্ডারে। এগুলো রেখে যাওয়ার মানে তো গোটা কাজটাই করে দেওয়া। এরপর যে কেউ তো এই কাজটাকে অ্যানিমেট করে দেবে।

শতানিক বললেন, "ভেবে দেখো কী করবে। বড়জোর টোয়েন্টি সিক্সথ অবধি সময় দেব আমি। যদি মত পালটাও তা হলে এসো। বাট টু থাউজেন্ড ইট ইজ। নট আ পেনি মোর।"

একটা রাগ দপদপ করছে সাইমনের মাথায়। মাথা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। এটা সুট-পরা জানোয়ার একটা। সবাই মিলে কী পেয়েছে এরা? যা খুশি তাই করবে? গ্রামে জেঠু জেঠিমা, বাড়িতে মোহন সেন, এখানে শতানিক বাসু, সব কি শয়তানের ঔরসজাত? কেন এরা করে এমন? ও কী করবে? একত্রিশ তারিখের মধ্যে বাড়িওয়ালাকে টাকা জমা দিতে হবে। এখানে যে-টাকার কথা বলছে তাতে সেটা হলেও, তারপর? বোনটার জন্য বাড়িতে কী পাঠাবে? পরের মাসের বাড়িভাড়া কী করে দেবে? সারামাসটা কী খাবে ও? তা ছাড়া কথার খেলাপ করে কম টাকায় কাজ করতে রাজি হবে কেন? সম্মান বলে কি জীবনে কিছু নেই? সব জায়গায় কি মাথা নামিয়ে বাঁচতে হবে?

রাস্তায় এসে দাঁড়াল সাইমন। হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মাথার চুল। রোদ মিটিমিটি হাসছে ওর অবস্থা দেখে।

দূরে বড় একটা দোকানের বাইরে দু'জন মানুষ সান্টাক্লজ সেজে দাঁড়িয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছে। সাইমন ছোটবেলায় শুনত সান্টাক্লজ, ক্রিসমাসের আগে সবার মনের ইচ্ছে পূরণ করতে নেমে আসে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অন্য মানুষদের কথা জানে না কিন্তু ওর জন্য কোনও স্যান্টাক্লজ কোনওদিন নেমে আসেনি। ওর মা ফিরে আসেনি, বাবা মুক্ত হতে পারেনি বিষণ্ণতা থেকে, বোন কোনওদিন খাট থেকে নেমে আসতে পারেনি এক মাঠ প্রজাপতির মধ্যে। স্যান্টাক্লজ চিরকাল গল্পের বইয়ের পাতায়, টেলিভিশনের স্ক্রিনে আর বড় দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে রইল। বোনটা কী করছে এখন? ওর জন্য খাটের মধ্যে জড় বস্তুর মতো শুয়ে অপেক্ষা করছে? কী ভাবছে বোন? সাইমন কি জাদুদণ্ড নিয়ে এসে আমূল বদলে দেবে ওদের এই ভাঙাচোরা জীবনটাকে! কী ক্ষমতা আছে ওর? এই কলকাতা শহরে কে ও?

ও, সাইমন রুপেন মন্ডল, শিল্পী। শিল্পী না ভিখিরি? ভিক্ষে দিতে চান

BanglaBook.org

শতানিক বাসু? ও দেখল শতানিক বাসু অফিস থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে যাচ্ছেন নিজের গাড়ির দিকে।

শতানিক: ২৪ ডিসেম্বর, সকাল পৌনে এগারোটা

গাড়ির দরজাটা খুলে একবার ফুটপাথে দাঁড়ানো ছেলেটার দিকে তাকাল শতানিক। ফরসা ছেলেটার মুখচোখ লাল হয়ে আছে। হওয়ারই কথা, মনে মনে হাসল ও, যা প্যাঁচ দিয়েছে! হুঁঃ, আট হাজার টাকা? ওর বাবা কোনওদিন অত টাকা দেখেছে একসঙ্গে? চাইলেই হল, না? অমনি যেন টাকাটা দিয়ে দেবে ও! টাকা যেন খোলামকুচি, যেন বাড়ির দেওয়ালের নয়নতারা। শালা, মনে মনে গাল দিল শতানিক।

তবে একটা ব্যাপার ঠিক। ছেলেটার হাতের কাজ ভাল। যথেষ্ট ভাল কাজটা করেছে ও। কিন্তু তা হলেও কি ওর কথা মানা যায় নাকি? এ পৃথিবীতে একটা জিনিসই চলে। তা হল অর্থ। যার হাতে অর্থের পরিমাণ বেশি, তার জোর, প্রতিপত্তি, সব বেশি। মানি কন্ট্রোলস। এই সাইমন ছেলেটাকে দেখেই একটা হা-ঘরের ছেলে মনে হয়। শতানিক তো দু'হাজার বেশি বলেছে। ওর তো হাজার টাকা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার পরে মন বদলায়। যদিও হাতে সময় কম, তা হলেও ও জানে ছেলেটা ফিরে আসবে। এদের কাছে দু'হাজার টাকাও কম নয়।

গাড়ির মধ্যে বসে রিয়ার-ভিউ-মিররে আবার ছেলেটাকে দেখল শতানিক। মুখটা এখনও লাল হয়ে আছে। ও বুঝল, দু'হাজার টাকাটা কম হলেও, সেটার লোভও ছাড়তে পারছে না সাইমন। কাম অন, নিজের মনে বলল ও, ছাব্বিশ তারিখ রোববার এসো অফিসে। হ্যাঁ, রোববার অফিস খোলা রাখে শতানিক।

ও গাড়িটা স্টার্ট করল। এবার একবার রাসবিহারী মোড়ে যেতে হবে। ওর ডেনটিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। দাঁতে সুড়ঙ্গ কাটছে জীবাণু। গাড়িটা নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে ঢুকল শতানিক। সামনের দিনটার কথা ভেবে মনে মনে এক্সাইটেড হল ও। ডেনটিস্টের ওখানে আধ ঘণ্টার মতো কাজ আছে। তারপর ও যাবে এক্সাইড মোড়ে। মেহের বলে একটা মেয়ে অপেক্ষা করছে। ওয়ান্নাবি মডেল। ইজি প্রে। নিজের মনে হাসল শতানিক। দারুণ ফিগার

BanglaBook.org

মেয়েটার, গ্রেট বুব্‌স। আজ মেয়েটার সঙ্গে সেটিং করবে ও। উত্তেজিত হয়ে উঠল একটু। গাড়ি চালাতে চালাতেই কোটের পকেটে হাত দিল শতানিক। ছোট্ট কৌটোটা আছে তো? আছে। খুব দামি ওষুধ। বিদেশ থেকে আনানো সেক্সুয়াল পোটেন্সি বাড়ায়। মেহের উইল ফিল ইট টুডে।

মেয়েটা একটু বোকাটে ধরনের। একটা পার্টিতে দেখা হয়েছিল। শতানিকের অ্যাড এজেন্সি আছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে একটা ফাইল বের করে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "এই যে আমার প্রোফাইল আছে এতে, একটু দেখবেন?"

"শিয়োর।" বলে হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিয়েছিল শতানিক। মেয়েটা দুর্দান্ত সুন্দরী, ও ভেবেছিল দেখা যাক এর ছবি কেমন ওঠে। ফাইলটা খুলে কিছুক্ষণ ছবিগুলো দেখেছিল শতানিক। সবই সাদামাটা ছবি। তবে মেয়েটা সুন্দরী বলেই উতরে গেছে। ও বলেছিল, "দেখো, এসব দিয়ে কিন্তু হবে না। এতে সেই পাঞ্চটা নেই। জানো তো এখনকার মেয়েরা অনেক বোল্ড। অনেক সাহসী ছবি তোলে তারা। তোমার একটা ড্রেসও অফ-শোল্ডার নয়। সব কটার লেন্থ হাঁটুর নীচে। ইউ মাস্ট প্রেজেন্ট ইওরসেল্ফ ইন আ স্টাইল। আর একটা সমস্যা আছে, এতে তোমার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্সটা লেখা নেই। সেটা তো লিখতে হবে।"

মেয়েটার মুখটা লাল হয়েছিল সামান্য। ও জিজ্ঞেস করেছিল, "ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্সটা দিতে হবে?"

"বাঃ, দেবে না? সেটা তো মেজর পয়েন্ট একটা। তা কত তোমার মাপ?"

মেহের ঠোঁট কামড়ে বসেছিল খানিকক্ষণ। শতানিক মনে মনে বলেছিল, চৌত্রিশ, আঠাশ, ছত্রিশ। মেহের বলেছিল, "চৌত্রিশ, উনত্রিশ, ছত্রিশ।"

"উনত্রিশ?" ভুরু তুলেছিল শতানিক, "এটা কমাতে হবে। এখনও সবাই 'আওয়ার গ্লাস' ফিগার খোঁজে। ইউ শুড জয়েন আ জিম। ঠিক আছে, আমি বলে দেব। আমার চেনাশুনো জিম আছে কয়েকটা।"

মেহের কৃতজ্ঞ হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে, বলেছিল, "থ্যাঙ্ক ইউ। আর কী করতে হবে।"

পকেট থেকে চুরুট বের করে মুখে দিয়েছিল শতানিক, তারপর বলেছিল, "একটা এক্সক্লুসিভ ফোটো শুট করতে হবে। না, এসব হাবিজাবি ড্রেসে নয়। সুইমওয়্যারে।"

BanglaBook.org

"মানে বিকিনি?" একটু থমকে গিয়েছিল মেহের।

"এনি অবজেকশন? দেখো, এইসব মিডলক্লাসনেস বাদ দাও। ইউ হ্যাভ আ গুড ফিগার। ফ্লন্ট ইট। আর এটা তো পার্ট অব ইয়োর জব। এর মানে তো এই নয় যে, তোমায় সুইমওয়্যারে দেখে লোকে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। উই আর অল প্রফেশনালস হিয়ার। আমাদের ন্যুড শুটও করতে হয়। ইটস অল ইন বিজনেস মাই ডিয়ার। ডোন্ট গেট স্কেয়ারড। আসলে তোমার জন্য একটা প্ল্যান এসেছে মাথায়। তাই এই শুটটা জরুরি।"

"প্ল্যান?" এগিয়ে বসেছিল মেহের, "কী রকম?"

"আমার হাতে একটা ভীষণ বড় ক্যাম্পেন আছে। একটা সফ্ট ড্রিঙ্কসের। সেটা নিয়েই একটা আইডিয়া আছে আমার।" সরাসরি মেহেরের বুকের দিকে তাকিয়ে বলেছিল শতানিক। ও লক্ষ করছিল, মেহেরের চাপা গেঞ্জির ওপর দিয়ে জেগে উঠেছে স্তনবৃন্ত। মনে মনে হেসেছিল শতানিক, মেয়েটা ভেতরে ভেতরে এক্সাইটেড হয়ে উঠেছে।

মেহের জিজ্ঞেস করেছিল, "কী আইডিয়া?"

"এই অ্যাড ফিল্মে বলিউড থেকে একজন নামকরা নায়িকাকে আমরা সাইন করছি। ভাবছি তোমাকেও নিই। একদম প্যারালাল ইমপরট্যান্স। আসলে তোমার লুকসটা এখানে ভাইটাল। পুরোটাই শুট হবে ক্যারাবিয়ানসে। সান, স্যান্ড অ্যান্ড সার্ফ। বিচ শুটিং। বিকিনি তো পরতেই হবে। তাই যদি একটা ফটো শুট আমরা ওইরকম টু-পিসে না করি, তা হলে বুঝব কী করে যে, তোমায় মানাচ্ছে কি না? আমার মুখের কথায় তো সফ্ট ড্রিঙ্কসের কর্তারা তোমায় নেবে না। এখন ইউ ডিসাইড। কী করবে?"

শতানিক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। অপেক্ষা করছিল মেয়েটাকে চিন্তা করতে দিয়ে। মনে মনে হাসি পাচ্ছিল ওর। বলিউড? ক্যারাবিয়ানস? সান, স্যান্ড অ্যান্ড সার্ফ? নিজের মিথ্যে বলার পারদর্শিতায় নিজেই চমকে উঠছিল। ক্যাম্পেনটার কিছুই হয়নি আর ও অতগুলো কথা বলে দিল? অবশ্য নিরুপায় ছিল শতানিক। মেহেরের গেঞ্জির ভেতরে ওই দুটো মাখনের তাল খুব টানছিল ওকে। আসলে যৌনতা আর টাকা, এই দুটোই শতানিকের দুর্বলতা। ও ভাবছিল মেয়েটাকে বিছানায় নিয়ে যাবার পথ অনেকটা মসৃণ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

মেহের মাথা তুলেছিল এবার, বলেছিল, "ওকে, আমি রাজি। কবে তুলতে হবে ছবি?"

"কবে?" ছদ্মচিন্তার ভান করেছিল শতানিক। তারপর বলেছিল, "দেখো, আমায় একটু ফিক্সচারটা দেখে নিতে দাও। এক কাজ করো, চব্বিশে ডিসেম্বর, এই বারোটা নাগাদ এক্সাইড মোড়ে যে বড় রেস্টুরেন্টটা আছে, তাতে আসতে পারবে? আই উইল মিট ইউ দেয়ার। সেখানেই আমি তোমায় ডেটটা জানিয়ে দিতে পারব আশা করছি। তবে আমাকে তার আগে অন্যান্যদের সঙ্গেও একটু কথা বলতে হবে। আমি বললেই তো সবসময় ক্লায়েন্ট মেনে নেবে এমন নয়।"

"মানে? নাও হতে পারে?" মেহেরের মুখের আলোটা নিভে গিয়েছিল একটু।

মনে মনে হেসেছিল শতানিক। এটা ওর পুরনো ট্যাকটিক্স। সবসময় অন্যকে দোলাচলে রাখতে হয়। কক্ষণও তাদের কামফর্ট জোনে যেতে দিতে নেই। কর্পোরেট দুনিয়ার এই হচ্ছে নিয়ম। তুমি দেবে কি দেবে না, সেটা শেষ অবধি বুঝতে দিয়ো না প্রতিপক্ষকে। ও জানত যে, চব্বিশ তারিখে দেখা করে, সেই দিনটা ফটোশুট করতে হবে বলে ও চাপ দেবে মেহেরকে। বলবে, না হলে চান্স মিস করবে মেহের। ও জানে 'সফল হতে হবে' এই লোভটা নতুনদের দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেয়। ও বোঝে মেহের আচমকা পাওয়া এই প্রস্তাব ফেরাতে পারবে না। মেহেরকে নিয়ে মৌলালির কাছে ওর খালি ফ্ল্যাটটায় যাবে ও। তারপর, হি উইল টেস্ট দোজ গ্রেট বুব্‌স।

নিজের মনেই হাসল শতানিক। ও বরাবর স্মুথ-টকার। মেয়েদের বিছানায় নিয়ে যেতে কোনও সমস্যাই হয় না ওর। সেই এগারো ক্লাসে পড়ার সময় মায়ের বান্ধবী থেকে শুরু করে কলেজ লাইফে ওদের মিসেস সেনগুপ্তা, কেমিস্ট্রি টিচার, সবার সঙ্গে বিছানায় গিয়েছে ও। মিসেস সেনগুপ্তার ব্যাপারটা তো কলেজে কয়েক জন বন্ধুকেও বলেছিল ও। প্রমাণ স্বরূপ দেখিয়েছিল লুকিয়ে নিয়ে আসা মিসেস সেনগুপ্তার পারপ্‌ল কালারের প্যান্টি। বন্ধুরা ওর নাম রেখেছিল, স্যাটানিক।

তবে মেহেরকে চারটের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ তারপর ওকে যেতে হবে মিস্টার মোহন সেনের সঙ্গে দেখা করতে। বিশেষ বয়স না লোকটার কিন্তু এরই মধ্যে উন্নত প্রজাতির খচ্চর হয়ে উঠেছে। ওর সঙ্গে

BanglaBook.org

সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের এই ক্যাম্পেনটা নিয়ে একটা বন্দোবস্ত করেছে ও। এই ক্যাম্পেনে অ্যাডগ্ল্যামের প্রতিপক্ষ হিসেবে আছে বিটা অ্যাড। শতানিক জানে প্রাইস এখানে একটা ফ্যাক্টর হলেও, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কনসেপ্ট। ক্লায়েন্ট তিন জনের একটা রিভিউ বোর্ড তৈরি করেছে। তারাই দু'পক্ষের অ্যাড ক্যাম্পেনটা স্ক্রুটিনি করবে। মোহন সেন এ-সবের কো-অর্ডিনেটর। ও বলেছে, বোর্ডের দু'জন মেম্বারকে হাত করতে পারলেই নাকি কাজ পেয়ে যাবে শতানিক। তবে তার জন্য আড়াই লাখ টাকা লাগবে। এর মধ্যে বোর্ডের দু'জন কত নেবে আর মোহন সেন নিজে কত নেবে সেটা বলেনি। যেমন, মোহন সেন ওকে 'ঘুষ' কথাটাও বলেনি, বলেছিল, "এটা সার্ভিস চার্জ মাত্র।"

সেই সার্ভিস চার্জের একটা অ্যাডভান্স, পঞ্চাশ হাজার টাকা, আজকে তুলে দিতে হবে মোহন সেনের হাতে। লোকটা নাকি আজ ছুটি নিয়েছে অফিস। শুধু শতানিকের সঙ্গে দেখা করার জন্যই বাড়ি থেকে বেরোবে আজ। আসলে এর আগে একদিন টাকাটা দেবার কথা ছিল, কিন্তু শতানিক দেয়নি, ঘুরিয়েছে। মোহন সেন বলেছে আজ টাকা না পেলে নাকি এই ক্যাম্পেনটা লুজ করবে ও। বোর্ডের দু'জন নাকি রেগে গেছে খুব। শতানিক তাই চান্স নেবে না আর। মোহন সেন পার্ক স্ট্রিটের ম্যাগসে আসবে। সেখানে টাকাটা দিয়ে দেবে ওকে। এই কাজটা ওর চাই।

ও আজ সকালবেলায় একবার বিটা অ্যাড-এ ফোন করেছিল। ও চাইছিল ওদের অহন রয়ের সঙ্গে কথা বলে একবার। ফোনটা তুলেছিলেন প্রতুলবাবু। লোকটাকে দু'-একবার দেখেছিল শতানিক। বুড়ো, খেঁকুরে ধরনের চেহারা। ওর ইচ্ছে ছিল অহনকে এই কাজটা নিয়ে একটা প্রস্তাব দেওয়ার। কিন্তু প্রতুলবাবু ফোন ধরায়, ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছিল। প্রতুলবাবুকে ম্যানেজ করলে কেমন হয়? ও তাই ভণিতা না করে সরাসরি বলেছিল, "আমি আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে একটু দেখা করতে চাই।"

"আমার সঙ্গে?" অবাক হয়েছিলেন প্রতুলবাবু।

"হ্যাঁ, ওই অ্যাড ক্যাম্পেনটার ব্যাপারে। আমার একটা প্রস্তাব আছে আপনার জন্য। শুনলে আপনি আগ্রহ বোধ করতে পারেন।"

টেলিফোনের ওপারটা নিস্তব্ধ হয়েছিল খানিকক্ষণ। তারপর প্রতুলবাবু বলেছিলেন, "আমি কোনওরকম আগ্রহই বোধ করছি না। এবং করবও না। আপনি ভুল জায়গায়, ভুল লোককে, ভুল প্রস্তাব দিচ্ছেন।"

BanglaBook.org

একটু দমে গিয়েছিল শতানিক, ব্যাক ফায়ার করেছে ওর চালটা। লোকটা অমন নয় তা হলে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটাকে সামাল দিতে ও বলেছিল, "আপনি ভুল বুঝছেন আমায়। আমার প্রস্তাবটা হল এই, যে, এই ক্যাম্পেনটা আপনারা আমার জন্য ছেড়ে দিন, তার পরিবর্তে আপনাদের অন্য একটা কাজ পাইয়ে দেব আমি। আর জে গ্রুপ, নতুন একটা সুটিং-শার্টিং লঞ্চ করবে বাজারে। সেটার অ্যাড ক্যাম্পেন আপনাদের বন্দোবস্ত করে দেব। জাস্ট এখান থেকে শুধু শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ান আপনারা।"

প্রতুলবাবু একই রকম গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, "অহন এখনও অফিসে আসেননি। ও এলে ওর সঙ্গে কথা বলবেন আপনি। আয়াম নট দ্য ডিসিশন মেকার হিয়ার।"

শতানিক বলেছিল, "মিস্টার রয় এলে আমাকে একটা ফোন করতে বলবেন কাইন্ডলি?"

"বলব।" সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে ফোনটা রেখে দিয়েছিলেন প্রতুলবাবু।

কিন্তু অহন রয় ফোন করেনি। অহন রয়ের সঙ্গে আলাপ আছে শতানিকের। অহনের বয়স বছর তিরিশেক কিন্তু দেখলে আরও ইয়ং মনে হয়। লোকটাকে কেমন ভিতু বলে মনে হয়েছে ওর। ভিতু আর একটু মুখচোরা। পার্টিতে দেখলে মনে হয়, যেন আসার ইচ্ছে পর্যন্ত নেই এসব জায়গায়। মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে যেন আনা হয়েছে ওকে। পার্টিতে এক কোনায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ কোল্ড ড্রিঙ্কে চুমুক দেয় লোকটা। এমন ঠান্ডা, ম্যাদামারা লোক কী করে ব্যাবসা সামলায় কে জানে?

দশটা তিরিশ নাগাদ আবার ফোন করেছিল শতানিক। ভেবেছিল অহন রয়কে ম্যানেজ করতে পারলে আড়াই লাখ টাকা বেঁচে যাবে ওর। ফোনটা এবার একটা পিয়োন গোছের লোক ধরেছিল। শতানিক নিজের পরিচয় দিয়ে চেয়েছিল অহনকে। কিছুক্ষণ পরে ফোন ধরেছিল অহন রয়।

"মিস্টার রয় বলছেন? আমি অ্যাডগ্ল্যাম থেকে শতানিক বাসু বলছি।"

"হ্যাঁ বলুন।" শতানিকের মনে হয়েছিল অহনের কিশোর গলায় নার্ভাসনেস আছে একটা।

ও বলেছিল, "আয়াম ডাইরেক্টলি কামিং টু দ্য পয়েন্ট। আমি আপনাকে সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের ক্যাম্পেন সম্বন্ধে একটা অফার দিতে চাই। ভেরি সিম্পল ইয়েট প্রফিটেবল অফার।"

BanglaBook.org

"কী অফার?" অহন জানতে চেয়েছিল।

প্রতুলবাবুকে বলা কথাগুলোই আবার অহনের কাছে আরও গুছিয়ে বলেছিল শতানিক। সব শুনে একটু থমকে গিয়েছিল অহন। মনে মনে সময় গুনছিল শতানিক। ভাবছিল অহন কি টোপটা গিলল? টেলিফোনের প্রধান সমস্যা হল অন্যের মুখ দেখা যায় না। শতানিক ভাবছিল, অহনের মুখটা দেখতে পেলে ভাল হয়। মুখোমুখি কথা বলা সব সময়ই প্রফিটেবল। নিস্তব্ধতা ভেঙে কথা শুরু করেছিল অহন. "আর জে গ্রুপ? সেটা কী? নাম শুনিনি তো কোনওদিন।"

একটু থমকে গিয়েছিল শতানিক। ঘটনাটা ঠিক। এমন কোনও গ্রুপ নেই। এই রে, ওর মিথ্যেটা কি ধরে ফেলল অহন? মিথ্যেটাকে সামলাতে ও বলেছিল, "এটা পঞ্জাবের নতুন গ্রুপ অব কোম্পানিজ। এন আর আই-দের টাকাও আছে এখানে। দে আর কামিং ইন আওয়ার কান্ট্রি ইন আ ভেরি বিগ ওয়ে। আপনি মাসখানেকের মধ্যেই ওদের কথা শুনবেন। আর শুধু আপনি কেন? সবাই শুনবে। এখন আপনি রাজি থাকলেই হয়। উই ক্যান অল হ্যাভ আওয়ার শেয়ার অব মিট।"

"না মিস্টার বাসু, আমি এটা পারব না। সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের ক্যাম্পেনটা পেতে আমরা ট্রাই করব।"

শতানিক শেষ চেষ্টা করেছিল, "শুনুন মিস্টার রয়, আমি জানি আপনার মনে হচ্ছে ভবিষ্যতের কাজের আশায় আপনি এখনকার কাজ ছাড়বেন কেন! আমি হলেও এরকমই ভাবতাম। আপনি আমার চেয়ে অনেক জুনিয়র হলেও আই রেসপেক্ট ইয়োর থট, ইয়োর লজিক। আমিও আপনার সমস্যাটা বুঝি। তাই এ ব্যাপারে আমার একটা লেভেল টু প্রস্তাব আছে। হুইচ, অ্যাকর্ডিং টু মি, ইজ হাইলি এনটাইসিং অ্যান্ড হার্ড টু রেজিস্ট। আমি হলে তো অ্যাকসেপ্টই করে নিতাম।"

অহন জিজ্ঞেস করেছিল, "কী বলতে চাইছেন?"

একটা পজ নিয়েছিল শতানিক। তারপর নাটকীয়ভাবে বলেছিল, "ওয়ান ল্যাখ। এক লক্ষ টাকা। আপনি এই ক্যাম্পেন থেকে নিজেকে উইথড্র করে নিন আপনাকে এক লক্ষ টাকা দেব আমি। বুঝতে পারছেন তো? কোনও কাজ না করে প্রফিট? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট?"

অহন এক মুহূর্ত সময় নেয়নি আর "নো থ্যাঙ্কস" বলে অত্যন্ত

BanglaBook.org

অনাটকীয়ভাবে কেটে দিয়েছিল লাইনটা। যান্ত্রিক টুঁ টুঁ শব্দটা মাথায় এসে ধাক্কা মারছিল শতানিকের। ও ভেবেছিল, আড়াই লাখের বদলে এক লাখ দিলে কাজ হয়ে যাবে, কিন্তু না, সেই ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান। হাত দিয়ে মাথার চুলটা ঠিক করেছিল শতানিক। রাগ হচ্ছিল ওর, ভাবছিল আড়াই লাখ টাকা তা হলে দিতেই হবে! আর তখনই পাশের ইন্টারকমটা বেজে উঠেছিল শব্দ করে। রিসিভার তুলেছিল শতানিক। রিসেপশন থেকে জানিয়েছিল যে, ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সাইমন রুপেন মণ্ডল।

এগারোটা দশ। রাসবিহারী মোড় এসে গেছে প্রায়। মাড়ির ভেতরের দিকে দুটো দাঁত ভোগাচ্ছে খুব। শতানিকের দাঁতের সমস্যা চিরকালের। ডাক্তার বলেছেন চুরুট খাওয়া বন্ধ করতে, নিকোটিন নষ্ট করে দিচ্ছে দাঁত। জীবাণুরা পাতাল রেল বসাচ্ছে দাঁতে। কিন্তু ও শোনেনি। এখন মাঝে মাঝে দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি লাগে ওর। মাঝরাতে ব্যথাও করে। তখন ওর স্ত্রী সর্বাণী ওষুধ লাগিয়ে দেয়। সর্বাণীর কথা মনে পড়তেই মনটা খিঁচড়ে গেল শতানিকের। ফ্রিজ একটা। যেমন মোটা তেমন ঠান্ডা। ওর বাপের পয়সা না থাকলে কে বিয়ে করত ওকে? সর্বাণীর সঙ্গে বিয়ে হওয়াতেই তো শ্বশুরের এই ব্যাবসাটা পেয়েছে ও। সর্বাণী বোকাসোকা মানুষ। মাঝেমধ্যে জিনিসপত্র কিনে দিলেই খুশি। আর বিশেষ কিছু চায় না। শতানিক বাইরে কী করছে সে ব্যাপারে সর্বাণী মাথা ঘামায় না একটুও। সর্বাণীর কথা মনে পড়তেই হঠাৎ মেহেরের শরীরটা মনে ভেসে উঠল ওর। মেহের, দ্য গার্ল হু উইল স্যাটিসফাই হিম। শরীর কঠিন হয়ে উঠছে শতানিকের। কতক্ষণে যে মেহেরকে নিয়ে ওর মৌলালির ফ্ল্যাটে যাবে!

মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল এবার। ও ফোনটা তুলল। এঃ, মোহন সেন ফোন করেছে। লোকটা চাইনিজ জোঁকের বংশধর। ও ফোনটা কানে লাগাল, "হ্যাঁ বলছি?"

"আজ আসছেন তো?" জোঁকের গলায় মধু ঝরছে।

রাসবিহারী মোড়ের সিগনালটা খোলা। শতানিক রিয়ার ভিউ মিররে দেখল পেছন থেকে দুটো বাস রেষারেষি করে এগিয়ে আসছে খুব জোরে। হর্নও দিচ্ছে তারস্বরে। শতানিক দ্রুত বাঁ দিকে কাটাতে কাটাতে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আসব।"

BanglaBook.org

মোহন কিছু বলছে আরও, কিন্তু পেছনের বাস দুটোর রেষারেষি আর হর্নের শব্দে কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না ও। তবু ভাল করে শোনার জন্য ফোনটা কানে চেপে ধরতে গিয়ে সামান্য অন্যমনস্ক হল শতানিক। বাঁ দিকে টার্ন নিতে গিয়ে দেখল সামনে একটা বুড়ি পড়ে গেছে। বাস দুটোও প্রায় ঘাড়ের ওপর উঠে এসেছে। শতানিক প্রাণপণে বুড়িটাকে কাটাতে গেল। হাত থেকে ফসকে যাওয়া মোবাইল সামলাতে গিয়ে গাড়ির পাওয়ার স্টিয়ারিং এক ঝটকায় ঘুরে গেল বেশি। ওর গাড়িটা টাল সামলাতে না পেরে সোজা গিয়ে ধাক্কা মারল সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো অটোর পেছনে। দুটো অটো কাত হয়ে পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আর ধাক্কার চোটে শতানিকের মুখটা গিয়ে লাগল স্টিয়ারিং হুইলে। ওর মনে হল, চোখের নীচের হাড়টা যেন বোমা মেরে উড়িয়ে দিল কেউ। কেউ যেন চোখের ওপর টেনে দিল কালো একটা পরদা। মুহূর্তের নিকষ অন্ধকারে ওর সব তালগোল পাকিয়ে গেল। বুকেও ব্যথা করছে ভীষণ। শরীর অবশ হয়ে আসছে ক্রমশ। তার মধ্যেও তোবড়ানো গাড়ি থেকে বেরোবার চেষ্টা করল শতানিক। দেখল ডান পায়েও অসহ্য যন্ত্রণা করছে। গোড়ালির থেকে পায়ের পাতাটা লটপট করছে। হঠাৎ কারা জানি গাড়ির দরজা খুলে টেনে বের করল ওকে। তারপর ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল। "শুয়োরের বাচ্চা", "বাঞ্চোত", "হারামি", ইত্যাদির সঙ্গে বৃষ্টির মতো লাথি আর ঘুসি পড়ছে। শতানিক হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, ওর দোষ নেই, একটা বুড়ি সামনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ শুনছে না। চোখের তলার হাড়টায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, মনে হচ্ছে পা-টা নেই। তার ওপর মার পড়ছে দমাদম। মাথার ওপর ছোট্ট আকাশটা আরও ছোট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ওর। তারপর একসময় মারটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকেই। ফোলা চোখ, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে, শেষ বারের মতো খুলে শতানিক দেখল একটা লোক ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে জল ছেটাচ্ছে মুখে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বোম ২৪ ডিসেম্বর, সকাল এগারোটা আঠেরো

লোকটার চোখটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এল। চোখের তলাটা থেঁতলে গেছে একদম। মারের চোটে মুখটা ফুলে কামরাঙার মতো হয়ে আছে। লোকটার পরনে দামি কোট, প্যান্ট। বোম একবার গাড়িটার দিকে দেখল। গাড়ির সামনেটা একটা কোলাপসিবল গেটের মতো ভাঁজ খেয়ে গেছে। দুটো অটো ছাড়াও ফুটপাথের পাশে বসানো নতুন রেলিংটাতেও ধাক্কা মেরেছিল গাড়িটা। একটা অটো সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিল আর অন্যটায় লোক বসেছিল দু'জন। তাদেরও বেশ চোট লেগেছে, এক জন তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একটা স্বার্থপরের মতো চিন্তা এল বোমের মাথায়। দুটো অটো যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই জায়গায় একটু আগেই দাঁড়িয়ে ছিল ওর নিজের অটোটা। ভাগ্যিস...

আবার একবার গাড়িটাকে দেখল বোম। হাল ফ্যাশনের গাড়ি। ছোট্ট, দেখতে খুব ভাল, পেট্রোলও টানে কম, কিন্তু বড্ড পলকা। দেশলাই বাক্স ছুড়ে মারলে ট্যাপ খেয়ে যায়। যেভাবে ধাক্কা লেগেছে, মনে হচ্ছে ইঞ্জিনটা গেছে একদম। লোকটাও এই গাড়িটার মতো। মুখটা একদম রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। জল ছেটানোর পরে কপালের দিকটায় পরিষ্কার হয়েছে একটু।

বোম তো বাড়ি যাবে বলে রাস্তা পার হয়ে ট্রাম লাইনের ওপর ছিল। হঠাৎ একটা হইচই শোনে ও। দৌড়ে এসে দেখে সব ছত্রাখান অবস্থা আর এই লোকটা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। নেহাত সার্জেন্ট এসে পড়েছিল তাড়াতাড়ি। তাই রেহাই পেয়েছিল লোকটা। তবে এখনও প্রচুর লোকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জায়গাটা।

সার্জেন্টটা বয়সে তরুণ। মাঝে মাঝেই ওর ডিউটি পড়ে এখানে। বোম চেনে ওকে। নাম ইশাক। সবাই ইশাভাই বলে। মার থামার পর পাশের একটা ছোট দোকান থেকে জলের বোতল এনে লোকটার মুখে জল ছিটিয়েছে বোম।

পাবলিক এখনও রাগে গরগর করছে। অটোর থেকে পড়ে যাওয়া দু'জনের মধ্যে যে অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাকেও পাশের একটা বেঞ্চে শোয়ানো হয়েছে। পড়ে যাওয়া অটো দুটোকে সোজা করেছে কয়েকজন মিলে।

বোমের পাশ থেকে কানাই চিৎকার করল, 'মুতে দে শুয়োরের বাচ্চাটার মুখে। মোবাইলে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালাচ্ছে! শালা কোন রেন্ডির সঙ্গে

BanglaBook.org

গল্প করছিলি রে?" অন্যান্য লোকজনও ওর সঙ্গে হইহই করে উঠল। কানাই আবার বলল, "দিলি তো শালা আমার গাড়ির পাইনটা মেরে?"

বোম দেখল, ইশাভাই হাতের ওয়াকিটকিতে কথা বলছে। পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স আনা যে জরুরি, সেটাই বোঝাচ্ছে। বোম ভাবল লোকটা বাঁচবে তো? মুখে বীভৎস চোট লেগেছে, ডান পা-টা দেখে মনে হচ্ছে, গোড়ালির কাছটা ভেঙে গেছে নির্ঘাত। এ হসপিটাল কেস। কে জানে বুকের হাড়গোড় ভেঙেছে কি না! তবে লোকটাকে দেখে কষ্ট লাগল বোমের। কেউ কি ইচ্ছে করে অ্যাক্সিডেন্ট করে? কিন্তু আজকাল কী যে হয়েছে মানুষজনের। সবাই সবসময় রেগে আছে যেন। একটুতেই এ ওকে কামড়ে দেবার জন্য লাফাচ্ছে। এই লোকটা এমনিতেই প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল তার ওপর এভাবে কি না মারলে চলছিল না?

বোমের নিজেরও একবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। ওর অটোর গায়ে ধাক্কা মেরেছিল একটা মোটরবাইক। অটোয় একাই ছিল বোম। ব্যালেন্স হারিয়ে ফুটপাথে উঠে গিয়েছিল ওর অটো। একটা কাপড়ের পুতুল বিক্রেতার দোকানের ক্ষতি হয়েছিল। অটোটা ফুটপাথে উঠে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। বাঁ হাতটা ভেঙে গিয়েছিল বোমের। আজও কনুইয়ের কাছে একটা দাগ আছে। তখনও বিয়ে হয়নি বোমের। সেই প্রথম রেণু ওদের বাড়িতে এসেছিল ওকে দেখতে। ওদের সেই ছোট্ট ঘর, ভাঙা মেঝে আর ফাটা দেওয়ালও যেন ভেসে গিয়েছিল আলোয়। রেণু বলেছিল, "হাতের দাগটা থেকে যাবে তোমার।" তা, দাগ থেকে গেছে। তবে শুধু হাতের নয়। মানুষ তো শরীরের দাগ, জখমগুলোই দেখে শুধু, মনের খবর আর কে কবে রেখেছে! তবে এত দিন পরেও যন্ত্রণাটার কথা মনে পড়লে গা শিরশির করে ওঠে ওর। ব্যথায় টনটন করে কনুইটা। বুকটাও।

জলের বোতলটা পাশের একজনের হাতে দিয়ে ধীরে ধীরে ভিড় থেকে বেরিয়ে এল বোম। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। সোনাইটা অপেক্ষা করছে বাড়িতে। ও দ্রুত হাঁটতে লাগল। এখান থেকে বাড়ি যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না ওর। তবে গিয়ে রুচির কাছে ঝাড় খাবে নিশ্চিত। ও ভাবল, সোনাইটাও খুব টেনশনে থাকবে। ভাববে, দাদা এখনও এল না কেন? তবে একটা বাঁচোয়া। এখানে কালু ছিল না। থাকলে, বোম নিশ্চিত, কালু সব কিছু ছেড়ে লোকটাকে নিয়ে যেত হসপিটালে। ছেলেটা ওরকমই। কারও

BanglaBook.org

বিপদে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এইজন্যই ভাল লাগে ওকে। বোম জানে কালু হয়তো রোজগার কম করে, কিন্তু মনটা খুব ভাল ছেলেটার। একদম সাচ্চা ছেলে। ছেলেটার দিকে ও যত তাকায় ততই শ্রদ্ধা আসে। এমন সহজ মনের অকপট ছেলে ও কোনওদিন দেখেনি। না হলে অমন একটা কথা ও কোনওদিন বলতে পারত বোমকে!

লক্ষ্মী পুজোর পরের দিন ছিল সেটা। স্ট্যান্ডে এসে সারাদিন মনমরা হয়ে বসেছিল কালু। বিশেষ কথা বলছিল না ও। ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল বোম। ভেবেছিল, গতকাল রাতে, যখন ওদের বাড়ির পুজোতে গিয়েছিল কালু, তখন তো ঠিকই ছিল ছেলেটা, হঠাৎ কী হল? কালু অমন করে বসে রয়েছে কেন?

রাতে গাড়ি রেখে ঘরে ফেরার সময় কালুকে গিয়ে ধরেছিল বোম। জিজ্ঞেস করেছিল, "এই, তোর কী হয়েছে রে? সারাদিন অমন গোমড়া মুখে আছিস কেন?"

কালু মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। উত্তর দেয়নি কোনও।

আবার জিজ্ঞেস করেছিল বোম, "কী রে চুপ করে আছিস কেন? কী হয়েছে?"

কালু করুণ মুখে তাকিয়েছিল ওর দিকে। রাস্তার হলুদ আলোয়, বোম দেখেছিল, কালুর চোখ দিয়ে সরু জলের রেখা পড়ছে।

"কী হয়েছে তোর? কাঁদছিস কেন?" ঝাঁপ বন্ধ হওয়া একটা দোকানের সিঁড়িতে কালুকে ধরে বসিয়েছিল বোম।

কালু দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে বসেছিল। হালকা ফোঁপানির শব্দ পাচ্ছিল বোম। কালুর চওড়া পিঠটা মাঝে মাঝেই কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ওর পিঠে হাত রেখে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল বোম। কী হল ছেলেটার?

কালুকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিয়েছিল বোম। ভেবেছিল, বাড়িতে হয়তো ভয়ংকর কিছু একটা হয়েছে। সময় দিলে নিশ্চয় ঠিক হয়ে যাবে। রাত বাড়ছিল একটু একটু করে। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কমে আসছিল ক্রমশ। সিগনালের লাল-সবুজ আলো বদলে হলুদ হয়ে গিয়েছিল। সারাদিনের ধুলোবালি ক্রমে ক্রমে থিতিয়ে আসছিল শহরের ওপর।

একসময় কান্না থামিয়ে চোখ তুলেছিল কালু। এমন বিপন্ন, দুঃখিত চোখ

BanglaBook.org

কোনওদিন দেখেনি বোম। ও মাথায় হাত দিয়েছিল ছেলেটার, নরম স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, "এবার বল, কী হয়েছে?"

কালু হাতটা চেপে ধরেছিল ওর, কাঁপা গলায় বলেছিল, "খুব অন্যায় হয়েছে আমার, তুমি ক্ষমা করবে কি?"

"অন্যায়? আমি ক্ষমা করব?" এবার বোম অবাক হয়েছিল। অজানা আশঙ্কায় কাঁপছিল ওর বুক। বুঝতে পারছিল না, কী বলছে কালু।

কালু বলেছিল, "বউদি..."

"রুচি? কী হয়েছে?" বোম স্থিরভাবে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

"গতকাল তোমাদের বাড়িতে যাবার পর বউদি আমায় বলেছিল যে আশেপাশের বাড়িতে প্রসাদ দিতে..."

"জানি তো। তুই আর রুচি, দু'জনেই তো বেরিয়েছিলি। কী বলতে চাইছিস বল না, এদিক ওদিক কথা ঘোরাস না।" অধৈর্য লাগছিল বোমের।

"প্রসাদ দিয়ে ফেরার সময়," কালু থেমেছিল এক মুহূর্ত, "বউদি আমায়... তোমাদের বাড়ির পেছনের অন্ধকার জায়গাটায়... আমায়... চু... চুমু... খেয়েছে।"

জ্বলা-নেভা হলুদ আলো, রাস্তায় চলন্ত গাড়ি, মানুষের ইতস্তত শরীর, কলকাতার ওপর নেমে আসা ধুলোর চাদর সব থেমে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য। রুচি? চুমু? কালুকে? বোম কালুর দিকে তাকিয়েছিল নিষ্পলক দৃষ্টিতে। কী বলবে ও? কী বলার থাকতে পারে? জীবনে অদ্ভুত ঘটনার কি কোনও শেষ নেই?

বোমকে চুপ থাকতে দেখে কালু বলেছিল, "আমি চাইনি বোমদা। আমি ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিলাম বউদিকে, কিন্তু বউদি আমায় আঁকড়ে..."

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছিল বোম। বলেছিল, "আমায় বলছিস কেন? এসব আমায় বলছিস কেন?"

কালু নিচু হয়ে পা ধরেছিল ওর। বলেছিল, "আমি ঘুমোতে পারিনি কাল সারারাত। কষ্ট হয়েছে ভীষণ, এখনও হচ্ছে। তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও বোমদা। আমি খুব ভুল করেছি।"

বোম বলেছিল, "তুই তো ভুল করিসনি। তোকে কিছু বলার নেই আমার। ঠান্ডা মাথায় বাড়ি যা তুই।"

সে রাতে বোমের ভেতরের অবশিষ্ট মানুষটুকুও ভেঙেচুরে শেষ হয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছিল। একটা পাগলাটে রাগ মাথার মধ্যে ঢুকে তছনছ করে দিচ্ছিল সব কিছু। সারারাত ছটফট করেছিল বিছানায়। ঘরের ছোট্ট আলোয় ঘুমন্ত রুচির দিকে তাকিয়ে গা গুলোচ্ছিল ওর। মনে হচ্ছিল, এই তো বালিশ রয়েছে। এটাকে ওই মেয়েছেলেটার মুখের ওপর চাপা দিয়ে শেষ করে দিই একেবারে। ওর চামড়ার তলায় লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে হাঁটছিল, পেটের ভেতরে পাক দিচ্ছিল সাপ। খুব ইচ্ছে করছিল বালিশটা রুচির মুখের ওপর চেপে ধরতে। মনে হচ্ছিল, এই মেয়েছেলেটার বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।

ভোররাতের দিকে বিছানার থেকে উঠে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বোম। অল্প অল্প আলো-ফোটা শহর, দু'-চারটে উঁচু বাড়ির গায়ে দু'-এক পোঁচ রোদের রং, ধীরে ধীরে জেগে ওঠা পাখিরা, বোমের মনে হচ্ছিল, হয়তো রুচির এমন ব্যবহারের পেছনে ওর নিজের অপদার্থতাও রয়েছে। হয়তো ও সক্ষম নয় বলেই রুচি অন্য দিকে গিয়েছে। তবু ঘটনাটা ভুলতে পারছিল না বোম। ভোরের আলো ওকে ওর মানসিক সাম্য ফিরিয়ে দিয়েছিল মাত্র। কিন্তু রুচিকে ও ক্ষমা করতে পারেনি। ঠিক করেছিল ধীরে ধীরে সরে আসবে রুচির থেকে।

এর বেশ কিছু দিন পরে রুচিই একদিন রাতে, হঠাৎ ওর শরীর নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করেছিল। অনিচ্ছার সঙ্গে মরা গাছের মতো শুয়েছিল বোম। কিন্তু তবু রুচি চেষ্টা চালাচ্ছিল। শরীরে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় ঘষছিল ওর মুখ। জৈবিক নিয়মে মরা গাছের ডালেও পাতা বেরোচ্ছিল ধীরে ধীরে। রুচি বোমকে টেনে নিয়েছিল বুকের ওপর। প্রাণপণে ওর ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রাখার চেষ্টা করছিল রুচি। কিন্তু মুখ সরিয়ে নিচ্ছিল বোম। ওর মনঃসংযোগ সরে যাচ্ছিল। ও তবু দ্রুত শরীর নাড়াচ্ছিল। তেতো ওষুধের মতো শেষ করতে চাইছিল গোটা ব্যাপারটা। চোখ বন্ধ করে সমস্ত নগ্ন মেয়েদের কথা চিন্তা করার চেষ্টা করছিল ও। নিজেকে নিংড়ে বের করার চেষ্টা করছিল প্রাণপণ। তারপর একসময় হঠাৎ ছোট্ট বিস্ফোরণ হয়েছিল একটা। হাঁপাতে থাকা শরীরটা থেমে গিয়েছিল বোমের। রুচি তবু চেষ্টা করছিল। নীচের থেকে চাপ দিচ্ছিল ক্রমাগত। কিন্তু এবার বোম লাটাই গুটিয়ে নিচ্ছিল দ্রুত। এই মহিলার সঙ্গে শুয়েছে চিন্তা করেই বমি পাচ্ছিল ওর। রুচি বোমের নিষ্ক্রিয়তার মানে বুঝতে পেরেছিল। ও বোমকে বুকের ওপর থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, "এরই মধ্যে বেরিয়ে গেল? আমার তো গরমই হয়নি এখনও।

BanglaBook.org

তুমি পুরুষ মানুষ? না চেহারা, না কিছু। আমার সারাজীবন কাটবে কীভাবে বলো তো? এর চেয়ে কালুর সঙ্গে শুলে বোধহয় আরাম পেতাম।"

এই কথার কোনওরকম ব্যাখ্যা বা কারণ জানতে চায়নি বোম। ওর হঠাৎ মনে হয়েছিল, রুচির কাছ থেকে কোনও কিছু জানার বা ওকে কিছু জানাবার আর নেই। বোম সে রাত থেকে বুঝেছিল ও সম্পূর্ণ একা।

বাড়িতে ঢোকার মুখে ও দেখল সোনাই দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। ওকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, "দাদা, এত দেরি করলি কেন? প্রায় পৌনে বারোটা বাজে যে?"

সোনাইয়ের পেছনেই বেরিয়ে এল রুচি, "কী হল, এত দেরি করলে কেন? সবসময় একটা ক্যালানেগিরি না করলেই নয় তোমার, না?"

বোম মাথা নিচু করে বলল, "চল সোনাই। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।"

সোনাই কিছু বলার আগেই রুচি বলল, "শোনো, সোনাইকে দুটোর মধ্যে বাড়ি নিয়ে আসবে। ওকে নিয়ে স্যাকরার কাছে যাব। ওর চুড়ি বানাতে হবে। মনে থাকে যেন, দুটোর মধ্যে।"

বোম মাথা নাড়ল। মনে মনে একটা চাপা আনন্দ হচ্ছে ওর। স্যাকরার কাছে যাবে? যাও। কিন্তু তোমার সমস্ত আয়োজন আজ পণ্ড করে দেব আমি। ওই গোরাচাঁদকে রকেট ছাড়াই চাঁদে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি দাঁড়াও। সবসময় সবার ওপর খবরদারি, না? আজ সব খবরদারির মুখে লাথি মারব আমি।

বড় রাস্তায় এসে সোনাই বলল, "দাদা, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সেই এক্সাইড মোড় অবধি যেতে হবে। বাস পাব তো?"

বাস? মনে মনে হাসল ও। তারপর হাত তুলে চলন্ত একটা ট্যাক্সিকে থামাল। পেছনের দরজাটা খুলে সোনাইকে বলল, "উঠে পড় তাড়াতাড়ি।" সোনাই বিস্মিত মুখে উঠে বসল ট্যাক্সির পিছনে। বোম সোনাইয়ের পাশে উঠে ট্যাক্সিওলার উদ্দেশে বলল, "বারোটার মধ্যে এক্সাইড মোড়ে পৌঁছোতে পারলে দশটাকা এক্সট্রা দেব তোমায়।"

ছুটন্ত গাড়ির জানলার কাচ তুলে দিল বোম। হুহু করে হাওয়া ঢুকছে। আজ সকাল থেকেই হাওয়া দিচ্ছে খুব। শীত করছে বোমের। শীতকাল একদম ভাল লাগে না ওর।

BanglaBook.org

সোনাই বলল, "রেজিস্ট্রির পর কালুর সঙ্গে একটু ঘুরব রে?"

বোম হাসল, বলল, "আজ না। লেখাপড়া করে হলেও, আজ বিয়ে তো, আজ একদম ঘোরাঘুরি নয়। তা ছাড়া দেখলি না রুচি বলল দুটোর মধ্যে ফিরতে! জানিসই তো কী অশান্তি করে ও। তা ছাড়া আজ মহামিছিল আছে। ঘুরতে গিয়ে আটকে যাবি কোথাও। তার চেয়ে অন্য দিন ঘোরাঘুরি করিস। এখন তো সারাজীবন পড়ে রইল।"

সোনাই আবার বলল, "জানিস দাদা, এভাবে বিয়ে করতে একদম ইচ্ছে করছে না আমার। কিন্তু কী করব বল?"

সোনাইয়ের গলায় কান্নার রেশ। বোম হাত দিল বোনের মাথায়, বলল, "এসব ছাড়। এখন আর পিছিয়ে গেলে চলে? তা ছাড়া কালু খুব ভাল ছেলে।"

"আচ্ছা দাদা, পৌষ মাসে বিয়ে করছি, অমঙ্গল হবে না তো?"

বোমের হাসি পেল খুব। ভাবল বলে, "এই সময়ে, এই শহরে জন্মেছিস। এর চেয়ে অমঙ্গল আর কী হতে পারে?" ও বলল, "পাগলি একটা, সে-দিন যে বললি, এসব মানিস না? শোন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর বেরিয়েই যখন পড়েছিস তখন আর এসব চিন্তা করিস না।"

সোনাই বলল, "আজ না হয় বাড়ি ফিরে যাব, কিন্তু পরে যখন এ-খবর জানাজানি হবে? তখন? তখন কী হবে?"

বোম হাসল, "যা হওয়ার হবে। এখন এসব চিন্তা না করে একটু হাসি হাসি মুখ কর। অমন ছলছলে চোখ নিয়ে বিয়ে করে কেউ?"

ঠিক এগারোটা আটান্নয় ড্রাইভার ট্যাক্সিটাকে পৌঁছে দিল এক্সাইড মোড়ের বড় কাচের রেস্টুরেন্টের সামনে। মনে মনে খুশি হল বোম। মিটারে যত টাকা উঠেছিল তার সঙ্গে বাড়তি দশ টাকা এগিয়ে দিল লোকটার দিকে। লোকটা হেসে টাকা নিল, তারপর দশ টাকা বোমের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "এটার দরকার নেই। আপনি ঠিক সময়ে পৌঁছে গেছেন, এটাই যথেষ্ট।"

বোম টাকা হাতে ধরে অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবল, সবাই যে বলে, সব শেষ হয়ে গেছে, গলে, পচে, নষ্ট হয়ে গেছে, তা কি ঠিক নয়? এখনও কি আশা আছে তা হলে? এখনও কি কিছু মানুষ বেঁচে রয়েছে?

কিন্তু কালু কই? ওর তো এখানে দাঁড়াবার কথা। বোম সোনাইয়ের কনুইটা ধরে ভিড় ফুটপাথ দিয়ে দু'-এক পা করে এগোতে লাগল।

BanglaBook.org

"ক'টা বাজে?"

"অ্যাঁ?" অপ্রস্তুত বোম একটু চমকে গেল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ফরসা ছেলে। চোখটা অদ্ভুত রকম সবুজ। বোমের মনে হল ঠিক যেন একটা বিড়াল তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

ছেলেটা সোনাইয়ের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "ক'টা বাজে?"

"বারোটা, বারোটা বাজে।" ঘড়ি দেখে সংক্ষেপে বলল সোনাই।

"থ্যাঙ্ক ইউ।" ছেলেটা চলে গেল।

কিন্তু কালুর দেখা নেই যে। কোথায় কালু? বোম বলল, "কী রে সোনাই, কালু তো এল না এখনও! কী হবে?"

সোনাই চিন্তিত মুখে বলল, "চিন্তা করিস না, ঠিক আসবে।"

এ-দিক ও-দিক তাকাল বোম। এখানেই আসবে তো কালু? ঠিক জানে তো সোনাই? ভিড়ের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছে না ওকে? শেষ মুহূর্তে কোনও বিপদে পড়ল না তো? আড় চোখে সোনাইয়ের দিকে তাকাল বোম। হঠাৎ মনে হল কালু মিথ্যে কথা বলেনি তো সোনাইকে?

টিং টিং শব্দে পকেটের মোবাইল ফোনটা বাজল হঠাৎ। মুখটা বিকৃত হয়ে গেল বোমের। ওঃ, দিনের মধ্যে দশ বার রুচি ফোন করে! বিরক্ত হয়ে ফোনটা বের করে দেখল ও। আরে, না তো, এটা তো রুচি নয়। এটা তো অচেনা নম্বর। ফোনটা ধরল বোম, "হ্যালো।"

"আরে বোমদা, তোমরা পৌঁছে গেছ?"

ধড়ে প্রাণ এল বোমের, "কালু, তুই কোথায়? আমরা অপেক্ষা করছি যে।" ও দেখল সোনাই উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

কালু বলল, "তোমরা হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে এসো মিন্টো পার্কের দিকে। তবে এতটা হাঁটতে হবে না। তার আগেই বাঁ হাতে উড স্ট্রিট আছে। সেখানে অপেক্ষা করছি আমি। আমার বন্ধুরা রেজিস্ট্রারকে নিয়ে এখানেই আসবে। তাড়াতাড়ি এসো।"

ফোনটা কেটে সংক্ষেপে সোনাইকে পুরো ব্যাপারটা বলল বোম। সোনাই বলল, "তুই চিনিস তো রাস্তাটা?"

"আমি?" ঠোঁট চাটল বোম, "ঠিক চিনি না। তবে চল না জিজ্ঞেস করে নেব।"

সোনাই কতকটা নিজের মনেই বলল, "শুনেছিলাম বটে ওর কাছে। এই নামটাই বলেছিল মনে হয়। ওর বন্ধু না কে একটা অফিসে চাকরি করে এখানে।

BanglaBook.org

তার পেছনেই একটা এক কামরার ঘরে থাকে বন্ধুটা। সেখানেই কি সই-সাবুদ হবে?"

বোম সোনাইয়ের সঙ্গে হাঁটতে লাগল দ্রুত। ফুটপাথে বেশ ভিড়। কাল বড়দিন বলে আশেপাশের দোকানগুলো সেজেছে খুব। বোমের মনে হল, সব ঠিকঠাক মিটে যাবে তো? ওর যা কপাল, সব ভেস্তে না যায় শেষ মুহূর্তে! এই বিয়েটা হওয়া জরুরি। রুচিকে বোঝানো দরকার, ওর মর্জি মতো সব ঘটবে না পৃথিবীতে। একবার, অন্তত একবার হলেও দান পালটে দেবার ক্ষমতা রাখে বোম। ও ভাবল, তুমি যাকে চুমু খেয়েছিলে, যার সঙ্গে তুমি শুতে চেয়েছিলে, সে আসলে তোমার নয়। সে ভালবাসে সোনাইকে। রুচি, এখানে জিততে পারোনি তুমি। সবসময় তুমি জিততে পারো না।

একটা চওড়া রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। বাঁ দিকে একটা রেস্টুরেন্ট, তবে বন্ধ। এটাই কি উড স্ট্রিট? আশেপাশে তাকাল বোম। জিজ্ঞেস করা যাক কাউকে। সামনে একজন ভদ্রলোক আসছেন। বেশ সুন্দর দেখতে। এঁকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। বোম সোনাইয়ের কনুইয়ের কাছটা ধরে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে, "দাদা, উড স্ট্রিট কোথায়?"

লোকটা হাসল। ভারী সুন্দর দাঁতগুলো। লোকটা বলল, "এটাই তো উড স্ট্রিট। আপনি কত নম্বর খুঁজছেন?"

কিন্তু বোমকে উত্তর দিতে হল না, তার আগেই শুনল, "ও বোমদা এই যে, চলে এসো, চলে এসো।" কালু চিৎকার করে ডাকছে ওদের।

বোম কোনও উত্তর দেবার আগেই, সোনাই বোমের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে গেল কালুর দিকে। দৌড়ে যাওয়া সোনাইয়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বোম। দেখল কালুও দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সোনাইয়ের দিকে। এই হাত, যা একদিন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল রুচিকে। মনে মনে একবার রুচির মুখটা দেখল বোম। পরাজিত একটা মুখ। বোম ভাবল সবাই তোমার হাতের পুতুল নয়। সবাইকে তুমি হারাতে পারো না। সবাইকে ব্যবহার করতে পারো না খুশি মতো। বোম পকেট থেকে বের করল মোবাইল ফোনটা, তারপর নিচু হয়ে ঝাঁঝরিওলা ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিল যন্ত্রটাকে। যাও লাটাই, নিজের মনে বাজো। ও দেখল সুন্দর দাঁতের লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে অবাক হয়ে। বোম হাসল। হাওয়া বাড়ছে কলকাতায়। চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর। শীত

BanglaBook.org

করছে। তবু, খারাপ লাগছে না বোমের। ও বুঝতে পারছে, শীতকাল ঠিক ততটা খারাপ নয়।

অহন ২৪ ডিসেম্বর, দুপুর সোয়া বারোটা

এ কী করল লোকটা? মোবাইলটা ফেলে দিল? এরকম কোনও কাজ কাউকে কখনও করতে দেখেনি ও। একটু আগে যখন লোকটা ওকে 'উড স্ট্রিট কোথায়' জিজ্ঞেস করছিল, তখন তো ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে, এর পরে এরকম কিছু একটা ঘটতে চলেছে! ওই দেখো, লোকটা হাসছে আবার। পাগল নাকি? কিন্তু দেখে তো মনে হয় না যে পাগল! তা হলে? সকাল থেকে কী ঘটছে আজ? সবই কি আজ নিয়মের বাইরে যাবে? ও নিজেও তো অদ্ভুত একটা কাজ করেছে অফিসে। কোনওদিন ভাবতে পেরেছিল এমনটা ও বলতে পারবে? কোনওদিনের কথা বাদ দাও, আজ সকালেও কি বুঝতে পেরেছিল ও?

সামনের বড় বাড়ির গেটটা দিয়ে এবার ঢুকল অহন। সিঁড়ির মুখে সিকিউরিটির লোক বসে রয়েছে দু'জন। খাতা খোলা, তার পাশে পেন। অর্থাৎ নাম-ধাম লিখতে হবে। অহন এগিয়ে গিয়ে খাতায় নিজের নাম আর ও যে সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের অফিসে যাবে সেটা লিখল। তারপর এগিয়ে গেল বিল্ডিংটার দিকে।

প্রায় দশতলা উঁচু এই বাড়িটা। সামনেটা পুরো প্লেক্সিগ্লাস দিয়ে মোড়া। সফ্‌ট ড্রিঙ্কস্ ছাড়াও এরা নানা রকম স্ন্যাক্‌স তৈরি করে। লোককে খাইয়ে যে কত টাকা রোজগার করা যায়, তা এদের না দেখলে অহন জানতেই পারত না কোনওদিন। তবে ভারতবর্ষের মতো দেশে হয়তো যায়। একশো কোটির ওপর জনসংখ্যা যেখানে, সেখানে এরকম সামগ্রী বিক্রি করাই বোধহয় সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। যদি সারা বছরে এক শতাংশ মানুষও এইসব খায়, তা হলেই তো কোটি কোটি টাকা মুনাফা নিশ্চিত। বাবা কেন যে ভুল ব্যবসায় নামতে গেল! নিদেন পক্ষে মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করলেও তো হত! অ্যাডভার্টাইজিং বড্ড ঝঞ্ঝাটের কাজ।

লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অহন। পাশের ডিজিটাল প্যানেলে দেখল,

BanglaBook.org

লিফটটা চারতলা থেকে নীচে নামছে। আশেপাশে ভিড় আছে একটু। এই পাঁচ-ছ'জন। ও ঘড়ি দেখল একবার। বারোটা পনেরো ছাড়িয়ে বড় কাঁটা কুড়ির দিকে এগোচ্ছে। এদের জেনারেল ম্যানেজার, মার্কেটিং, মিস্টার সাহা সোয়া বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে দেখা করতে বলেছেন। অবশ্য দেখা করার কথা ছিল না। অহনই আজ এগারোটা নাগাদ ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিল।

লিফটের দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল সামনে। অহন অন্যান্যদের সঙ্গে পা বাড়াল ভেতরে। ফিফথ ফ্লোরের বোতাম টিপে এক কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল ও। চারিদিকে স্টেনলেস স্টিলের দেওয়াল চকচক করছে। স্পষ্ট নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। অহন চট করে একবার এ-দিক ও-দিক তাকাল। না, ওকে কেউ লক্ষ করছে না। ও স্টেনলেস স্টিলের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে 'ই' করে দাঁত দেখে নিল নিজের। নাঃ, ঠিক আছে। মুখ বন্ধ করে একবার জিভ বুলিয়ে নিল দাঁতের ওপর।

শতানিকের ফোনটা কেটে দেওয়ার পর দুটো বিস্কিট খেয়েছিল অহন। তারপরে মুখটা ধুলেও ঠিক মনের মতো করে ধুতে পারেনি। প্রতুলকাকা এসে গন্ডগোল লাগিয়েছিল ঘরে।

শতানিক লোকটাকে এমনিতেই ভাল লাগে না ওর। তাই লোকটা দ্বিতীয় বার ফোন করায় বেশ বিব্রত হয়েছিল অহন। কিন্তু তবু ধরেছিল ফোনটা। লোকটা ওকে চাপ দিচ্ছিল। কোথাকার কোন এক আর জে না কী সব গ্রুপ, তাদের অ্যাড ক্যাম্পেনটা নাকি ও পাইয়ে দেবে বিটা অ্যাডকে। তার জন্য নাকি এই সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের ক্যাম্পেন থেকে নাম তুলে নিতে হবে! মামার বাড়ির আবদার আর কী! তারপর যখন অহন রাজি হল না, তখন যে-প্রস্তাবটা দিয়েছিল শতানিক, তাতে ভীষণ মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল ওর। বলে কিনা টাকা দেবে এই কাজটা ছেড়ে দেবার জন্য! কী সাহস? ও কি সবাইকে নিজের মতো ছোটলোক ভেবেছে নাকি, যে টাকা দিয়ে যা খুশি তাই কাজ করিয়ে নেবে? অহনের মাথা এত গরম হয়েছিল যে, ও সংক্ষেপে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে ফোন কেটে দিয়েছিল। ওর ইচ্ছে করছিল ভীষণ খারাপ খারাপ কথা বলে লোকটাকে। ইচ্ছে করছিল ফোনের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে ঘুসি মারে লোকটার নাকে। কিন্তু প্রতি বারের মতো এবারেও ওর সমস্ত ইচ্ছেগুলো মাথার ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঘরের লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে মুখেচোখে জল দিয়েছিল অহন। তারপর

BanglaBook.org

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে ড্রয়ার খুলে বের করেছিল এক প্যাকেট বিস্কিট। সেখান থেকে একটা বিস্কিট মুখে দিয়ে মনটা অন্য দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করেছিল ও। দুটো বিস্কিট শেষ করে আবার বাথরুমে গিয়েছিল অহন। কল খুলে মুখ ধুচ্ছিল। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ে। মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়ে অহন শুনেছিল বাইরে প্রতুলকাকার গলা। বেশ চেঁচিয়েই অহনকে উদ্দেশ করে বলছেন, "কী সবসময় মেয়েদের মতো বাথরুমে পড়ে থাকো? বাইরে এসো। কথা আছে।"

'মেয়েদের মতো' মানে? আগাপাশতলা জ্বলে গিয়েছিল অহনের। বুড়োটার বড্ড বাড় বেড়েছে তো! ভারী অসভ্য তো লোকটা! ঋ একটা কথা বলত, যে-সব মানুষ মেয়েদের সম্পর্কে ডেরোগেটারি মন্তব্য করে, তারা আসলে অশিক্ষিত এবং অমানুষ। রাগটা আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল মাথায়। কিন্তু তবু রাগটা চেপে কোনওমতে মুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল অহন, কারণ প্রতুলকাকা চেঁচিয়েই যাচ্ছিলেন।

প্রতুলকাকা চেয়ারে বসে গোমড়া মুখে তাকিয়েছিলেন বাথরুমের দরজার দিকে। অহনকে দেখেই বলেছিলেন, "এবার সঙ্গে করে স্নো, পাউডার, পমেটম এনো। দিনে দুশো বার বাথরুম যাও কেন?"

অহনের রাগ শেষ ক'ধাপ সিঁড়ি ভাঙছিল দ্রুত। লোকটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। একে একটা মুখের মতো জবাব দিতে হবে। কিন্তু মাথার ডিকশনারি ঘেঁটেও কোনও কঠিন শব্দ মাথায় আসছিল না ওর। ও প্রাণপণে ওর ডিকশনারি লেখককে ডাকছিল, একটা অন্তত শব্দ দাও যেটা এই বুড়োটার মুখে ছুড়ে মারতে পারি।

প্রতুলকাকা আবারও বলেছিলেন, "বাথরুমে গিয়ে বসে থাকলে ব্যাবসা চলবে? তা এসেছিল ফোন? অ্যাডগ্ল্যাম ফোন করেছিল?"

অহন বুঝতে পারছিল যে, লোকটা খুব ভাল জানে ফোন এসেছিল কি আসেনি, তবু অ্যাক্টিং করছে। ও নিজের চেয়ারে বসে সংযতভাবে বলেছিল, "হ্যাঁ, শতানিক বাসু ফোন করেছিল।"

"শুনেছ ও কী বলল?" প্রতুলকাকা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন অহনের দিকে।

অহন সংক্ষেপে বলেছিল, শতানিক বাসুর দুটো প্রস্তাব।

"এক লাখ টাকা? এটা তো জানতাম না?" প্রতুলকাকা সত্যি সত্যি আশ্চর্য

BanglaBook.org

হয়েছিলেন এবার। অহন বুঝেছিল যে, প্রথম প্রস্তাবটা তা হলে প্রতুলকাকা জানতেন।

ও বলেছিল, "হ্যাঁ, এক লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল শতানিক।"

"তুমি কী বললে?" প্রতুলকাকার গলায় সামান্য উত্তেজনা।

অহন টেবিলে রাখা পেঙ্গুইন পেপার ওয়েটের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "আমি না করে দিয়েছি একদম।"

"তুমি রিফিউজ করেছ? পাগল নাকি?" তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিলেন প্রতুলকাকা।

"হ্যাঁ, আমি স্ট্রেট না করে দিয়েছি। আর জে গ্রুপ বলে কিছু আছে বলে তো আমি জানি না। শতানিক আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করছে।"

প্রতুলকাকা আবার বসে পড়েছিলেন চেয়ারে। বলেছিলেন, "আর দ্বিতীয় অফারটা, মানে এক লাখ টাকার ব্যাপারটা? সেটা তো ভালই ছিল! সেটা না করলে কেন?"

অহন বলেছিল, "বিটা অ্যাডের সম্মান এক লাখে বিক্রি করে দেব? তা ছাড়া এই কাজটা করতে চাই আমি। এদের অ্যাড ক্যাম্পেন পাওয়া মানে বিশাল বড় ক্রেডেনশিয়াল। ভবিষ্যতে কাজ পেতে সুবিধে হবে অনেক।"

"সে তো কাজ পেলে। আর যদি কাজটা না পাও? বুঝতে পারছ, কত টাকা গচ্চা যাবে? টাকাটা নিয়ে রফা করলে আর ঝামেলাই হত না। একদম মূর্খের মতো কাজ করেছ তুমি!" প্রতুলকাকা অসহিষ্ণুভাবে হাত ছুড়লেন।

মূর্খ! অহন অবাক হয়ে গেল। লোকটা তো মাথায় উঠেইছিল এবার যে সেখানে বসে চুল ছিঁড়ছে! ও প্রাণপণে ওর ডিকশনারি লেখককে ডাকছিল। একটা, অন্তত একটা মুখের মতো জবাব যদি দিতে পারত!

প্রতুলকাকা বলেছিলেন, "সব ডোবাবে তুমি। যার পেছনে দৌড়োচ্ছ তা মরীচিকা। কিন্তু তুমি এমন নির্বোধ যে বুঝতে পারছ না, পায়ে কুড়ুল মারছ তুমি। বোধগম্যি সব হারিয়েছে তোমার। ঠিক আছে। আমি আর কী বলব? যা ভাল বোঝো করো। তোমার বাবার..."

"হ্যাঁ", নিজের চিৎকারে নিজেই চমকে গিয়েছিল অহন। ও বুঝতে পারছিল, ওর মাথার ভেতর কেউ একজন এসে বসেছে। আর সে ওর নির্বীজ ডিকশনারির পাতায় দুটো-চারটে করে কঠিন শব্দ লিখছে এবার। অহন প্রতুলকাকার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, "আমার বাবার টাকা

BanglaBook.org

যখন, আমি যা খুশি করব। আপনি প্লিজ চুপ করুন। কাজটা আমার, আমি দেখব। আপনি একদম এ-ব্যাপারে মাথা গলাবেন না। বুঝেছেন?" প্রতুলকাকাকে দেখে মনে হচ্ছিল মাদাম তুঁসো'র মিউজিয়াম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ভদ্রলোক এতটা অবাক হয়তো কোনওদিন হননি। চোয়াল খুলে প্রায় মাটিতে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল ওঁর। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল। যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না উনি। হয়তো ভাবছিলেন, এ কি সেই অহন? উনি এই অবস্থায় আরও কিছুক্ষণ বসেছিলেন। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অহনের ঘর থেকে।

নিজের কথায় অহন নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ কে ঢুকে পড়েছে ওর ভেতরে? এই ছেলেটা কে? কখনও তো দেখা হয়নি এর সঙ্গে? তবে কি এতদিন ধরে ঘাপটি মেরে বসে ছিল ওর ভেতর? আরও কি কেউ বসে রয়েছে? সবাই যে বলে মুড শিফটিং, এটাও কি এর অন্তর্গত? কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে চেয়ারে বসেছিল অহন। অন্যান্য সময় রাগ হওয়ার পর একটা অনুশোচনা হয়, এবার কিন্তু সেটা হচ্ছিল না। বরং হঠাৎ যেন শান্তি পাচ্ছিল ও। অন্য ধরনের এক শান্তি। কিন্তু সেটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একটা চিন্তা এসেছিল মাথায়। উর্নি তো এখনও কোনও খবর দিল না! কী করছে মেয়েটা? সোয়া দশটা নাগাদ যখন ফোনটা করেছিল, তখন তো বলল যে, সুগতটা শুনল না। কিন্তু তারপর তো ওর মুকুলদার কাছে যাবার কথা। গিয়েছে কি ওখানে? গেলে কী করছে ও? কাজ হল কিছু?

তারপর বেশ কয়েক বার উর্নিকে ফোনে ট্রাই করেছে অহন। পায়নি। তা হলে কি লাস্ট ডেটটা এক্সটেন্ড করতে হবে? সময় নষ্ট না করে ও তাড়াতাড়ি ফোন করেছিল মিস্টার সাহাকে। তখনই উনি বলেছেন, দেখা করতে। দেখা যাক, অহন ভদ্রলোককে বলে প্রেজেন্টেশনের জন্য আরও কয়েকটা অতিরিক্ত দিন নিতে পারে কি না?

লিফটের ভেতরের ডিজিটাল ডিসপ্লেতে পাঁচ সংখ্যাটা দেখিয়ে লোহার বাক্সটা থামল। দরজাটা খুলে গেল মসৃণভাবে। অহন লিফটের বাইরে পা দিয়ে গলায় আলগা হওয়া টাইয়ের নটটাকে শক্ত করল। সামনেই কাচের বড় দরজা, তার ওপরে কোম্পানির লোগো আঁকা। দরজা ঠেলে ঢুকল অহন। অফিসের ভেতরটা ঝকঝক করছে। সামনের রিসেপশনে রোগা মতো

BanglaBook.org

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা কিছু লিখছে। অহন গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটার সামনে। মেয়েটা মুখ তুলে তাকাল। চোখে জিজ্ঞাসা।

অহন বলল, "মিস্টার রণদেব সাহা, আই হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট।"

মেয়েটা পাশের সোফাটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ইউ প্লিজ ওয়েট হিয়ার।" তারপর ইন্টারকম তুলে চাপা গলায় কথা বলল।

অহন বসল না। রিসেপশনের চারিদিকে খুব ভাল কিছু ফোটোগ্রাফ ঝোলানো রয়েছে। অহন ছবিগুলোর দিকে তাকাল। সবই ল্যান্ডস্কেপ। তার মধ্যে বরফ মোড়া উপত্যকার ছবিও রয়েছে কয়েকটা। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল আর্চির তোলা কাশ্মীরের ছবিগুলো। এবার শীতের শুরুতেই নাকি বরফ পড়েছে ওখানে। ছবিগুলো কেমন যেন ভৌতিক লেগেছিল ওর। আর্চির কথা মনে পড়াতেই হঠাৎ ওর খেয়াল হল চেকের কথা। গোরাটাকে তো পাঠিয়েছে জমা দিতে। এর মধ্যে কি ফিরে এসেছে ও? ছেলেটা এত স্লো, এত কুঁড়ে যে, মাঝে মাঝে বিরক্ত ধরে যায় অহনের। চেকটা ফার্স্ট ক্লিয়ারিংয়ে চলে গেলেই ভাল।

"ইউ প্লিজ গো।" অহন দেখল, মেয়েটা ওকে কোথায় যেতে হবে হাত দিয়ে দেখাচ্ছে।

এ-অফিসে অনেক বার এসেছে অহন। ও জানে। অহন হেসে, ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে গেল ভেতরের দিকে।

রণদেব সাহার ঘর করিডোরের একদম শেষ প্রান্তে। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় নক করল অহন। "কাম ইন।" রণদেব সাহার গলা।

অহন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ঘরের ভেতরটা পুরো সবুজ। সিলিং থেকে শুরু করে কার্পেট, টেবিল থেকে শুরু করে বসার জায়গা, সব সবুজ। তবে বিভিন্ন ধরনের সবুজ। ওকে দেখে রণদেব বললেন, "আসুন মিস্টার রয়, বসুন। তারপর, হঠাৎ?"

অহন হাসল, "স্যার, একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে এসেছি।"

"রিকোয়েস্ট?" রণদেব ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে শুনছি। আগে বলুন কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবেন?"

"না, থ্যাঙ্ক ইউ।"

"সে কী মশাই? যার হয়ে ক্যাম্পেন করবেন, তা খেয়ে দেখবেন না? না হলে ড্রিঙ্কটার স্পিরিটটাই তো ধরতে পারবেন না।"

BanglaBook.org

অহন হাসল, "না, আমি খাই না।"

শ্রাগ করলেন রণদেব। বললেন, "ঠিক আছে। বলুন তা হলে।"

অহন আর সময় নিল না। বলল, "স্যার, প্রেজেন্টেশনের জন্য আর দশটা দিন সময় দিন। একটা পয়েন্টে আটকে গিয়েছি আমরা।"

"দশ দিন?" রণদেব চোখ গোল গোল করলেন, "বলেন কী? আমার চাকরিটা খাবেন নাকি? এই বুড়ো বয়সে ছেলে-বউ নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াব যে।"

"কিন্তু স্যার, খুব দরকার ছিল সময়টা। মাত্র দশটা দিন, প্লিজ।"

"দেখুন মিস্টার রয়। সামনের ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে আমরা প্রোডাক্টটা লঞ্চ করব। জানেনই তো, এটা একদম নতুন ফ্লেভার। স্ট্রবেরি উইথ আ হিন্ট অব্ মিন্ট। দশ দিন পেছোনো মানে সব পিছিয়ে দেওয়া। এটা সম্ভবই নয়। উই আর অলরেডি লেট। ইউ এস থেকে এমনিতেই রোজ গালাগালি-সমৃদ্ধ মেল আসছে। বাই ফিফটিন্থ অব জানুয়ারি অ্যাড শুড বি আউট ইন পাবলিক। অলরেডি টিজার ছাড়ব কি না ভাবছি আমরা। টাইম দেওয়া আউট অব্ কোয়েশ্চেন। প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড। তেমন হলে আপনারা উইথড্র করুন। নেকস্ট টাইম ট্রাই করবেন। কিন্তু এবার জমা দিতে হলে টোয়েন্টি এইটথ্-ই দিতে হবে। গট ইট?"

মাথা নিচু করল অহন। সুগতটা এমন ঝোলাবে ভাবেনি। কাজটা শেষ না করে চলে গেল কোন বুদ্ধিতে? এভাবে বিপদে ফেলল কেন? ছেলেটা ট্যালেন্টেড বলেই অহন ওকে রেখেছে। কিন্তু, ট্যালেন্ট উইথআউট সিনসিয়ারিটি ইজ আ বিগ জিরো। নাঃ, আর রাখবে না সুগতকে। নতুন ছেলে খুঁজতে হবে।

রণদেব বললেন, "শুনুন, এখনও তো সময় আছে। ক্রিসমাস-টিসমাস ভুলে গিয়ে চেপে কাজ করুন, হয়ে যাবে। বেস্ট অব্ লাক।"

অহন হাসল। তারপর উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। দরজার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে শুনল রণদেব বলছেন, "মিস্টার রয়, আমাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ সবাই পায় না। ইউ মাস্ট গ্র্যাব ইট।"

রাস্তায় বেরিয়ে ঘড়ি দেখল অহন। বারোটা আটত্রিশ। খিদে পাচ্ছে বেশ। এখন আর অফিসে যাবে না, এখানেই খেয়ে নেবে কোথাও। এদিকে উর্নিটা যে কী করছে, এতবার ফোন করছে কিন্তু মেয়েটা আর ফোনই ধরছে না! বিরক্ত লাগল অহনের। ও ভাবল ফালতু চিন্তা করে আর লাভ নেই। যা হবার

BanglaBook.org

হবে। ওসব বাদ দিয়ে এখন খেতে হবে আগে। উড স্ট্রিটের মোড়েই একটা রেস্টুরেন্ট। কিন্তু সেটা বন্ধ। অবশ্য অহন সেখানে খেতও না। আজ ওর ভেজিটেরিয়ান খাবার খেতে ইচ্ছে করছে। ও ভাবল এখান থেকে এক্সাইড মোড় খুব একটা দূর নয়, সেখানে যাওয়া যাক। ওই রেস্টুরেন্টটায় ভেজিটেরিয়ান ডিশ পাওয়া যায়।

দ্রুত হাঁটতে লাগল অহন। বহুদিন এভাবে কলকাতার রাস্তায় একা হাঁটেনি ও। এখন তো হয় গাড়ি, নয় ট্যাক্সি করে ঘোরে সবসময়। তার বাইরে তো অন্য ভাবে থাকাই হয় না। ওর এখনও মনে আছে ঋ-এর সঙ্গে সম্পর্কের সময় ওরা দু'জনে খুব হাঁটত। আর সারাটা পথ বকবক করত ঋ। যার বেশির ভাগটাই স্যাটার ডে রিভিউ। ঋ-এর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর অহনের দুঃখ হয়েছিল বেশ, কিন্তু কিছু সময় কেটে যাবার পর ও বুঝেছিল দুঃখের চেয়ে যেন স্বস্তিটাই বেশি পেয়েছে ও। যেন একটা হাঁপ-ছাড়া ভাব, যাক কেউ তো আর সবসময় খুঁত ধরবে না, বোঝাবে না যে, ও কতটা অপদার্থ। সত্যি কথা বলতে কী এখন ওর কাছে ঋ-এর স্মৃতি তেমন জোরদার নেই আর। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ও কি সত্যিই ঋ-কে ভালবেসেছিল?

রেস্টুরেন্টের কাচের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল অহন। খুব বেশি সিট খালি নেই। তবে কোনার দিকে একটা টেবিল খালি রয়েছে। ও গিয়ে বসল সেখানে। ওর সামনের চেয়ারটা খালি। একটু হাঁপাচ্ছে অহন। আজকাল সামান্য হাঁটলেই জিভ বেরিয়ে যায় ওর। বুঝল, অনভ্যাস। ও পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল। এবার উর্নিকে একটা মেসেজ পাঠাবে। কি-প্যাড অ্যাক্টিভ করে মেসেজটা লিখল ও WHERE R U? GOT ANY NEWS? I M : (।

মেসেজটা পাঠিয়ে মোবাইলটা টেবিলে রেখে চোখ তুলল অহন আর সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা খেল। কে ওটা? এত সুন্দর! এত আলোময়! অবাক হয়ে একটু কোনাকুনি বসে থাকা মেয়েটার দিকে ও তাকিয়ে রইল। এত সুন্দর যেন জীবনে দেখেনি অহন। এ মেয়ে কোথায় ছিল এই তিরিশ বছর ধরে? অহনের মনে হল এর জন্যই এতদিন বেঁচে ছিল ও। এমন একজনের জন্যই অপেক্ষা করছিল এতদিন। প্রথম দেখায়, সম্পূর্ণ অজানা কারও প্রেমে কোনওদিন পড়তে পারে কেউ? কিন্তু অহন পড়ল— আকাশ থেকে মেঘে পড়ল, মেঘ থেকে রামধনুতে পড়ল, রামধনু থেকে নদীর জলে পড়ল। তারপর অহন

BanglaBook.org

ভাসতে লাগল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। ওর কি শরীর খারাপ করছে? স্রোত কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে? এ যাত্রার গন্তব্য কোথায়? এ স্রোত কি ওকে আবার ওর কিশোরবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? সময় কি উলটো দিকে বইতে শুরু করল? নাকি এই তিরিশ বছরেও ওর কৈশোর শেষ হল না!

কতক্ষণ অহন তাকিয়ে ছিল মেয়েটার দিকে মনে নেই কিন্তু এবার হুঁশ হল। ওয়েটার ডাকছে। ও থতমত খেয়ে মুখ ফেরাল পাশে। "স্যার, আপনার অর্ডারটা?"

অহনের মনে পড়ল এখানে খেতে এসেছে ও। কিন্তু কী খাবার? ও, ভেজিটেরিয়ান। ও আরও সেকেন্ড দশেক সময় নিল নিজেকে গুছিয়ে নিতে, তারপর বলল, "একটা মিক্সড চাট দেবেন।"

"আর কিছু?" ওয়েটারটা অহনের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে মনে হল। এ বাবা, ও কী আদেখলার মতো তাকিয়েছিল? অহন নিজেকে সংযত করল, বলল, "না, আর কিছু নয়।"

ওয়েটারটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাবার দিয়ে গেল। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই অহন প্রায় বার দশেক তাকিয়েছে মেয়েটার দিকে। মেয়েটাও দেখেছে কয়েক বার। ও ঠিক করল আর তাকাবে না। বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। দ্রুত খাবার শেষ করায় মন দিল অহন। কিন্তু ওর অবাধ্য চোখ বারবার মেয়েটাকে দেখতে চাইছে। এ কী হল রে ভাই? জীবনে এমন তো কোনওদিন হয়নি! জলের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে জল খেল অহন। আর সঙ্গে সঙ্গেই বিষম খেল জোরে। নাকে জল ঢুকে গেছে ওর। চোখ, নাক জ্বালাও করছে খুব। তবু তাই নিয়েও ও দেখল মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। প্লেটের তলার থেকে পেপার টাওয়েল বের করে কোনওমতে মুখটা মুছল অহন। ভাবল, এই রে মেয়েটা আবার উলটোপালটা কিছু বলবে না তো? কিন্তু অহনকে আশ্চর্য করে দিয়ে মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার মোবাইল থেকে একটা ফোন করতে দেবেন? দেখুন না, আমারটা ভেঙে গেছে।"

অহন ব্যাপারটা বুঝতে সময় নিল একটু, তারপর হুড়োহুড়ি করে টেবিলে রাখা নিজের মোবাইলটা তুলতে গিয়ে উলটে ফেলল জলের গ্লাস। ইডিয়ট। কী হয়েছে ওর? এমন টিনএজারদের মতো ব্যবহার করছে কেন? কোনওমতে ও মেয়েটার হাতে মোবাইলটা তুলে দিয়ে হাসল। গবেট। আবার

BanglaBook.org

নিজেকে ধমক দিল অহন। বোকার মতো হাসছে কেন? দাঁতে যদি খাবারের টুকরো লেগে থাকে?

মেয়েটা বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ, অনেককে বলেছিলাম, কেউ দেয়নি। আর দেখুন না বাইরে গিয়ে যে ফোন করব, তারও উপায় নেই। যার সঙ্গে দেখা করব সে যদি ততক্ষণে চলে আসে! প্রায় ঘণ্টাখানেক ওয়েট করছি।" মেয়েটা অন্যের জন্য ওয়েট করছে! কোনও ছেলের জন্য কি? ছোট্ট করে একটা কাঁটা ফুটল অহনের বুকে। ও কিছু বলার আগেই শুনল পাশের টেবিলের দুটো ছেলে হাসছে। এবং এক জন অন্য জনকে বলছে, "সবুরে মেওয়া ফলে। অনেকক্ষণ ঝাড়ির ফল, ফোন। চামকি জিনিস দেখে জল ফেলে একসা..."

অহন বুঝল উদ্দেশ্যটা ও। খুব রাগ হয়ে গেল ওর। ভাবল কিছু একটা বলে, কিন্তু তার আগেই ঘটনাটা ঘটল। ওর মোবাইল নিয়ে ডায়াল করতে থাকা মেয়েটা সটান ঘুরল ছেলেগুলোর দিকে তারপর কঠিন গলায় বলল, "এক থাপ্পড় মারব ইডিয়ট। আমি এখানে আসা থেকে অসভ্যতা করছ। নোংরা কথা বলা? আর একটা কথা বলেছ কি পায়ের জুতো দিয়ে মারব।"

ছেলে দুটো থতমত খেয়ে গেছে একদম। হট্টগোলে ম্যানেজারও ছুটে এসেছে। অহন দাঁড়িয়ে পড়েছে অবাক হয়ে। মেয়েটা আবার বলল, "রাস্কেল কোথাকার। দামি জামা কাপড়ই পরেছ, ছোটলোকামো যায়নি, না?"

ছেলে দুটো ঘাবড়ে গিয়ে হাত তুলে থামতে বলছে মেয়েটাকে। কিন্তু মেয়েটা বলেই যাচ্ছে। অহন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। রাগলেও কাউকে এত সুন্দর দেখায়! ম্যানেজার এবার বলল, "ম্যাডাম, প্লিজ কাম ডাউন। প্লিজ।"

তারপর ছেলে দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্লিজ, আপনারা আসুন। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি প্রবলেম।"

মেয়েটা এবার অহনের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলুন এখান থেকে। যত সব সিক পিপল।"

অহন কোনওমতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট টেবিলে রেখে বাইরে বেরিয়ে এল মেয়েটার সঙ্গে। ফুটপাথের এক কোণে দাঁড়াল ওরা। অহন মুগ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে দেখল মেয়েটা ফোনে ট্রাই করছে কোনও নম্বর। এই দুপুরের এক্সাইড মোড়, এই গাড়ির জটলা, এই লক্ষ লক্ষ মানুষ সব হঠাৎ ভীষণ সুন্দর লাগল অহনের। ওর মনে হল এই ধুলো-মলিন শহরটা বহু দিন পরে বেঁচে উঠেছে যেন। এই দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেক দিন পর নিজেকে জীবিত

BanglaBook.org

লাগছে ওর। মনে হচ্ছে অ্যাডের টেনশন সম্পূর্ণ ভ্যানিশ! এই কি মুড শিফটিং?

"নাঃ, পাচ্ছি না, আউট অব অর্ডার। বোধহয় আসবেন না আর। আমার কপালটাই খারাপ। বাই দ্য ওয়ে থ্যাঙ্ক ইউ।" হেসে ফোনটা ফেরত দিয়ে চলে যাবার জন্য ঘুরল মেয়েটা।

"ইয়ে... মানে..." কে জানি পেট টিপে অহনের ভেতর থেকে টুথপেস্টের মতো বের করে আনল কথাগুলো। ডিকশনারির লেখক কি?

"কিছু বলবেন?" মেয়েটা আবার তাকাল ওর দিকে।

"আমি ইয়ে... ভদ্রবাড়ির ছেলে... মানে..." জিভ কাঁপছে অহনের। অনেক কথা একসঙ্গে বেরোতে চাইছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মারামারি করে জট পাকিয়ে ফেলছে তারা। তাও চেষ্টা করে ও বলল, "আমি... আপনি..."

মেয়েটা হাসল, "বলুন না। কী বলবেন?"

"আপনি আমার সঙ্গে একদিন কফি খাবেন?" অহনের পা কাঁপছে থরথর করে। প্রাণপণে ও নিজের জিভকে আটকাতে চাইছে, পারছে না। এসব কী বলছে ও? কে বলাচ্ছে ওকে?

"কফি?" মেয়েটার ভুরু বাঁকছে এবার। এই রে খেপে গেল নাকি? ওকেও ওইসব গালাগাল খেতে হবে নাকি এখন?

"হ্যাঁ মানে... যবে খুশি। কাল, পরশু, পরের মাসে, তার পরের মাসে, যখন খুশি। খাবেন?" অহন হতাশ হয়ে বুঝল ওর জিভের ব্রেক ফেল করেছে।

মেয়েটাও শক্ত মুখে তাকিয়ে আছে।

অহন বলল, "প্লিজ, নাও খেতে পারেন, কিন্তু রাগ করবেন না। আমার তা হলে... ইয়ে... মানে..."

মেয়েটা এবার হাসল। অসাধারণ দাঁত। অহন অবশ হয়ে এল প্রায়।

মেয়েটা বলল, "ঠিক আছে খাব। এত টেনশড হচ্ছেন কেন?"

অহন বোকার মতো মুখ করে হাসল। কিছু বলা দরকার। কিন্তু কী বলবে? ব্রেক আবার কাজ করতে শুরু করেছে এখন। মাথার ভেতরের লোকটা চম্পট দিয়েছে কোথাও। এবার হঠাৎ ওর হাতে ধরা ফোনটা বেজে উঠল টুং টাং করে। অহন দেখল, উর্নি। ও সামনে দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "ফোনটা ধরি?"

মেয়েটা হাসল, "ধরুন, আমি ওয়েট করছি। বাই দ্য ওয়ে আমি মেহের।"

BanglaBook.org

অহন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল মেহেরের দিকে। সেই দৃষ্টির মধ্যে কি শীতকাল আরও সুন্দর হয়ে উঠল? অজানা সব পাখিরা কি ফিরে এল কলকাতায়? ভোরবেলায় শিশির কি আবার জমতে লাগল ফুলের পাপড়িতে? কী হল কে জানে? শুধু খুব গোপনভাবে ওর মনে হল একদিন না একদিন নিজের থেকে মেহেরকে চুমু খাবে ও। ওর হাতের ফোনটা বেজে চলল— বেজেই চলল... অহনের আবছাভাবে মনে পড়ল অ্যাড ক্যাম্পেন না কী নিয়ে একটা ঝামেলা আছে না?

উর্নি ২৪ ডিসেম্বর, দুপুর একটা পঁচিশ

ফোনটা ধরছে না কেন অহন? এতক্ষণ রিং হচ্ছে, তবু ধরছে না কেন? উর্নি ফোনটা কানে লাগিয়ে রাখল। গানটা বাজছে। কলার টিউন। অহনের মোবাইলে ফোন করলেই এই গানটা বাজে। উর্নি কানে ফোনটা ধরে চুলের মধ্যে হাত ডোবাল। I M (মানে খুব চিন্তিত। অহন সব সময় চিন্তা করে। অবশ্য চিন্তা হওয়াটা স্বাভাবিক। আর উর্নি নিজেও কম চিন্তিত নয়।

মুকুলদা তো সকালেই ভাগিয়ে দিয়েছিল ওকে। লোকটা ভীষণ উলটোপালটা কথা বলে। সকালে উর্নিকে বলেছিল, "আমি বাজারের কাঁচা আম নাকি, যে আমায় নিয়ে গিয়ে চাটনি বানিয়ে দেবে? এ নুডলস্-এর যুগে সবই কি টু মিনিটস-এ হয়? আর আমি কি বেশ্যা নাকি, যে অন্যের বিছানায় গিয়ে শোব? কে হাফ-ডান কাজ করে গেছে তা শেষ করব আমি? আমার এখন এই অবস্থা হয়েছে? অহনের সাহস হল কী করে তোমায় আমার কাছে পাঠায়?"

উর্নি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, ভদ্রলোক শোনেনি। বলেছিল, "আমায় আজ যা অপমান করল বিটা অ্যাড তা জীবনেও ভুলব না আমি। তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

"হ্যালো?" আশ্বস্ত হল উর্নি, যাক, ফোনটা ধরেছে তা হলে শেষ পর্যন্ত!

ও বলল, "অহনদা, আবার টেনশন করছেন? অমন মেসেজ পাঠিয়েছেন কেন? আমি বলছি তো একটা ব্যবস্থা ঠিক হবে।"

"না না ঠিক আছে। ইউ ক্যারি অন।"

BanglaBook.org

ভুরু কুঁচকে গেল উর্নির। অহনের গলায় টেনশন নেই তো তেমন। বরং যেন ফোনে কথা শেষ করতে পারলে বাঁচে। এ কী রে ভাই! ও বলল, "কী অহনদা সব ঠিক আছে তো? আপনি টেনশন করছেন না তো?"

অহন বলল, "টেনশন করে লাভ হবে কিছু? তার চেয়ে, ডু হোয়ট এভার ইউ ক্যান।"

উর্নি বলল, "ঠিক আছে অহনদা, ডোন্ট ওয়রি।"

"বাই।" টুক করে ফোনটা কেটে দিল অহন।

যাঃ বাবা। এ কী হল? যে-মানুষটা এই কাজটা নিয়ে এতটা নার্ভাস ছিল সে হঠাৎ এমন তাড়াহুড়ো করে ফোন রেখে দিল কেন? তা হলে কি এর চেয়েও জরুরি কোনও কাজ করছে অহন? না কি হাল ছেড়ে দিল? আশ্চর্য, অহনের কেসটা কী? নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে যায়নি তো? হতেই পারে, মানুষটা খুব নরমসরম তো। নরমসরম আর ভাল। এ মানুষটাই কিন্তু বিপদে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে।

রৌনক ফ্রি স্পিরিটের বাহানা দেখিয়ে চলে যাওয়ার পর, মেন্টাল ব্রেক ডাউন হয়ে গিয়েছিল উর্নির। দিনের পর দিন নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখত ও। কারও সঙ্গে কথা বলত না। মায়ের মৃত্যুর পর যে বাবা একদম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, চাকরি থেকে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে বাড়িতেই থাকত, উর্নির এই অবস্থায় সেই নৈর্ব্যক্তিক বাবাও বিচলিত হয়েছিল খুব।

সেই সময় দিনগুলো কেমন যেন কালো কাপড়ে মোড়ানো ছিল। উর্নি কিছুতেই বুঝতে পারত না কেন রৌনক ওকে ছেড়ে গিয়েছিল। কী দোষ করেছিল ও? ও তো সর্বস্ব দিয়ে ভালবেসেছিল রৌনককে। ওর মনে হত রৌনক ছাড়া ওর জীবনে কিচ্ছু নেই, কেউ নেই। তা হলে? কী হয়েছিল ওদের সম্পর্কে?

ওর ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা কিন্তু বারবার ওকে বারণ করত রৌনকের সঙ্গে মিশতে। রৌনক থিয়েটার করত। আর সে সময় প্রচুর থিয়েটার দেখত উর্নিরা। সে রকমই এক শো'য়ে রৌনকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল উর্নির। আলাপ হওয়ার পর রৌনক বলেছিল, "তোমার নাম উর্নি? স্ট্রেঞ্জ, আমি তো ভাবলাম কিয়েরা নাইটলি। অবশ্য ইউ হ্যাভ আ লং হেয়ার।" তখন সত্যিই ও বড় চুল রাখত। কিন্তু ওইটুকু কথাতেই কোথাও নদীর মুখ খুলেছিল একটা।

তারপর দেখাসাক্ষাৎ বাড়তে লাগল দুজনের। লম্বা, ছাই-রঙা চুলের

BanglaBook.org

রৌনককে দেখলেই শরীরের ভেতরে কেমন করত ওর। মনে হত ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই বুকের মধ্যে। ওর বন্ধুরা ওকে সাবধান করত। বলত, "উর্নি, বুঝেশুনে পা ফেল কিন্তু।"

কিন্তু কোথায় পা ফেলবে উর্নি? ও তো তখন আকাশে।

একদিন ট্যাক্সি করে যেতে যেতে উর্নি প্রথম সাহস দেখিয়েছিল। গা ঘেঁষে বসেছিল রৌনকের। তারপর আলতো করে মাথা রেখেছিল ওর কাঁধে। আচমকাই রৌনক টেনে নিয়েছিল ওকে। গভীর আশ্লেষে ও মুখ উঁচু করে চুমু খেয়েছিল রৌনকের খাঁজ-কাটা থুতনিতে। তারপর আলতো স্বরে বলেছিল, "আমায় তুমি নেবে না?"

তারপর কী হয়েছিল আজও ঠিক মনে করতে পারে না উর্নি। সময় যেন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল একদম। শুধু, অনেক অনেক পরে, ও দেখেছিল রৌনকের নগ্ন শরীরের ওপর ও গুটিসুটি মেরে শুয়ে রয়েছে।

যৌনতা কী, রৌনকই শিখিয়েছিল ওকে। বিস্ময়ে, আরামে আর নিরাপত্তায় ও একদম মিশে থাকত রৌনকের সঙ্গে। অবস্থাটা এমন জায়গায় গিয়েছিল যে, ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দেয় ও। ওর সমস্ত অস্তিত্ব রৌনক ছাড়া কিচ্ছু জানত না। বাবা শুধু তাকিয়ে দেখত। কিছু বলত না। একা একটা রকিং চেয়ারে বসে বই পড়ত সারাদিন।

উর্নি এর মধ্যে রৌনকের কথায় চুল কেটে ফেলেছিল ছোট করে। রৌনক ওকে, চুল কাটার পর, দেখে "এভাবে নয়, এভাবে" বলে হাত দিয়ে ওর মাথার চুলটা ঘেঁটে দিয়েছিল একটু। তারপর বলেছিল, "ইউ লুক ড্যাম সেক্সি ইন দিস হেয়ার। আই হ্যাভ আ হার্ড অন, হোয়েন ইউ লুক লাইক দিস।"

"'হোয়েন' মানে?" উর্নি অবাক হয়েছিল।

রৌনক বলেছিল, "আমি সবসময় কল্পনায় তোমাকে এভাবে দেখতাম।"

নিজের জীবনের সমস্ত গোপন কথা ও বলেছিল রৌনককে। এমনকী মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারটাও নিজের থেকে রৌনককে বলেছিল ও। আর সেই দিনটাও ছিল পঁচিশে ডিসেম্বর। রৌনক নিজের ওই দূষিত আকাশ-রঙা ফ্ল্যাটে উর্নিকে নিয়ে বড়দিন পালন করতে চেয়েছিল। সঙ্গমের পর একটা পেস্ট্রির টুকরো নিয়ে এসে ওর মুখের সামনে ধরেছিল রৌনক। বলেছিল, "মেরি ক্রিসমাস, উর্নি।" উর্নি দেখেছিল মোটা করে চকোলেট ক্রিম লাগানো পেস্ট্রি। চকোলেট ক্রিম। মা খুব ভালবাসত। হঠাৎ আমার বুকের ভেতর গভীর কুয়োয়

BanglaBook.org

সরসর করে নেমে যাচ্ছিল একটা বালতি। গলার কাছে অজানা এক ভয় এসে আঁকড়ে ধরছিল ওকে। তবু বালতিটা নামছিল, নেমেই যাচ্ছিল। পেস্ট্রিটা খেতে পারছিল না উর্নি। শুধু খটখটে শুকনো চোখ নিয়ে ও তাকিয়েছিল টুকরোটার দিকে। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল, যেভাবে অল্প হাওয়ায় ঘাসের ফলক কাঁপে। ওর দিকে স্থির হয়ে তাকিয়েছিল রৌনক। তারপর আলতো করে ওকে টেনে নিয়েছিল বুকে। ছলাত শব্দে বালতি পড়েছিল জলে। মাটির গভীর থেকে জল উঠে এসেছিল। বহু দিন পর শুকনো চোখে জল এসেছিল উর্নির। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে, রৌনকের বুকের সঙ্গে লেগে খুব কেঁদেছিল ও।

আর সেই রৌনক কিনা চলে গেল? উর্নি কী বলেছিল এমন?

শুধু বলেছিল, "আমায় এবার বিয়ে করো তুমি।"

রৌনক শুনে হেসেছিল খুব। কিন্তু উর্নি জেদ ধরায় প্রথমে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল ওকে, তারপর রাগারাগিও করেছিল ও। বলেছিল ও বাঁধা পড়তে চায় না। বাঁধতেও চায় না কাউকে। ও ফ্রি স্পিরিট।

রৌনকের প্রত্যাখ্যান মেনে নিতে পারেনি উর্নি। এক অখণ্ড শূন্যতা এসে ঢুকে গিয়েছিল ওর মাথায়। আস্তে আস্তে চারিদিকটা কালো চাদরে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ক্রমশ। শূন্যতা কী, সময় থেমে যায় কখন, অন্ধকার কীভাবে কথা বলে, সব বুঝতে পেরেছিল উর্নি। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ চিকিৎসা। এবং কাউনসেলিংয়ের পর সুস্থ হয়েছিল ও। কিন্তু মাঝের ওই শূন্য দিনগুলো হারিয়ে গিয়েছিল ওর স্মৃতি থেকে।

লোকে আড়ালে ওকে পাগলি বলত। তবে আড়ালে বলা সমস্ত কথাই কখনও না কখনও প্রকাশ পায়। উর্নিও জানতে পেরেছিল। কিন্তু ওর তখনও মনে হত, আর এখনও মনে হয়, পাগলামো যাকে বলে, তা অস্বাভাবিক নয়। এই সাড়ে সাত, আট হাজার বছরের তথাকথিত মানব সভ্যতা, মানুষকে যা ভাবতে শিখিয়েছে, তার বিপরীতে বা সেই স্পেকট্রামের বাইরের সমস্ত কিছুই পাগলামো বলে ধরা হয়। তাই নতুন কোনও তত্ত্বের কথা যখন প্রথম কেউ বলে তাকে পাগল বলে উড়িয়ে দেয় লোকে। আর সেই পাগলই যখন হাতেকলমে তার পাগলামোকে প্রমাণ করে দেয় তখন পৃথিবী তাকে জিনিয়াস বলে। আসলে সব কিছুই একটা ইলিউশন। সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখতে হয়তো এই ইলিউশনের দরকার হয়। সবাই তাতেই বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে অক্সিজেন ছাড়া কোনও জীব বাঁচতে পারে না। তারা ভুলে যায় এত বড়

BanglaBook.org

গ্যালাক্সিতে কোথাও হয়তো মিথেন নিয়ে বেঁচে থাকা জীবকুল সভ্যতা তৈরি করেছে। উর্নির মনে হয়, সমাজের অ্যাকসেপটেড ফ্রিকোয়েন্সি থেকে যখন কোনও মানুষের মস্তিষ্ক অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে জাম্প করে, তখন সবাই তাকে পাগল বলে। ও নিজেও হয়তো সে রকম কোনও ফ্রিকোয়েন্সিতেই ছিল কিছু দিন।

সমাজের অ্যাকসেপটেড ফ্রিকোয়েন্সিতে ফিরে আসার পর উর্নি বুঝেছিল প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে গেছে। ওর জীবনের একটা অংশ ভেঙে গেছে সম্পূর্ণ। তার ওপর বাড়ির অবস্থাও ভাল নয়। ওর চিকিৎসার পেছনে অনেক টাকা বেরিয়ে গিয়েছে। ও হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছিল। সেই সময় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ও এসেছিল বিটা অ্যাডে। ইন্টারভিউতে প্রতুলস্যার প্রচুর প্রশ্ন করলেও অহন বিশেষ প্রশ্ন করেনি। শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

চাকরিটা পেয়ে বেশ অবাক হয়েছিল উর্নি। ওর চেয়েও তো ভাল ক্যান্ডিডেট ছিল। ও পেল কী করে কাজটা? মাস চারেকের মাথায় একদিন কথায় কথায় প্রশ্নটা ও করেই ফেলেছিল অহনকে। তত দিনে ও বুঝে গিয়েছিল অহন কেমন মানুষ।

অহন মৃদু হেসে বলেছিল, "আসলে কী জানো, তোমার মধ্যে এমন দুটো শব্দ আছে যা আমার ডিকশনারিতে নেই।"

"মানে?" বুঝতে পারেনি উর্নি।

অহন বলেছিল, "অ্যাগ্রেশন আর কনফিডেন্স।"

"আপনার মধ্যে যে এ দুটো নেই, কে বলল?"

অহন হেসেছিল তারপর, অনেক দূরে তাকিয়ে আছে, এমনভাবে বলেছিল, "সে ছিল একজন।"

তবু মাঝে মাঝে রৌনকের ভূত এসে চাপত ওর ঘাড়ে। আবার টলমল করত মাথা। এক অশেষ শূন্যতা ঘুরে বেড়াত ওর মাথার চার পাশ দিয়ে। এরকমই একদিন সুগতর ঘুলঘুলিতে দু'পেগ জিন খেয়ে 'রৌনক রৌনক' করে চিৎকার করেছিল উর্নি। সুগতর একটা ঘড়ি ভেঙে দিয়েছিল, ওর ইজেল ভেঙে দিয়েছিল, তারপর ঘরের মেঝেতে শুয়ে অনেক কথা বলেছিল ও। কেঁদেও ছিল খুব। ভাগ্যিস সুগতর রিনিদি আর জামাইবাবু বাড়ি ছিল না তখন। থাকলে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হত।

সুগত খুব বেগ পেয়েছিল সেদিন। লেবু-জল থেকে ব্ল্যাক কফি সব কিছু

BanglaBook.org

খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল উর্নিকে। পারেনি। তারপর কোনওরকমে ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বমি করিয়েছিল বাথরুমে। পরদিন অফিসে সুগত বলেছিল, "কেন মাল খেতে যাস? পুরো লেডি দেবদাস! কাল আমায় পুরো টাইট দিয়ে ছেড়েছিলি। আর শালা কোনওদিন মাল খাবি না। তোর ওসব সহ্য হয় না।"

সুগত ছেলেটা ভাল। কিন্তু একটুও দায়িত্ববোধ নেই। এই যে আজ চলে গেল, এর কোনও মানে আছে? আশ্চর্য ছেলে! কে জানে এর পর ওর চাকরিটা থাকবে কি না!

প্রায় দেড়টা বাজে, এবার একবার দেখা যেতে পারে। গ্রিক চার্চের গলিটা ধরে ভেতরে ঢুকে গেল উর্নি। চার্চের পাশের এই রাস্তাটা সরু তবে পরিষ্কার। চারিদিকে গাছে ঢাকা। এই গলির শেষ বাড়িটা রূপা বাগচির নতুন স্টুডিয়ো। চেতলায় গিয়ে এই ঠিকানাটা পেয়েছে ও। ওখানে আর রূপা বাগচির স্টুডিয়ো নেই।

খানিকক্ষণ আগে এই স্টুডিয়োটায় গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে উর্নি। এখনও আসেননি রূপাদি। দেড়টা নাগাদ আসতে পারেন। কে জানে এখন এসেছেন কি না? ও তো গলির সামনেই দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ! অবশ্য গলির অন্য কোনও এন্ট্রান্সও থাকতে পারে। কিন্তু রূপাদি যদি না করে দেন তা হলে ভীষণ বিপদ হবে। কারণ, রাজ গুহকেও পায়নি উর্নি। বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে ওর। এখানে ব্যর্থ হলে কী করবে ও?

স্টুডিয়োর বাইরে ছোট্ট মোড়ায় ছেলেটা বসে রয়েছে। এই ছেলেটার কাছেই উর্নি শুনেছে যে, রূপাদি দেড়টা নাগাদ আসতে পারেন। উর্নি গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটার সামনে। একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল ছেলেটা। উর্নিকে দেখে উঠে দাঁড়াল ও, বলল, "দিদি আজ আসবেন না। সল্টলেক থেকে বেরোতে পারছেন না। একটু আগেই ফোন করেছিলেন। আমি তো খুঁজলাম আপনাকে, ভাবলাম, জানিয়ে দিই। কোথায় ছিলেন আপনি?"

উর্নি ঠোঁট কামড়াল। আজ কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কী হয়েছে আজ? ও ভাবল একবার নিজে ফোনে কথা বলে, কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবল, তাতে লাভ হবে না। কারণ, সল্টলেক থেকে যদি এখন না-ই আসতে পারেন তা হলে কাজ তো এখন শুরু করতে পারবেন না। ও ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, "রূপাদিকে রাতে পাওয়া যাবে?"

BanglaBook.org

ছেলেটা মাথা নাড়ল, "আজ তো পাওয়াই যাবে না আর। ওঁরা তো রাতেই গাড়ি করে শান্তিনিকেতন চলে যাচ্ছেন। সামনে লম্বা হলিডে।"

উর্নির ইচ্ছে হল নিজের মাথার চুলগুলো টেনে টেনে ছেঁড়ে। কী শুরু করেছে এরা? সবাই একসঙ্গে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে নাকি? এক্সোডাস শুরু হল? বছরের শেষে কী যে হয়, লোকেরা সব কুঁড়ের হদ্দ! কই, ওর তো কিছু মনে হয় না! মানুষের কাজ না-করার একটু অজুহাত পেলেই যেন হল।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, "আপনার কি খুব দরকার ছিল ম্যাডাম? সল্টলেকের ঠিকানাটা দেব?"

মাথা নাড়ল উর্নি, "না", তারপর বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ভাই"। ছেলেটা আবার মোড়ায় বসে ম্যাগাজিন খুলল।

স্টুডিয়োর কাচের দরজায় নিজের মুখটা দেখল উর্নি। রোদে চশমাটা কালো হয়ে আছে, মাথার চুলগুলোও এলোমেলো। ও কি তা হলে অহনের দেওয়া এই কাজটা করতে পারবে না? আচ্ছা, অহনই বা অমন করে কথা বলল কেন? তবে কি অহনও হাল ছেড়ে দিল? কী যে হবে কে জানে?

নিজের চিন্তার অস্থিরতায়, নিজেরই বিরক্ত লাগল উর্নির। ও আবার গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। হাওয়া দিচ্ছে বেশ। সারা কলকাতা জুড়ে আজ ওলট-পালট হাওয়া দিচ্ছে। আগে, এইসব হাওয়ার দিনে চুপচাপ বাড়ির ছাদে গিয়ে বসে থাকত উর্নি। তখন মা বেঁচে ছিল। পাশের বড় হলুদ রঙের চার্চটা দেখে হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ল উর্নির। আচ্ছা, মা যখন ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে পড়েছিল ঠিক তার আগের মুহূর্তে কি ওর কথা মনে আসেনি মায়ের? কীসের দুঃখ ছিল মায়ের? কেন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল শেষের দিনগুলোয়? কাল বড়দিন, সবার আনন্দের দিন। কিন্তু উর্নির? ওর মনে পড়ল বাবার জন্য ফ্রুট কেক কিনে নিয়ে যেতে হবে বাড়িতে। রাতে যিশুর পায়ের তলায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে কাচের পাত্রে রাখা ছোট্ট মোম।

এ-সময় অফিসে থাকলে লাঞ্চ করে উর্নি। তাই শরীর জানান দিচ্ছে এখন। খিদে পাচ্ছে ওর। সামনেই একটা বড় ঠ্যালা।

খাবার বিক্রি করছে একজন। এখানেই যা হোক কিছু খেয়ে নিতে হবে ওকে। তারপর নতুন করে চিন্তা করতে হবে কী করা যায়!

বড় ঠ্যালাটার পাশে খাবারের চার্ট ঝোলানো। চশমাটা খুলে ব্যাগের মধ্যে রাখল উর্নি। কে জানে কেন, খাওয়ার সময় চশমা চোখে রাখতে পারে না

BanglaBook.org

উর্নি। ও চার্টটা দেখে এক প্লেট চাউমিন অর্ডার দিল। ও জানে রাস্তার ধারে এইসব জায়গায় জঘন্য খাবার বানায়, তবু এখন তো খাওয়ার কথা চিন্তা করলে হবে না। এখন যা হোক খেয়ে নিতে হবে, কারণ, সামনে অনিশ্চিত সময় পড়ে রয়েছে, কাজ পড়ে রয়েছে অনেক।

অর্ডারটা দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল উর্নি। কতগুলো চ্যাংড়া ধরনের ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে ঠ্যালার সামনে। তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, "ন্যাপাদা, চটপট ডিম টোস্ট করে দাও তো ছ'টা। আমাদের বিশ্বে শান্তি আনতে যেতে হবে।"

"মানে?" তাওয়ার ওপর চাউমিন নাড়তে নাড়তে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল ন্যাপাদা।

"আরে আজ মিছিল আছে না? আমাদের সব যেতে বলেছে। দেশপ্রিয় পার্ক টু ময়দান। তুমি তাড়াতাড়ি করে দাও গুরু, না হলে কিন্তু বিশ্বশান্তির আগেই অশান্তি শুরু হয়ে যাবে।"

উর্নি দেখল ছেলেগুলো ন্যাপাদা নামক লোকটার সঙ্গে কথা বললেও ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখের দৃষ্টিটা ভাল লাগল না উর্নির। বদ ছেলের দল। ও অন্য দিকে মুখ ঘোরাল। আরে ওটা কী?

উর্নি দেখল কয়েক হাত দূরে চার্চ-ঘেঁষা রেলিংয়ের গায়ে কতগুলো ছবি ঝোলানো রয়েছে। আর তার সামনে ছোট্ট টুলের ওপর একটা বেঁটে ফরসা ছেলে বসে আছে। সামনেই ফুটপাথে দাঁড় করানো একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা, পোর্ট্রেট ও কার্টুন আঁকা হয়। ছেলেটা হাঁটুর ওপর রাখা ক্লিপ বোর্ডে একটা ড্রইং শিট বিছিয়ে কী সব দেখছে। কৌতূহল হল উর্নির। এমন তো দেখেনি কলকাতায়!

"দিদি, আপনার চাউমিন"। ন্যাপাদার ডাকে মুখ ফেরাল উর্নি। একটা প্লাস্টিকের প্লেটে চাউমিন দেওয়া হয়েছে। আর তার ওপর ছড়ানো শশা আর পেঁয়াজ কুচির মধ্যে একটা ফর্ক গাঁথা। উর্নি প্লেটটা নিয়ে সরে এল ওই ছবিগুলোর সামনে।

দেওয়ালে ছ'টা ছবি টাঙানো রয়েছে। তার মধ্যে একটা ছবি দেখে থমকে গেল ও। ভাল করে দেখবার জন্য আরও একটু কাছে এগিয়ে গেল উর্নি। বিরাট বড় একটা মাঠের মধ্যে একটা মেয়ে ভেসে আছে। মেয়েটার পিঠে প্রজাপতির মতো ডানা, আর মেয়েটাকে ঘিরেও রয়েছে প্রচুর প্রজাপতি।

BanglaBook.org

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার মেয়েটার কোমর অবধি রয়েছে আর বাকিটা গাছের শিকড়ের মতো। তবে ছবিটা উর্নির অদ্ভুত লাগল, কারণ ছবিটা এমনভাবে আঁকা রয়েছে যেন মনে হচ্ছে, কেউ ঢিল মেরে ভেঙে দিয়েছে গোটা ছবিটাকে। উর্নি দেখল ছবিটার তলায় নাম লেখা রয়েছে—'বাট, ড্রিমস'। অ্যাডভার্টাইজিংয়ে কাজ করতে করতে নানা রকম শিল্পীর সঙ্গে কাজ করতে হয় উর্নির, তা ছাড়া বরাবরই ছবি সম্বন্ধে ওর একটা ভাল লাগার থেকে তৈরি ধারণা রয়েছে। ও বুঝল, ছেলেটার হাত ভাল।

পেছন ফিরে উর্নি দেখল শিল্পী ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর সবুজ চোখ দুটোয় নানান জিজ্ঞাসা। উর্নি হাসল ওকে দেখে। আর তখনই ছেলেটার কোলের ওপর পেতে রাখা ড্রইং বোর্ডটায় নজরে গেল উর্নির। কী ওটা? উর্নি শক খেল যেন। এ কী দেখছে ও? সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের বোতল, কোম্পানির লোগো, দুটো মেয়ের শরীর... এগুলো এই ছেলেটার কোলে কী করছে? উর্নি ছেলেটার সামনে রাখা টুলে বসে পড়ল ধপ্ করে। এ তো সেই সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের বিজ্ঞাপনের লে-আউট যার জন্য আর্টিস্ট খুঁজতে সকাল থেকে হন্যে হয়ে ঘুরছে ও। লোগোটা চিনতে পারা যাচ্ছে দূর থেকেও।

"আপনি কিছু বলবেন?" ছেলেটার প্রশ্নে মুখ তুলল উর্নি। আধখাওয়া চাউমিনের প্লেটটা নামিয়ে রাখল ফুটপাথে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এটা আপনি কী এঁকেছেন?"

ছেলেটা হাসল বিষণ্ণভাবে, বলল, "এঁকেছি আর কোথায়? ওই তো একটা স্কেচের মতো। একটা বিজ্ঞাপনের জন্য করেছিলাম। একজন করতে বলেছিল আর কী, কিন্তু..."

ছেলেটাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে উর্নি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি কমার্শিয়াল আর্টিস্ট? বিজ্ঞাপনের কাজ করেন?"

মাথা নাড়ল ছেলেটা, "হ্যাঁ, কমার্শিয়াল আর্টিস্ট বলতে পারেন। আর বিজ্ঞাপনের কাজ পেলে করি।"

উর্নির হাত কাঁপছে, ঠোঁট শুকিয়ে আসছে। ও আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি এই ছবিটা কি অ্যাডগ্ল্যামের জন্য এঁকেছেন?"

ছেলেটা চমকে গেল এবার, "আপনি জানলেন কী করে?"

উর্নি বুঝল, আন্দাজের ঢিলটা ঠিক জায়গায় লেগেছে। কিন্তু এখনও সবচেয়ে ভাইটাল প্রশ্নটাই বাকি। একটা ছোট্ট সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে

BanglaBook.org

উর্নি। কিন্তু তা বাস্তবে কতটা ফলবে তার জন্য এই প্রশ্নটা জরুরি। ও জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি অ্যাডগ্ল্যামের হয়ে কাজ করছেন? মানে আপনি কি ওদের এই..."

উর্নি কথা শেষ করার আগেই ছেলেটা মাথা নাড়ল জোরে, বলল, "তা আর হল কই। ওঁরা এমন শর্ত দিলেন, তাতে সম্ভব নয় কাজ করা। আমার পরিশ্রমটাই জলে গেল।"

উর্নির শরীরটা হঠাৎ হালকা লাগল খুব। মনে হল ওর পিঠেও কেউ প্রজাপতির পাখনা লাগিয়ে দিয়েছে। মনে হল, এবার উড়তে পারবে ও। শতানিক বাসু যখন ছেলেটাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছিল তখন ছেলেটার মধ্যে যে কোয়ালিটি আছে, মানতেই হবে। উত্তেজনায় ওর হাত কাঁপছে। তবে, এবার দু'কোটি টাকার জন্য শেষ প্রশ্ন। উর্নি জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমাদের হয়ে কাজ করবেন?"

"অ্যাঁ?" ছেলেটার মুখ হাঁ হয়ে গেল।

"আমি বিটা অ্যাডে আছি। আপনি যদি রাজি থাকেন, তা হলে এক্ষুনি আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। উই আর রানিং আউট অব টাইম।"

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কোনওমতে বলল, "কিন্তু.."

"ও আপনি টাকার কথা ভাবছেন? সে নিয়ে চিন্তা করবেন না। হাজার দশেক পাবেনই। আর ভাল কথা, কম্পিউটারে অ্যানিমেশন জানেন?"

"জানি।" ছেলেটা মাথা নাড়ল।

"তা হলে এখানে বসে কী করছেন? চলুন আমার সঙ্গে। আমাদের হাতে সময় নেই একদম।"

ছেলেটা থতমত খেয়ে গেছে একদম। ও বলল, "বিটা অ্যাড তো বেশ নামকরা, সেখানে আমাকে..."

উর্নি উঠে দাঁড়িয়ে রেলিং থেকে ছবি খুলতে শুরু করল, ধমক দিয়ে বলল, "আচ্ছা লোক তো আপনি, বলছি চলুন।"

ছেলেটা থতমত খেলেও এবার উঠল। দ্রুত হাতে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল বড় ঠ্যালাটার সামনে। উর্নি দেখল, ন্যাপাদার হাতে সব জিনিসপত্র দিয়ে দিল ছেলেটা। ন্যাপাদা জিজ্ঞেস করল, "আরে তোর কী হল? গুটিয়ে ফেললি? শরীর খারাপ নাকি?"

উর্নি চাউমিনের প্লেটটা ফেরত দিয়ে বলল, "একে আমরা নিয়ে যাচ্ছি।"

BanglaBook.org

ন্যাপাদা থমকে গেল মুহূর্তের জন্য, তারপর হাসল, "কী, চাকরি?"

ছেলেটা বলল, "বুঝতে পারছি না।"

উর্নি ন্যাপাদার দিকে টাকা বাড়িয়ে ছেলেটাকে বলল, "দেখুন আমাদের ক্যাম্পেনটা মোটামুটি করা আছে এবার সেটা মঙ্গলবারের মধ্যে কমপ্লিট করে ফেলতে হবে। আসলে সুগত বলে আমাদের মেন অর্টিস্ট কাজটা শেষ করেনি তো, তাই..."

"সুগত সিনহা?" হাসল ছেলেটা।

উর্নিও হাসল, চোখ বড় বড় করে বলল, "আচ্ছা, রাস্তায় বসে কী করছেন আপনি?"

আনন্দে হাত-পা কাঁপছে উর্নির। ও চার্চের দিকে তাকাল। বড় বড় থাম, হলুদ রঙের দেওয়াল। বাল্‌বের, রিবনে সব সুন্দর ভাবে সাজানো ওপরে একটা ক্রস। ক্রিসমাস। মা বলত, "বেস্ট টাইম অব দ্য ইয়ার।"

উর্নি ভাবল অহনকে আর ফোন করবে না, একদম অফিসে গিয়ে সারপ্রাইজ দেবে। ও ছেলেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাই দ্য ওয়ে আপনার নামটা?"

সবুজ চোখ তুলে ছেলেটা তাকাল ওর দিকে, বলল, "সাইমন রুপেন মণ্ডল।"

"ট্যাক্সি" হাত তুলল উর্নি। কিন্তু শুনল আরেকজনও চিৎকার করেছে। কিন্তু ট্যাক্সিটা ওরই বেশি দরকার। কারণ, সময় নেই আর। সাইমনকে আসতে বলে আবার ট্যাক্সি ধরতে দৌড়োল উর্নি। কিন্তু ট্যাক্সির হাতলে হাত দেবার আগেই দেখল আরেকটা হাত ধরে ফেলেছে হাতলটা। মুখ তুলল উর্নি। আরে আর্চি!

উর্নি বলল, "থ্যাঙ্ক গড আর্চিদা। ট্যাক্সিটা খুব দরকার আমার।"

আর্চি বলল, "আরে উর্নি! আমাকেও তো যেতে হবে।"

উর্নি বলল, "প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ।" তারপর আর্চির উত্তরের অপেক্ষা না করেই উঠে বসল ট্যাক্সিতে। হাত দিয়ে ডেকে নিল সাইমনকে। আর্চিকে আর পাত্তা না দিয়ে ও ট্যাক্সিওলাকে বলল, "দাদা, পার্ক স্ট্রিট চলুন।"

ট্যাক্সিওলা বয়স্ক লোক। উর্নির দিকে তাকিয়ে বলল, "দেশপ্রিয়র ওখান দিয়ে ঘুরিয়ে মিন্টো পার্ক হয়ে যাব। এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। রবীন্দ্র সদনের ওখানে বিশাল জ্যাম।"

BanglaBook.org

উর্নি ঠোঁট কামড়াল, ঘুর হচ্ছে অনেকটা। কিন্তু কুছ পরোয়া নেহি। ও বলল, "তাই চলুন দাদা। আমাদের সময় নেই আর।"

চলন্ত ট্যাক্সির পেছনের কাচ দিয়ে ও দেখল রাস্তায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর্চি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে নাকের ডগা দিয়ে ট্যাক্সি ছিনতাই হয়ে যাওয়ায় বেশ বিরক্ত। তবে কিছুটা অবাকও হয়তো। অন্য সময় হলে উর্নি দাঁড়িয়ে গল্প করত খানিকক্ষণ। কিন্তু আজ নয়। সামনে অনেক কাজ। ওকে কাজ করতে হবে। যে-গর্তের মধ্যে থেকে ওর জীবন কাটছিল সেখান থেকে খানিকটা উঠেছে ও। এবার আরও উঠতে হবে। পেছনের দিকে তাকানোর আর সময় নেই। ও দেখল সাইমন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। বাইরে দুপুর বেলার রোদ। এই রোদের মতো রাখতে হবে মনটাকে। উর্নি ব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা আয়না বের করল, তারপর সেটা দেখে ঠিক করতে লাগল এলোমেলো চুলগুলোকে। এলোমেলো থাকার দিন শেষ। এবার গুছিয়ে নিতে হবে জীবনকে।

অর্চিষ্মান ২৪ ডিসেম্বর, দুপুর দুটো দুই

হাতের ডিজিটাল ঘড়িটার দিকে তাকাল আর্চি। শালা, সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। উর্নি নাকের ডগা থেকে ট্যাক্সিটা নিয়ে গেল! কী এমন দরকার ওর? আশ্চর্য মেয়ে একটা। কিন্তু এমনভাবে ট্যাক্সিটা ছিনতাই করে নিল যে, মেয়েটাকে কিছু বলার স্কোপই পেল না আর্চি। হিসেব মতো এখন তো ওর নানুর বাড়িতে থাকার কথা। কিন্তু দেরিটা হল জনিদার জন্য। আসলে, জনিদা এমনভাবে বলল যে, ও আসতে বাধ্য হল নার্সিংহোমটায়। ওর দাদা শতানিক বাসুর খুব বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের এক নার্সিংহোমে ভরতি। জনিদা অনেক কাজকর্ম দেয় আর্চিকে। তাই ও না করতে পারেনি। জনিদার এই এক ব্যাপার, আর্চিকে দেখলেই বগলদাবা করে 'এখানে চল, ওখানে চল' বলে। আর্চিই বা কী করবে? তেতো ওষুধ গেলার মতো মুখ করে যায় জনিদার সঙ্গে। আসলে ওদের লাইনে, জনিদা, মানে জনার্দন বাসু একটা গুরুত্বপূর্ণ নাম।

অ্যাক্সিডেন্টটা আজকেই হয়েছে, রাসবিহারী মোড়ে। জনিদার কাছে যখন

BanglaBook.org

খবরটা পৌঁছোয় তখন আর্চি জনিদার সামনেই বসে ছিল। ও লাঞ্চ করছিল জনিদার সঙ্গে। কিন্তু খবরটা পৌঁছোতেই খাওয়া-দাওয়া সব মাথায় ওঠে ওদের। আর তারপর যা প্রতিবার হয়, এবারেও তাই হয়েছে। জনিদা ধরে নিয়ে এসেছে আর্চিকে। তবে শতানিকের চোট ভালই লেগেছে। আর্চি যখন বেরিয়ে আসছিল নার্সিংহোম থেকে তখনও ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। ওঁর স্ত্রী খুব কান্নাকাটি করছিল। পুলিশও ছিল দু'-তিন জন। ভদ্রলোক অ্যাক্সিডেন্ট করার পর ওঁকে নাকি পাবলিক মারধরও করেছে। ফলে, অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। কখনও কখনও আর্চি ভাবে যে, মানুষের মধ্যে বোধহয় একমাত্র গণধোলাইয়ের সময়েই ঐক্য আসে!

একটু আগেই নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এসেছে আর্চি। নানুর ঝামেলা মিটিয়ে ওকে তো যেতে হবে প্রিয়া সিনেমার সামনে। ইরা অপেক্ষা করবে। ওর ইচ্ছে আছে পৌনে তিনটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওখানে। ইরাকে অপেক্ষা করাবে না আজ। আসলে ইরা যতই ভাবুক আর্চি ইরার প্রতি উদাসীন, আসলে কিন্তু তা নয়। ওর এই ফোটোগ্রাফির কাজটাই এমন যে, যখন-তখন যেখানে-সেখানে চলে যেতে হয়। আর্চি জানে ইরাকে কতটা ভালবাসে ও। ইরাকে ছাড়া ওর যে কী অবস্থা হবে, সেটাও ও ভাল করেই জানে। আজ যেভাবে ইরা বলেছে তাতে বেশ ভয়ই লাগছে। মেয়েটা যদি সত্যিই জেদের বসে আর সম্পর্ক না রাখে ওর সঙ্গে! নাঃ, আজ সময় মতো পৌঁছোবেই আর্চি।

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে ও ভেবেছিল মেট্রো করে নেতাজি ভবন চলে যাবে। নানুদের বাড়ি সেখান থেকে কাছেই। কিন্তু মেট্রোয় ঢুকে ওর চোখ কপালে উঠে গিয়েছে আজ। সমস্ত কলকাতার লোক যেন ঢুকে পড়েছে মাটির তলায়। এটা যে মিছিলের প্রভাব, বুঝতে পারছিল আর্চি। হাবিজাবি কারণে মিছিল করলেই যেন হল। সারা কলকাতাকে স্তব্ধ করে বিশ্বের কোথায় শান্তি আসবে কে জানে!

মেট্রোতে টিকিটের লাইন প্রায় স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে মাটির ওপরে উঠে এসেছে। আর্চি বুঝেছিল, এভাবে যেতে গেলে সন্ধেবেলা গিয়ে পৌঁছোবে নেতাজি ভবন। ও তাই ট্যাক্সি খুঁজছিল। দুটো ট্যাক্সিওলা ভবানীপুর শুনে যেতে চায়নি। তাই ভেবেছিল পরেরটাতে কিছু না বলে একদম উঠে বসে পড়বে। কিন্তু সুযোগই পেল না। শুধুমাত্র ওই পাগলি মেয়েটার জন্য।

উর্নিকে দেখে রীতিমতো চমকে গিয়েছে আর্চি। এখানে এখন কী করছে

BanglaBook.org

ও? অফিস নেই? আর সঙ্গের ছেলেটাকে দেখে কেমন চেনা মনে হল। আরে! এই ছেলেটাই সকালে ওর কাছ থেকে সময় জানতে চেয়েছিল না! অত তাড়াহুড়ো করে ট্যাক্সি ধরে কোথায় গেল মেয়েটা? দেখেই বোঝা যাচ্ছিল খুব একসাইটেড হয়ে আছে। মাথার চুল এলোমেলো, চোখেমুখে উত্তেজনা। এমনিতে আর্চির সঙ্গে দেখা হলে খুব বকবক করে। কিন্তু আজ যেন 'হাই' বলার সময়টুকুও ছিল না। সত্যি দাদাদের অফিস তো নয়, চিড়িয়াখানা। যেমন এই উর্নি, তেমন প্রতুলকাকা আর তেমন দাদা নিজে। মাঝে মাঝে ওর মনে হয় এরা একসঙ্গে কাজকর্ম করে কী করে! কিন্তু মেয়েটা এমনভাবে ট্যাক্সিটা ছিনতাই করল যে, এখন আর্চির বিপদ হল। কী করবে ও?

আর্চি সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। কাছেই হাজরা মোড়। কিছু একটা পেতেই হবে। হুহু করে গাড়ি যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। ও ভাবল, রাস্তা পার হয়ে অন্য দিকে যাবে। অন্তত বাস তো পাবে। অবশ্য সেটা লাস্ট অপশন। বাসে উঠতে একদম ভাল লাগে না আর্চির। তবু এখন যা অবস্থা, তাতে আর চয়েসই বা কী আছে ওর? অবশ্য বাসে না উঠতে চাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ওর ক্যামেরার ব্যাগ। কে কখন ঠুকে ভেঙে দেয় কে জানে। রাস্তা পার হওয়ার জন্য পা বাড়াল আর্চি আর তখনই ওর চোখে পড়ল ঘটনাটা।

হুহু করে একটা লাল বাস এগিয়ে আসছে আর তার দিকে টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছেন একজন ভদ্রলোক। কী করছেন ভদ্রলোক? উনি কি পাগল না মাতাল? ওভাবে কেউ চলন্ত বাসের মুখোমুখি এগোয় নাকি? আরে মারা পড়বেন তো উনি! উনি কি বুঝতে পারছেন না কী করতে চলেছেন? আর্চি দেখল বাসটা প্রায় এসে পড়েছে। ভদ্রলোকও পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বাসের দিকে। আর্চি আর পারল না। "ও দাদা, আরে ও দাদা," চিৎকার করে ভদ্রলোককে ডাকার চেষ্টা করল ও। কিন্তু কী মুশকিল! ভদ্রলোক তো শুনছেনই না কিছু। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো এগিয়ে যাচ্ছেন বাসের দিকে। নিমেষে কর্তব্য স্থির করে নিল আর্চি। ও দৌড়োল। বাসের দিকে এগোচ্ছেন ভদ্রলোক, আশেপাশে কয়েকজনও ব্যাপারটা দেখেছে এবার। তারাও চিৎকার করছে। লাল বাসটা বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে ছুটে আসছে সামনের থেকে। আর্চি নিজের গতি বাড়াল। ভদ্রলোক আর কয়েক পা এগোলেন। বাসটা দশ হাতের মধ্যে চলে এসেছে। আর্চি ভুলে গেল যে, ওর পিঠে ক্যামেরার ব্যাগ রয়েছে। ও প্রায় লাফিয়ে পড়ে ভদ্রলোকের হাত ধরে টান

BanglaBook.org

মারল। হ্যাঁচকা টানে ভদ্রলোক পড়ে গেলেন আর্চির ওপর। লাল বাসটা প্রায় ওদের চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল। দরজা থেকে কনডাক্টরটা চিৎকার করল, "অ্যাই শুয়োরের বাচ্চা"।

মাটিতে, ভদ্রলোকের তলায় শুয়ে আর্চির প্রথমেই মনে হল, ক্যামেরা ঠিক আছে তো ওর। মাথা ঘোরাল আর্চি। ব্যাগটা মাথার কাছে পড়ে আছে। দু'-দুটো ক্যামেরা রয়েছে এর মধ্যে। লেন্স ভেঙে যায়নি তো? গেলে সর্বনাশ হবে। এতক্ষণে অন্যান্য মানুষজন এসে উঠিয়ে বসাল দু'জনকে।

এবার ভদ্রলোককে ভাল করে দেখল আর্চি। অদ্ভুত সুন্দর দেখতে মানুষটাকে। মানুষটা কেমন বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন সামনের দিকে। যেন উনি এখানে নেই। যেন কিছুই স্পর্শ করছে না ওঁকে। চারিপাশ থেকে উড়ে আসা প্রশ্নগুলোও যেন অন্য কাউকে করা হচ্ছে। লোকজন ইতিমধ্যে আশেপাশের থেকে জল ধরিয়ে দিয়েছে ওদের হাতে। আর্চির বাঁ দিকের কনুইটা জ্বালা জ্বালা করছে। ও দেখল রক্ত বেরোচ্ছে একটু। জল দিয়ে কনুইটা ধুয়ে ফেলল ও।

আর্চি দেখল সবাই ভদ্রলোককে নিয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রকম উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ওঁকে। ভদ্রলোক বিভ্রান্ত চোখে শুধু এ-দিক ও-দিক দেখছেন। আচ্ছা, উনি এভাবে বাসের সামনে এগোচ্ছিলেন কেন? আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন কি? কিন্তু বাসের সামনে পড়ে কেউ মরতে চায় নাকি? ও শুনল সবার নানান উপদেশের মাঝে ভদ্রলোক বিড়বিড় করছেন। আর্চি ঝুঁকল লোকটার দিকে। "কিছু বলছেন?" লোকটা এখনও বিহ্বল। শুধু ফিসফিস করে বললেন, "আমার পাপ, আমি... আমি পাপী..."

আর্চি ভদ্রলোকের কাঁধ ধরল, হালকাভাবে বলল, "আর এমন করবেন না। কী হবে এভাবে মরে গিয়ে? দেখুন তো, আমার দেরি করিয়ে দিলেন।" আর্চির শেষের কথাগুলোয় ভদ্রলোক হাসলেন এবার। দুর্বল হাসি। তারপর ধীর গলায় বললেন, "সরি ভাই"।

"আর করবেন না তো এমন?" আর্চি দেখল আশেপাশের সবাই ওদের কথা শুনছে।

"নাঃ, আর সাহস নেই।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন মুসলমান ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। দেখে চিনতে পারল আর্চি। নুরচাচা। সর্দার শঙ্কর রায় রোডের মুখে দোকান

BanglaBook.org

আছে ভদ্রলোকের। উনি বললেন, "বাঁচতে সাহস লাগে ভাই, মরতে নয়, বুঝেছ?"

মানুষটা সবার মধ্যে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। কেন এমন করলেন ভদ্রলোক?

দুটো তিরিশ। আজ একটা কেলেঙ্কারি হবেই। দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। এখন, কখন ভবানীপুর যাবে আর কখনই বা প্রিয়া সিনেমার সামনে যাবে? আর্চি বিভ্রান্ত মানুষটার দিকে তাকাল আর একবার। হঠাৎ কাশ্মীরের একটা ঘটনা মনে পড়ল ওর।

একদিন নিজের ঘরে বসে জায়েদের সঙ্গে কথা বলছিল আর্চি। সে দিন বৃষ্টি হচ্ছিল খুব। সারা কাশ্মীর ঠান্ডায় জবুথবু হয়েছিল একেবারে। টেররিজম নিয়ে কথা বলছিল জায়েদ। ও বলেছিল, "সাব, একবার অগর আপ ঠান লেতে হো কি মরনা হ্যয়, তো মরনা হ্যয়। অগর উসমে একবার ভি রুকাবট আ যায়ে না, ফির মরনা মুশকিল হ্যয়। মোটিভেশন চলা যাতা হ্যয়। টেররিস্ট লোগো কো ইসকে পরে জানে কি হি ট্রেনিং দি জাতি হ্যয়। খুদ কো মার ডালনা আসান নেহি হ্যয় সাব।"

আর্চি দেখল মানুষটা এখনও কাঁপছেন, হয়তো নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছেন। আচ্ছা, কী পাপ করেছেন ভদ্রলোক? কীসের জন্য নিজেকে এভাবে বাসের তলায় নিয়ে যাচ্ছিলেন? আর্চি ব্যাগটা খুলল। নাঃ, ক্যামেরা ঠিক আছে। একটা ব্যাপার নিশ্চিন্ত হল অন্তত।

কিন্তু, এখন কী করবে ও? ভবানীপুর গিয়ে আর লাভ হবে না। নানুর পিসিরা নিশ্চয়ই চলে গেছে এতক্ষণে। ইস্, কথার খেলাপ হয়ে গেল। এসব অনুরোধের ফোটো-টোটো তুলতে বিশ্রী লাগে আর্চির। কিন্তু, তা হলেও কথা দিয়েছিল তো! সেটা রাখা গেল না। ধ্যাত। হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠল পকেটে। কে ফোন করছে? ইরা? আর্চির মনে সামান্য আশার সঞ্চার হল।

তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরল আর্চি, "হ্যালো? ইরা?"

"না রে শালা পিঙ্গলা, কেলিয়ে তোমার সুসুম্না পর্যন্ত নাড়িয়ে দেব। এলি না কেন?"

নানু, ইঃ, ব্যাটা খেপে গেছে। নিমেষে আলো ফিউজ। আর্চি বলল, "ব্যাপক আটকেছি রে!"

BanglaBook.org

"টপ মেরো না। কী এমন কাজ তোর? কোনও মরণাপন্নকে বাঁচাচ্ছিলি? আমার প্রেস্টিজে একদম গ্যামাক্সিন মেরে দিলি? শালা, বন্ধুর নামে কলঙ্ক তুই।"

'মরণাপন্নকে বাঁচাচ্ছিলি' অবাক হয়ে গেল আর্চি, "তুই জানলি কী করে?"

"শোন, নাটক করবি না। পিসিরা অপেক্ষা করতে করতে চলে গেল। আমার বোনটার ফোটো তোলা হল না। সত্যিই তোর কথার কোনও দাম নেই।"

আর্চি বলল, "সরি ভাই, সত্যি ফেঁসে গিয়েছিলাম।"

নানু দম নিল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, "ঠিক আছে, শোন আর একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"আবার কাজ?" বিরক্ত হল আর্চি।

"তোর দাদা তো অ্যাড এজেন্সি চালায়। একটা মেয়েকে মডেল হিসেবে চান্স করিয়ে দিতে হবে। দারুণ মেয়ে। একদম কাঁপাকাঁপি। ওকে কথা দিয়ে দিয়েছি আমি। দেখিস যেন হয়। অহনদার সঙ্গে কথা বলে আমায় জানাবি। কালকেই জানাবি। তারপর মেয়েটাকে নিয়ে আসব আমি। বুঝলি?"

"কে রে মেয়েটা? কে আবার তোর ওপর বিশ্বাস করল?"

নানু হাসল, "আছে, আছে। যখন দেখবি না, একদম হিংসেয় শুকনোলঙ্কা হয়ে যাবি।"

"প্রেম করছিস নাকি?" আর্চি না জিজ্ঞেস করে পারল না।

"করছি না, করব। যাক, কাজটা যেন হয়। কাল ফোন করব আবার।" নানু কেটে দিল লাইনটা। মোবাইলে বেশিক্ষণ কথাই বলে না ও। দরকার শেষ হওয়ামাত্র রেখে দেয় ফোন। ব্যাটা খুব কিপটে।

অবাক লাগল আর্চির। নানু আর প্রেম? তাও মডেলের সঙ্গে? আজ হচ্ছেটা কী? আবার ঘড়ি দেখল আর্চি। দুটো চল্লিশ। আর না, এবার যেতেই হবে। ও দেখল, একটু দূরে বসে থাকা লোকটার চারিদিকে আর ভিড় নেই। শুধু নুরচাচা বসে কিছু বোঝাচ্ছেন। দৃশ্যটা দেখে ভাল লাগল আর্চির। এমন একটা দিনে মৃত্যুর কোনও স্থান নেই। ওঁর জীবনে যাই ঘটে থাকুক না কেন, তার সমাধান মৃত্যু হতে পারে না।

"ট্যাক্সি"। সামনে দিয়ে যাওয়া একটা ট্যাক্সিকে হাত দেখাল আর্চি। ট্যাক্সিটা থেমে গেল। আর্চি জানলার মধ্যে মাথা গলিয়ে বলল, "জায়েগা?"

BanglaBook.org

"উঠে বসুন। আর দেখুন আমায় বিহারির মতো দেখতে হলেও আমি বিহারি নই। আমার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলবেন না। বাংলায় দাঁড়িয়ে রবি ঠাকুরের ভাষায় কথা বলুন।"

আর্চি উঠে বসল, "অন্যায় হয়ে গেছে দাদা, দেশপ্রিয় পার্ক যাব।"

"দেশপ্রিয় পার্ক? এখন? না, না। ওখানে একটু পরেই বা... ইয়ে মিছিল বেরুবে। আমি রাসবিহারী অবধি পৌঁছে দিতে পারি, তার বেশি নয়।"

"তাই চলুন। কিন্তু তাড়াতাড়ি।"

ড্রাইভারটা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি? তাড়াতাড়ি করতে নেই। তাতে গাঁ... ইয়ে হয়। আমার মা বলত, তাড়াতাড়িতে সব নষ্ট হয়। তাড়াতাড়ি হল শয়তানের পন্থা। তা ছাড়া শহরের রাস্তা তো আমার নয় যে, বললাম আর পৌঁছে গেলাম। এখানে গাড়ি আছে, ট্রাম আছে, বাস আছে, দুমদাম রাস্তা পেরোনো বো...মানে লোক আছে, এদের পেরিয়েই তো যাব। তাড়াতাড়ি বললে হবে? হ্যাঁ, যদি আজ থেকে তিরিশ বছর আগের কলকাতা হত, তা হলে দেখিয়ে দিতাম তাড়াতাড়ি কাকে বলে!"

আর্চির ইচ্ছে করল লোকটার গলা টিপে ধরতে। না হলে বোধহয় লোকটা থামবে না। কিছু লোক আছে যারা, কোথায় থামতে হয়, জানে না। তবে বেশিক্ষণ এই অত্যাচার সহ্য করতে হল না আর্চিকে। এখান থেকে রাসবিহারী মোড় খুব কাছে। তাই বেশি সময় লাগল না পৌঁছোতে।

রাসবিহারী মোড়ে নেমে আর্চি একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল ড্রাইভারের দিকে।

ড্রাইভারটা বলল, "খুচরো দিন। হয়েছে কুড়ি আর দিচ্ছেন পঞ্চাশ!"

"আরে চেঞ্জ নেই আপনার কাছে?"

"চেঞ্জ? না নেই", ড্রাইভারটা হাসল, "চেঞ্জ সবাই চায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বো... মানে কেউ দিতে পেরেছে কি? এত বিপ্লব হল, মানুষ মারা গেল, এত হিন্দি সিনেমা হল, বাংলা সিনেমা হল, কিন্তু চেঞ্জ হল কি কিছু? কিচ্ছু হল না, চেঞ্জ, সে সমাজ বা নোট, কারওই হয় না। আমি তুচ্ছ ড্রাইভার আমার কাছে চেঞ্জ কোথায় থাকবে?"

সময় থাকলে এর একটা ছবি তুলে রাখত আর্চি। ও বলল, "দাদা, দোহাই আপনি পঞ্চাশ টাকাই রাখুন।" ঘড়ি দেখল আর্চি, আর মিনিট দশেক সময় আছে।

BanglaBook.org

ড্রাইভারটা বলল "তা কেন? এই নিন, কুড়ি টাকা ফেরত দিতে পারব আমি। আসলে জানেন তো, মা বলত..."

আর্চি আর পারল না, বলল, "দাদা, প্লিজ কুড়ি টাকাই দিন। আর আপনার মায়ের কথা পরে শুনব।"

লোকটা তোম্বা মুখে দুটো দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল? আর্চি আর দাঁড়াল না। তবে ও যেতে যেতে শুনল লোকটা নিজের মনে বলছে, "এই সমাজ মায়ের কথা না শুনেই উচ্ছন্নে গেল। গেলে যাক। মা... ইয়ে আমার কী? আমার গাড়ি করে তো আর যাচ্ছে না।"

রাসবিহারী মোড়ে অটো দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে। কী হল, অটো কম কেন? ওই অ্যাক্সিডেন্টের পরেই কি? বিরক্ত লাগল আর্চির, আননেসেসারিলি এতটা দৌড়ঝাঁপ করল। এই রাসবিহারী মোড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে আবার এখানেই ফিরে আসতে হল। জনিদাই সব গোলমাল করে দিয়েছে।

ও এগিয়ে গেল একটা অটোর দিকে, "দাদা, যাবেন?"

"না, এখন লাইন বন্ধ। মিছিল পাস করার পর আবার লাইন চালু হবে।" রুক্ষভাবে উত্তর দিল অটোওলা।

"দাদা, প্লিজ চলুন না, ভীষণ জরুরি।" আর্চি অনুনয় করল।

"দেখুন, যাওয়া যাবে না এখন। অন্য পথ দেখুন।" আরও চোয়াড়েভাবে বলল অটোওলাটা।

আর্চি দাঁতে দাঁত ঘষল। আর মিনিট সাতেক আছে। ও ফোনটা বের করল। ইরাকে বলতে হবে কী অবস্থায় রয়েছে ও। ইরার নম্বর ডায়াল করে কানে লাগাল আর্চি। বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। ইরার রাগী মুখটা মনে পড়ছে ওর। ভীষণ সুন্দর রাগী একটা মুখ।

"দ্য নাম্বার ইউ আর ডায়ালিং ইজ কারেন্টলি নট অ্যাভেলেবল।"

দুটো ভাষায় একই কথা শুনল আর্চি। শিট্! হাতের মোবাইলটাকে ছুড়ে মারতে ইচ্ছে করল ওর। ইরা সত্যিই মোবাইল অফ করে রেখেছে তা হলে! মেয়েটা ভীষণ রেগে আছে ওর ওপর। নিজেকে গালাগালি দিল আর্চি। সব ওর জন্য। সত্যিই তো, মেয়েটার বাবা যে কী ভেবেছে ওর সম্বন্ধে! আর তার ওপর আজ ও যদি পৌঁছোতে না পারে? সারাজীবন আপশোসের শেষ থাকবে না।

এ-দিক ও-দিক দেখল আর্চি। আজ কপালটাই খারাপ। একটা ট্রামও নেই।

BanglaBook.org

তবে কি বাস ধরবে? সে তো স্টপেজ মারতে মারতে যাবে। ও ভাবল শেষ চেষ্টা করবে একবার। আবার অটোর কাছে গেল, "দাদা, প্লিজ দাদা। খুব প্রয়োজন।"

লোকটা তেরিয়াভাবে বলল, "তাতে আমার কী? ফুটুন তো। ফালতু কিচাইন করবেন না।"

আর্চি কিছু বলার আগেই শুনল, পেছন থেকে একজন ডাকল, "আমারটায় বসুন, পৌঁছে দিচ্ছি।"

ঘুরে তাকাল ও। সাধারণ চেহারার একজন অটোচালক। কিন্তু আর্চির মনে হল সাক্ষাৎ দেবদূত। লোকটা আবার বলল, "কী হল দাদা, আসুন, পৌঁছে দিচ্ছি।" আর্চি আর দ্বিধা না করে উঠে বসল অটোর পেছনে। লোকটা অটোয় স্টার্ট দিল। পাশ থেকে একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, "বোমদা, ফালতু লাফড়া নিচ্ছ। দেশপ্রিয়তে ক্যাচাল আছে। আর এক্ষুনি তো ফিরলে তুমি সোনাইকে ডাক্তার দেখিয়ে, একটু রেস্ট নিলে পারতে। কী দরকার উপকার করার?"

বোম অটোর ক্লাচ ছেড়ে বলল, 'জাসু, চেপে যা। ফালতু ফ্যাচকাবি না।"

অটোর ভেতর থেকে আর্চি দেখল জাসু নামক ছেলেটা ঝাড় খেয়ে বেশ দমে গেছে।

অটো ছুটছে হুহু করে। এই লেক মার্কেট পেরোল। রোদের রং কমলা হতে শুরু করেছে এখন। হাওয়া দিচ্ছে খুব। আর্চির হাওয়াটা ভাল লাগলেও, টেনশন হচ্ছে। দেশপ্রিয় পার্কের দিকে এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। একটা ছোট্ট বরফের শুঁয়োপোকা শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে আর্চির। পারবে তো ঠিক সময়ে পৌঁছোতে?

"দাদা, আর তো যাবে না। দেখুন রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।"

বোমের কথা শুনে আর্চি দেখল, সামনে সার দিয়ে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর মোড়ের কাছে কিছু লোক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে বন্ধ করে দিয়েছে ট্র্যাফিক। আর্চি আর অপেক্ষা করল না। বোমের হাতে ভাড়া দিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। এখন একটাই উপায় আছে। দৌড়। ও ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করল একটা তারপর তার স্ট্র্যাপটাকে হাতে পেঁচিয়ে দৌড়োতে শুরু করল ফুটপাথ দিয়ে। মিছিল বেরোবার আগে যে করেই হোক ওকে দেশপ্রিয় পার্কটাকে পার করতে হবে। দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকের গায়ে ধাক্কা লাগছে।

BanglaBook.org

গালাগালি করছে তারা, তবু আমল দিল না আর্চি। ফুটপাথের দোকান, মোটা ভদ্রলোক, বয়স্কা দিদিমা, জিনস-পরা তরুণী, সবাইকে কাটিয়ে মরিয়া আর্চি পৌঁছে গেল মোড়ে। ট্র্যাফিক থামানো লোকগুলো লাঠি তুলে হইহই করে দৌড়ে এল ওর দিকে। আর্চি হাতের ক্যামেরা দেখিয়ে চিৎকার করল, "প্রেস, প্রেস।" চিচিং ফাঁক। রাস্তা পেরিয়ে ওই দিকে গিয়ে উঠল আর্চি। মিছিলও এসে গেছে দেশপ্রিয় পার্কের গেটের কাছে। আর্চি জানে মিছিল একবার বেরিয়ে পড়লে, ওকে আর মিছিলের ভেতর দিয়ে যেতে দেবে না কেউ। মিছিল শেষ না হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তা প্রায় আধ ঘণ্টার মতো ব্যাপার। যেটা অসম্ভব। ও প্রাণপণে দৌড়োতে লাগল। মিছিলটা প্রায় গেট দিয়ে বেরুচ্ছে। আর্চিও পৌঁছে গেছে গেটের মুখে। একটু, আর মাত্র একটুখানি, পা ছিঁড়ে যাচ্ছে ওর। কাঁধের ভারী ব্যাগটা কেটে বসছে শরীরে। তবু ওকে পৌঁছোতে হবে, ইরা অপেক্ষা করছে। ইরাকে হারাতে পারে না ও। ইরাকে হারানো মানে ওর জীবনের যেটা সবচেয়ে ভাল অংশ, যেটা কোডাক মোমেন্ট্, সেটা হারিয়ে ফেলা। ও দেখল গেট দিয়ে একটা দুটো লোক বেরুচ্ছে। তারা স্লোগান দিচ্ছে, হাতে ধরে থাকা ফেস্টুনও নাড়ছে খুব। আর চার-পাঁচ পা। মিছিল বেরোবার আগেই এই গেটের সামনেটা পেরিয়ে যেতে হবে আর্চিকে। ইরার কাছে যেতে হবে। মিছিল আসছে, মিছিল প্রায় এসে গেল। আর কয়েক পা। নিজের শেষটুকু দিয়ে দৌড়োতে লাগল আর্চি...

দ্বিতীয় সূত্র সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শেষের পরে

খবর কাগজটা মুড়ে রাখল নেড়ু পাগলা। খারাপ খবরে ভরতি। প্রথম পাতাতেই বোমায় আহত বাচ্চাদের ছবি। দেখলেই গা জ্বলে যায়। একটা মন খারাপের গন্ধ এসে ঠোক্কর মারে নাকে। কারা তোলে এসব ছবি? কারা ছাপায়? ভাল ছবি ছাপাতে পারে না? এই যেমন ওই ক্যামেরা হাতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ানো ছেলেটাকে সুন্দর মতো মেয়েটা যে জড়িয়ে ধরল, তার ছবি ছাপানো যায় না? ওই যে মেয়েটা বলল, "তুমি যতক্ষণ না আসছ, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম আমি, সারাজীবন দাঁড়িয়ে থাকতাম তোমার জন্য।" সেটুকু ছাপানো যায় না? কী সব ছাপায় এরা? মানুষ মানুষকে মারছে, বাচ্চারা কাঁদছে, ন্যাংটো মেয়েদের দেখে নাল পড়ছে সবার, এ কোন দেশ? এ কোথায় আছে ও? এরা কারা ওর চারপাশে? সবসময় সবাই কথা বলছে, চিৎকার করে নিজের মতটা অন্যকে গিলিয়ে দিতে চাইছে, এই কি মানুষ? এই যে একপাল লোক একসঙ্গে ভীষণ চিৎকার করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। ওরা কি কোনও যুদ্ধে যাচ্ছে? কোনও দেশ জয় করতে যাচ্ছে? সবাই তা হলে অমন চিৎকার করছে কেন? ওদের জন্য যে এত লোক আটকে আছে রাস্তায়, সেটা নিয়ে ওদের হুঁশ নেই? কেউ কি কারও সুবিধে অসুবিধে বুঝবে না? কষ্টটা বুঝবে না?

নেড়ু পাগলা উঠল। মেয়েটার পায়ের দিকে তাকাল একবার। আরে, এখানেও লাল-কালো জুতো! কে জানি আজ ওকে বলেছে পরশুকাল একটা লাল-কালো জুতো কিনে দেবে! কে জানে সত্যি দেবে কি না? কিন্তু কে বলল ওকে কথাটা? কিছুতেই মনে পড়ছে না। মনে পড়ে না। সব আবছা লাগে কেমন। খাওয়ার কথাটুকু ছাড়া আর বিশেষ কিছু মনে থাকে না কেন ওর?

শেষবারের মতো ছেলে আর মেয়েটার দিকে তাকাল ও। চেনা মনে হল কি? কে জানে? মেয়েটাকে দেখতে কী সুন্দর লাগছে! চোখের ভেজা

BanglaBook.org

পলকগুলো ছাপিয়ে উঠছে হাসি। রোদ আর বৃষ্টি। হঠাৎ ভারী আনন্দ হল ওর। সিনেমার শো ভেঙেছে। লোকজনের ভিড় নড়াচড়া করছে। ছেলেটা আর মেয়েটা সেই ভিড় ভেঙে হেঁটে চলে গেল। কোথায় গেল? নেড়ু পাগলার খুব ইচ্ছে হল ওদের সঙ্গে যায়। কিন্তু গেল না ও। অন্য দিকে হাঁটতে লাগল। হাওয়া দিচ্ছে খুব। হাত দুটো ছেঁড়া পাজামার পকেটে ঢোকাল ও। আরে এক টাকার কয়েন! কে দিল এটা ওকে? আনমনে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামল ও। এখানে সার সার গাড়িরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরে এই গোলাপি বড় গাড়িটা কার? ওই ফরসা লম্বা লোকটার? আচ্ছা লোকটা অমন করে কার সঙ্গে ফোনে চেঁচাচ্ছে? কী বলছে লোকটা?

নেড়ু পাগলা চুপচাপ গিয়ে দাঁড়াল লোকটার পেছনে। শুনল লোকটা বলছে, "কিষণ আবার ভুল করেছ? সুটকেস দুটো কেন পাঠাওনি সুরিন্দরকে? ইউ ইডিয়ট। লাথ মেরে বের করে দেব তোমায়। সকালে এক টাকার হিসেব গন্ডগোল করেছ, এখন সুটকেস নিয়েও গন্ডগোল? কী করছ কী তুমি? মন নেহি হ্যায় ক্যা কাম মে? কী হল, বলো?"

নেড়ু দেখল এক টাকা আর সুটকেসের জন্য লোকটা ভীষণ রেগে গিয়েছে, খুব চিৎকার করছে। ওর মনে হল, কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী করবে ও? সুটকেস তো দিতে পারবে না, তা হলে? আরে, এটা তো আছে। পকেট থেকে এক টাকার কয়েনটা বের করল নেড়ু। তারপর লোকটার কাঁধে টোকা দিল, "এই যে, শোনো।"

লম্বা লোকটা ফোন হাতে ওর দিকে ফিরল, রাগে গোলাপি হয়ে যাওয়া মুখে হতভম্ব ভাব। নেড়ু পাগলার মজা লাগল খুব। ও বলল, "রাগ করে কী হবে? সুটকেসটা গতকাল পেয়ে যাবে ঠিক। আর এখনকার মতো এটা রাখো। কেমন?" লোকটার হাত ধরে এক টাকা গুঁজে দিল ও। তারপর লোকটার দিকে আর না তাকিয়ে এগিয়ে গেল।

বিকেলের রোদে মরচে ধরছে এখন, হাওয়ার বেগটাও সামান্য বাড়ল। দু'পাশের গাছ থেকে সবুজ হলুদ পাতারা ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে পথে। নেড়ু পাগলা দেখল গোলাপি গাড়িটার সামনে একটা চকচকে মূর্তি। আরে হনুমানজি! বজরঙ্গবলী! নেড়ু পাগলা হাঁটু মুড়ে বসল গাড়িটার সামনে, তারপর জোড়হাত করে বলল, "আমায় একটা লাল-কালো জুতো দিয়ো ভগবান। নরম একটা জুতো।"

BanglaBook.org

আচ্ছা, ওরও একটা নরম জুতো ছিল না? একটা বিরাট বড় মাঠ, অনেক পায়রায় ভরা ছাদ, বড় ঝিল, এক জোড়া সোনার বালা-পরা হাত, বই-ঘেরা মানুষ, লাল ওয়াটার বটল হাতে দৌড়ে আসা ছোট্ট একটা মেয়ে—ছিল না ওর? কী জানি। কিচ্ছু মনে পড়ে না!

নেড়ু পাগলা টালুমালু চোখে আকাশের দিকে তাকাল একবার। বড় বড় গাছের থেকে সবুজ হলুদ পাতারা ঝরে পড়ছে। ও, সেই মরচে-পড়া রোদ, সেই ঝরে-পড়া পাতা আর দামাল হাওয়ার কানে কানে বলল, "যে যেখানে আছে, সবাই সুখে থাকুক, আনন্দে থাকুক, ভাল থাকুক। ভগবান নয়, মানুষই মানুষের ভাল করুক।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG